লোহিত সাগরের উপকূলে

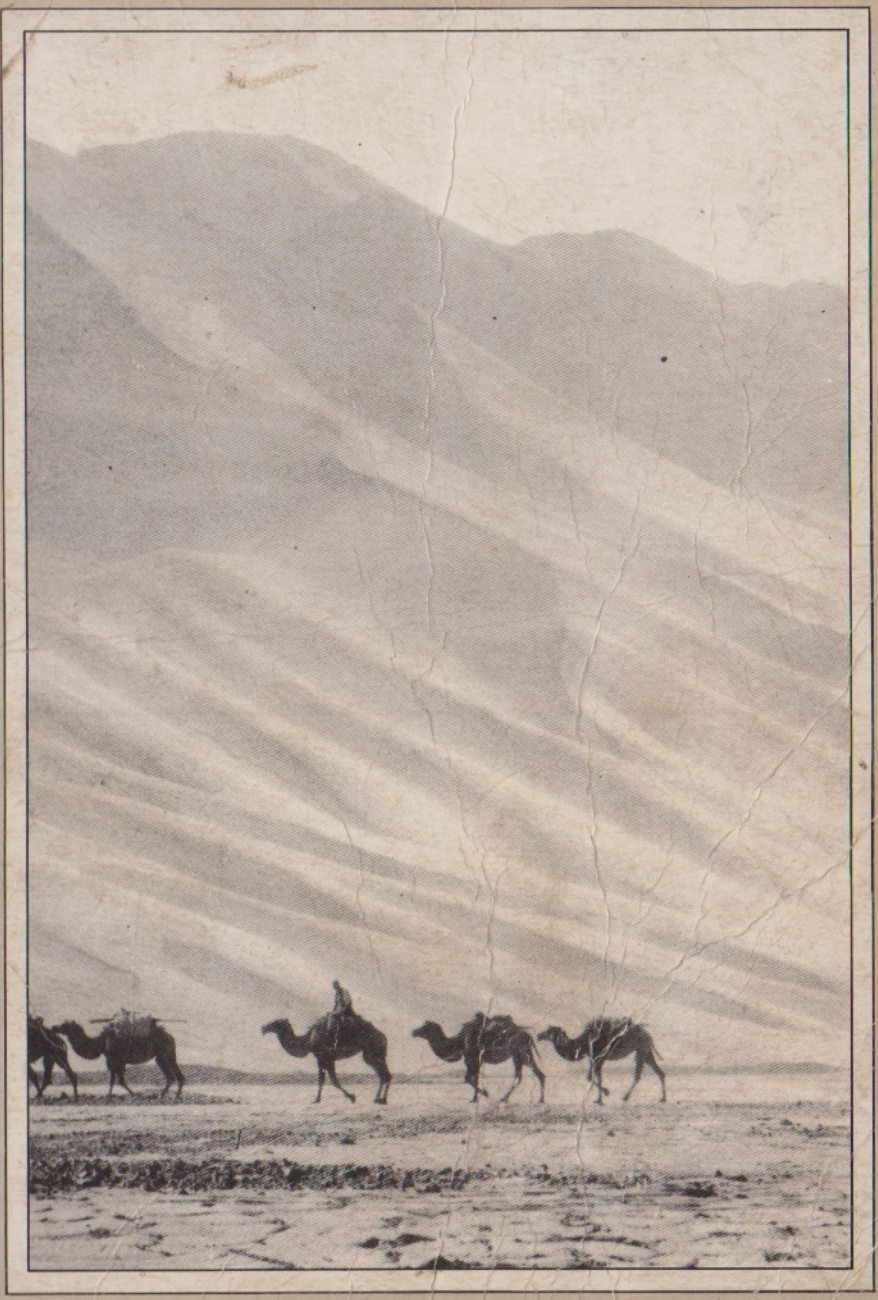

এম, এ, সোবহান

লোহিত সাগরের উপকূলে

এম, এ, সোবহান

www.pathagar.com

প্রকাশিকা ঃ বুলবুল খালেদা খানম
"বুলবুল বাগ"
১, মোহাম্মদপুর আ/এ,
মুরাদপুর, সি·ডি·এ· এভিনিউ, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ সর্ব স্বত্ব গ্রন্থকারের

পরিবেশক ঃ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ,
৫৩৮ নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড,
চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ ৬০·০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

স্নেহময় পিতার তিরোধানে
এই অনুজকে আজীবন যিনি
পিতৃস্নেহে লালন করেছেন
জীবনে-সংকটে যুগিয়েছেন
শক্তি-সাহস-প্রেরণা
সেই পুণ্যাত্মা অগ্রজ
খায়ের আহমদ স্মরণে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিচারপতি মাহ্ মুদুল আমীন চৌধুরী
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

" মুখবন্ধ "

এডভোকেট জনাব এম,এ, সোবহান সাহেবের লেখা " লোহিত সাগরের উপকূলে " বইটির পান্ডুলিপিখানা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বইটি নিছক একটি ভ্রমন বৃত্তান্ত নয়। একজন পবিত্র হজ্বব্রত পালনকারীর মনের অনুভূতি এবং বিভিন্ন পাকস্থানের বর্ণনা এই বইটির বৈশিস্ট।

আমি মনে করি প্রত্যেক হজ্বযাত্রীরই এই বইটি পড়া উচিত। জনাব সোবহান কষ্ট করে এই অমূল্য বইখানা লিখার জন্য তাঁকে মোবারকবাদ জানাই।

(বিচারপতি মাহ মুদুল আমীন চৌধুরী)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঃ প্রাক–কথন ঃ

আমি লেখক নই। লেখার অভ্যাসও নাই। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ১৯৮৬ ইংরেজী সনে সস্ত্রীক হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য হয়েছিল। যেই পবিত্র ভূমিতে শায়িত আছেন চির জাগ্রত বিশ্বনবী (দঃ), সেই পুণ্য ভূমিতে পদার্পণ করে, রওয়াজায়ে পাক, সমগ্র মসজিদে নববী, মক্কা মদিনার আশপাশে ঐতিহাসিক স্থান সমূহ, পবিত্র মক্কা নগরী, কাবাগৃহ, তার গিলাফ, হাতিম, মকামে ইব্রাহীম, জমজম, ছাফা মারওয়া, মিনা, মোজদলেফা, আরাফাত প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হয়ে "লব্বায়েক" বলে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দাখিলের সাথে সাথে মন–মানসে যেই ভাব, আবেগ, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, ভাষা দিয়ে তা' প্রকাশ করা এই অভাজনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একমাত্র কন্যা সুমাইয়া হজ্জ যাত্রীদের কর্মকান্ডের বিবরণ শুনার তলব তাগাদা দিলে, বড় পুত্র এস,এম, জাহেদ বীরু খাতা কলম নিয়ে ডিকটেশন গ্রহণ করে বইটি লিখার পথ সুগম করে দেয়। এইরূপে বইটির পাভুলিপি তৈরী হলে সম্পাদক বন্ধুবর মরহুম আলহাজ্ব আবদুল্লা–আল–সগীরের বিশেষ আগ্রহে দৈনিক নয়া বাংলায় লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তারপর অসংখ্য বন্ধু বান্ধবের নিকট হতে লেখাটি বই আকারে প্রকাশের অনুরোধ আসতে থাকে।

বইটিতে যাত্রা থেকে দেশে ফেরা পর্যন্ত একজন হজ্জ যাত্রীর যাবতীয় আচরণ, অনুভূতি, করণীয় ক্রিয়াদি ও বিষয়াদি সম্পর্কে এবং ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের বিশদ বিবরণ ও ইতিহাস বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের হজ্জ যাত্রীরা সাধারণতঃ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতি পালনেই সদা ব্যস্ত থাকেন। ইসলামের উৎপত্তি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনাদি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা বা অনুসন্ধিৎসা তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই দেখা যায়না। তাই হাজী সাহেবানরা বিশেষতঃ বাংলাদেশের ধর্ম প্রাণ মুসলমানরা যাতে হজ্জ সম্পর্কে, হাজী সাহেবানদের কৃত ক্রিয়াদি সম্পর্কে এবং মসজিদে নববী ও কাবাগৃহ সহ ইসলামের মর্যাদাবান ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভে সমর্থ হন, সেই উদ্দেশ্যেই এ'বইটি। ভবিষ্যতে বিদগ্ধ হাজী সাহেবানরা হজ্জ সমাপন ক্রমে আরো উন্নত ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত বই লেখায় ব্রতী হলে মুসলিম সমাজ আরো জ্ঞান–সমৃদ্ধ ও সচেতন হবে বলে মনে করি।

সিগনেট প্রেস লিঃ এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী আমার স্নেহভাজন এম, এন, আজাদ চৌধুরী বইটি মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়ে আমায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। বন্ধুবর এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মীর্জা বইটির পাভুলিপি দেখে দিয়ে প্রকাশের জন্য প্রতিক্ষণে আমায় উৎসাহিত করেছেন। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমায় কৃতার্থ করেছেন। বইটি লিখনে, মুদ্রণে ও প্রকাশনার সকল অবদান বীরুর। শ্রম ও সহযোগিতা প্রদানকারী সকল বন্ধু পরিজনকে জানাই প্রীতি ও ধন্যবাদ।

এম, এ, সোবহান

"বুলবুল বাগ"
১নং মোহাম্মদপুর আবাসিক এলাকা,
মুরাদপুর, সি,ডি,এ, এভিনিউ,
চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাসার সকলেই ইতিপূর্বে তাকে কিছু কিছু ধারণা দিয়ে রেখেছিল। তাই সে ও যেন মানসিক দিক থেকে কিছুটা প্রস্তুত হয়েই ছিল। যদি ও সে বিষয়টির গুরুত্ব তখন আদৌ বুঝতে সক্ষম হয় নাই। তাই আমার ৫ বছরের মেয়ে সুমাইয়াকে যখন বললাম "আম্মু, আমি আর তোমার আম্মা হজ্বে গেলে তুমি কাঁদবে নাতো?" সে বললো, "আপনারা আল্লাহর ঘরে যাবেন তো। আমি কাঁদবো না।" আরেকটু জোর করে যখন বলতে চাইলাম দেখো তুমি কাঁদবে কিনা? সে সাথে সাথে তিন সত্যি করে বললো– "আপনারা যান। আমি কাঁদবো না, কাঁদবো না, কাঁদবো না।" ছোট্ট মেয়েটির এহেন দৃঢ়তা ও সুস্পষ্ট জবাব পেয়ে মনের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে কেটে গেল। এতদিন মনে একটু ইতস্ততা ছিল, এতটুকুন ছোট্ট মেয়েকে রেখে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু তার প্রত্যয় দৃপ্ত জবাব পেয়ে সমস্ত দ্বন্দ্ব কেটে গেল। আল্লাহর তরফ থেকে যেন নির্দেশ পেয়ে গেলাম। বিবি বুলবুল ধরে বসল তাকেও সাথে নিতে হবে। এত করে বললাম দেখ–, "পতির পুন্যে সতীর পুন্য!" কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। বলে কি, এই কলি যুগে নাকি সতীর পূন্যেই পতির পুন্য। অগত্যা সমস্ত আনুসাঙ্গিকতা সম্পন্ন করে নিদিষ্ট তারিখেই দরখাস্ত পেশ করলাম।

বাংলাদেশ সরকার এ বৎসর (১৯৮৬ ইংরেজী সন) আকাশ পথে দশ হাজার হজ্বযাত্রীকে অনুমতি দেবেন বলে পত্রিকা মারফৎ প্রচার এবং তদনুযায়ী দরখাস্ত আহবান করেন। সমুদ্রগামী জাহাজের ব্যবস্থা করতে না পারায় সমুদ্রপথে হজ্বযাত্রা সম্ভব নহে বলে ও সংবাদ প্রচার করে। দরখাস্ত গ্রহণের নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দেখা গেল যদি ও চট্টগ্রাম জিলার নির্দিষ্ট কোটা ছিল ৪৭৫ জন, দরখাস্ত পড়েছে সাতশতের অধিক। অনুরূপভাবে ঢাকাতেও নির্দিষ্ট কোটার অতিরিক্ত দরখাস্ত পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের বাকী সব জায়গায় কোটার চেয়ে অনেক কম দরখাস্ত পড়ে। এইভাবে সারা বাংলাদেশে মাত্র ৬ জহরেরও কিছু কম দরখাস্ত পাওয়া যায়। তখন সরকার ঢাকা চট্টগ্রামের অতিরিক্ত দরখাস্ত কারীগণকেও সুযোগ দেন এবং আরো দরখাস্ত আহবান করেন। শেষ পর্যন্ত ১০ হাজারের স্থলে কেবলমাত্র ৫ হাজার ৯ শত ৬৮ (৫৯৬৮) জন হজ্বযাত্রী পাওয়া যায়। ইহাতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। সরকার প্রতি বৎসর হজ্বযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছেন। হজ্বযাত্রী বহন করে বিমান মোটা টাকা মুনাফা করে বলে পত্রিকায় সংবাদ প্রচার করে সরকার গর্ববোধ করেন। প্রতি বৎসর হজ্বযাত্রার ব্যয় সরকার এত বৃদ্ধি করেন যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে হজ্বযাত্রা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় বিগত বৎসর গুলোতে দেখা গেছে অনেক ইচ্ছুক হজ্বযাত্রী দরখাস্ত করে এবং টাকা জমা দিয়েও হজ্বযাত্রার সুযোগ পাননি। এ বৎসরের

www.pathagar.com

সংগত ভাবেই অনুমান করা যায় বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে অধমুখী। অন্যথায় বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় চেতনা কোন রূপে ব্যাহত হয়েছে এরূপ ভাববার অবকাশ নেই। ভবিষ্যতে সরকার হজ্বযাত্রার ব্যয় লাঘব সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং সমুদ্রগামী জাহাজের ব্যবস্থা করলে বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষ অনেক উপকৃত হবে।

অতিরিক্ত দরখাস্ত পড়ায় নির্ধারিত তারিখে চট্টগ্রামে লটারী অনুষ্ঠিত হয়। লটারীতে আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে না পারলে ও আমার বড় ছেলে বীরু ও শ্যালক দুলু উপস্থিত ছিল। আমি তখন সদর ২য় মুন্সেফ আদালতে একটি মোকাদ্দমা পরিচালনা করছিলাম। যখন আমার ছেলের কাছ থেকে খবর পেয়ে আমার জুনিয়র নজরুল ইসলাম আমার কানে কানে বলল যে, "লটারীতে আপনার এবং আপনার স্ত্রীর নাম উঠেছে।" খুশীতে মন আমার আপ্লুত হয়ে গেল– আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং উভয় হারেম শরীফের ছবি মানষপটে ভেসে উঠল। আল্লাহ ও আল্লাহর নবী করিম (দঃ) এর প্রতি মন সম্পূর্ণ রূপে অভিভূত হয়ে গেল। ক্ষনিক পরে সম্বিত ফিরে পেলাম। যথারীতি মামলা শেষ করে বাইরে আসলে ছেলে বীরু বলল–৫নং রহমতগঞ্জ স্থীত আমার বন্ধু নুরুল আলম ও তার স্ত্রীর নাম ও লটারীতে উঠেছে বলে সে শুনেছে। আলম সাহেব সস্ত্রীক হজ্বে যাবার জন্যে দরখাস্ত করেছেন একথা আমি জানতাম না। পরে বন্ধু আলম সাহেবের সাথে দেখা হলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হই। আলম সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। দুজনে একযোগে অনেক সফর আমরা করেছি। সুতরাং উভয়েই একসাথে সস্ত্রীক হজ্বে যাবো বলে উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং উভয়ে একযোগে বাকী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে আরম্ভ করলাম।

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতি হতে এ বৎসর ৮ জন সদস্য হজ্বে যাবার জন্য দরখাস্ত করেন। তৎমধ্যে আমার সিনিয়র আলহাজ্ব নুরুল হুদা সাহেব ও একজন। তিনি অবশ্য ইতিপূর্বেও হজ্ব করেছিলেন। এবার সস্ত্রীক যাবার জন্যে মনস্থির করেন। তিনিও সমমনা একজন সহযাত্রী খুঁজছিলেন। একদিন বার লাইব্রেরী মিলনায়তনে তিনি আমাকে এ কথা বললেন। আমি সানন্দে রাজী হলাম এবং ভাবলাম আমরা তিনজন ও তিনজনের তিন স্ত্রী ৬ জনের একটি গ্রুপ। মোটামুটি সফরে থাকা, খাওয়া, ঘুরে বেড়ানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে এবং আমাদের ভ্রমনটি মোটামুটি আনন্দদায়ক হবে।

পরে ফ্লাইট তালিকা বেরুলে দেখা গেল আমি আর আলম সাহেবের নাম ১২নং ফ্লাইট এবং হুদা সাহেবের নাম ২নং ফ্লাইটে উঠেছে। এই সংবাদ হজ্ব অফিস থেকে জেনে হুদা সাহেবই আমাকে প্রথম জানালেন। আমি বললাম ঠিক আছে আপনি আগে চলে যান আমরা পরে আসব। তিনি বললেন "আমি আর তুমি একসাথে যেতে চাই" এবং এও জানালেন যে আমি বললে তিনি আমাকে ২নং ফ্লাইটে নিয়ে যেতে পারেন। আমি জবাব দিলাম আলম সাহেবকে বাদ দিয়ে আমার পক্ষে ২নং ফ্লাইটে যাওয়া সম্ভব নয়। তখন তিনি বললেন তাহলে "আমি

www.pathagar.com

তোমাদের সাথে ১২নং ফ্লাইটে চলে আসি।" আমি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করলে তিনি তাঁর নাম ২নং ফ্লাইট থেকে কর্তন করে কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে হজ্ব অফিসে তদবীর করে ১২নং ফ্লাইটে নিয়া আসেন। এ'ব্যপারে আলম সাহেবকে বললে তিনি ও খুশী হলেন। পরস্পরের মধ্যে আলোচনা এবং তিন জনের স্ত্রীদের মধ্যে আরো ঘনিষ্টতা সৃষ্টির জন্য একদিন বিকেলে হুদা সাহেব তাঁর বাসায় আমি এবং আলম সাহেবকে সস্ত্রীক চায়ের দাওয়াত করেন। সেখানে ৬ জনে বসে খাওয়া দাওয়া করলাম ও মন খুলে আলাপ করলাম। তার কয়েকদিন পরে আলম সাহেব তাঁর বাসায় আমি আর হুদা সাহেবকে খাওয়ার দাওয়াত করলেন। পুনরায় সেখানে বৈঠকে মিলিত হই। অনেক আলাপ সালাপ হয়। কে কি নেব, কি নেব না, কিসের প্রয়োজন হবে, কোন জিনিষ বেশী দরকারী এবং মক্কা শরীফে কোথায় থাকব, মদিনা শরীফে কোথায় উঠ্‌ব ইত্যাদি। দেশ হতে আগে থেকেই মক্কায় ঘর ভাড়া করে ফেলব কিনা, সেখানে মোয়াল্লেমের ঘরে থাকব, না নিজের ভাড়া করা ঘরে থাকব ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হল। বিশেষ করে মেয়েদের ব্যপারে কি জাতীয় কাপড় নিতে হবে, মাথায় কোন বিশেষ ধরনের কাপড় ব্যবহার করলে দুর হতে চিনতে সুবিধা হবে এ জাতীয় আলোচনা ও হল। মোদ্দা কথা আল্লাহর মেহেরবাণীতে হজ্বে যাব এই খুশীতে সকলে টগবগ। তারপর থেকে বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকের কাছ থেকে দাওয়াতের পালা শুরু হল। তথাপি সময়াভাবে অনেকের দাওয়াত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি। যাত্রার মাসাধিক কাল আগে থেকে নিজ ঘরে এক রকম খাওয়া দাওয়া সম্ভব হয়নি বললেই চলে। চট্টগ্রাম জিলা আইনজীবী সমিতির ধর্মপ্রাণ মুসলিম সদস্যগণ উদ্যোগী হয়ে সকল হজ্বযাত্রী গণকে এক সম্বর্ধনা প্রদান করেন। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে জিলা জজ সাহেব বাহাদুর জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরীর (বর্তমানে হাইকোর্ট ডিভিশনের মহামান্য বিচারপতি) ভাষনটি আমার মনে অত্যন্ত দাগ কেটেছিল। তিনি বলেছিলেন হজ্বে অনেকে যান এবং অনেকে আসেন। সেটা বড় কথা নয়। হজ্ব থেকে আসার পরে হজ্বের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারাই সবচেয়ে বড় কথা। একজন হাজীর চালচলন, আচার ব্যবহার, এবং ধর্মকর্ম প্রতিপালনে যেন অন্য সকল মুসলমান অনুপ্রাণিত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৮ই জুলাই ১৯৮৬ সন চট্টগ্রাম হতে যাত্রা শুরু। ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম মেইলে আমাদের জন্যে ৬ খানা, আলম সাহেবের শ্যালক, হাটহাজারী উপজেলার চেয়ারম্যান বর্তমানে সংসদ সদস্য জনাব সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এবং আলম সাহেবের ছোট এক ছেলে দু'জনের দু'খানা মোট ৮ জনের জন্য আট খানা প্রথম শ্রেণীর সীট রিজার্ভ করেছিলাম। যাত্রার দিন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অনেকেই আসলেন বাসায়। অনেকেই গেলেন ষ্টেশনে। হজ্বযাত্রী ৩ জনেই সস্ত্রীক ষ্টেশনে সমবেত হলাম। তিন জনের আত্মীয় স্বজন একত্রিত হলাম। ষ্টেশনের প্ল্যাট ফরমে মোনাজাত হল। সকলের অনুরোধে মুনাজাত পরিচালনা করলাম আমি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম– "যাদের দেশে রেখে যাচ্ছি

www.pathagar.com

তুমি তাদের হেফাজত করো, আমাদের জন্য আমাদের সফর সহজ করে দাও। আমাদেরকে মুকবুল হজ্ব দান করো। তোমার পথের মেহমান জেনে যাঁরা আমাদেরকে সম্মান দেখাতে এতদুর এগিয়ে এসেছেন সেই সম্মানে তুমি তাঁদের সম্মানিত কর।" একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মেয়ে সুমাইয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ইতি পূর্বে সে তার মায়ের বুকে ছিল। তারপর ওকে চুমু খেয়ে বললাম– "মা কেঁদনা, আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর।" এই সময়ে ঢং ঢং করে ষ্টেশনের ঘন্টা বাজল। পেছন থেকে গার্ড সবুজ বাতি দেখাল। ট্রেন লম্বা সিটি বাজাল। তখন সুমাইয়াকে বীরুর কোলে তুলে দিলাম। ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। যতক্ষণ দেখা যায় পেছনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একদিকে নিজের অতি আপনজনকে ছেড়ে যাবার বেদনা, অন্যদিকে পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের ঘরে এবং তাঁর পেয়ারা হাবীবের দরবারে যাত্রা করার আনন্দ, মনের এ দোদুল্যমান অবস্থায় ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে ট্রেনের গতি বাড়তে লাগলো, গতির আনন্দ আর মনের আনন্দ একসাথে মিশে মোহাবিষ্ট হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

আমার বিশ্বাস কেহ ইচ্ছা-করলেই বা কাহারো আর্থিক সামর্থ্য থাকলেই তিনি হজ্বে যেতে পারেন না। আল্লাহ পাক যাদেরকে দয়া করেন এবং অনুগ্রহ করে অনুমতি প্রদান করেন কেবল মাত্র তা'দেরই হজ্ব নসিব হয়। যেমন রাজবাড়িতে যেতে হলে রাজার পূর্ব অনুমতি ছাড়া রাজ গৃহে প্রবেশ সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক তাঁর অসীম করুণায় আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন এই ভেবে সব সময় আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকলাম এবং যাত্রার পূর্ব থেকেই একে একে লক্ষ্য করতে শুরু করলাম আমাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণার নিদর্শন। আমি, আলম সাহেব আর হুদা সাহেব তিন জনে মিলে ঠিক করেছিলাম ঢাকাতে আমরা হাজী ক্যাম্পে থাকব না। যে কয়দিন থাকতে হয় হোটেল গ্রীনে থাকব। হোটেল গ্রীনে আগে থেকেই রুম রিজার্ভ করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তদানুযায়ী আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জামাল উদ্দিন আহমদকে (সে ঢাকায় পেট্রোবাংলায় প্রধান Geo Physicist হিসাবে চাকুরীরত আছে) টেলিফোন করে বলে দিলাম আমাদের জন্য ৩টা রুম রিজার্ভ করতে। অথচ সে জুলাই মাসের প্রথম দিক থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে এমনকি অগ্রিম ভাড়া প্রদান করেও রিজার্ভ করতে ব্যর্থ হয়। এইকথা যথাসময়ে আমি আলম সাহেব ও হুদা সাহেবকে জানিয়ে দিলাম। সকলে হোটেল গ্রীনের আশা ছেড়ে দিলাম। ঢাকায় গিয়ে ব্যবস্থা করব ইহাই সিদ্ধান্ত হল। এমতাবস্থায় যাত্রার দিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের পুরাতন গীর্জাস্থিত খান বোর্ডিং এর একজন কর্মচারী আমার বাসায় এসে সংবাদ দিলেন খান বোর্ডিং এর মালিক জামাল সাহেব ঢাকা থেকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন তিনি হোটেল গ্রীন এ আমাদের জন্য ৩ খানা রুম রিজার্ভ করেছেন। আমারা যেন নির্ধারিত দিনে হোটেল গ্রীনে গিয়ে উঠি। উল্লেখযোগ্য যে, এই জামাল সাহেব আমি ও আলম সাহেবের পড়শী এবং আত্মীয়। আমরা হোটেল গ্রীনে রুম রির্জাভ করতে পারিনি একথা

www.pathagar.com

তিনি জানতে পেরেছিলেন। নিজ প্রয়োজনে ঢাকায় গেলে তিনি হোটেল গ্রীনে আমাদের জন্য রুমের ব্যবস্থা করে টেলিফোন মারফত নিজ হোটেল খান বোর্ডিং এ খবর দেন। বন্ধুবর মোঃ হাশেম চৌধুরী সস্ত্রীক ১৭ই জুলাই ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজে নিজ কন্যাকে দেখতে যাবার উদ্দেশ্যে ঢাকায় পৌছে হোটেল গ্রীনে অবস্থান করেন। আমাদের ব্যপারটি তিনি ও জানতেন। ম্যানেজারের সাথে আলাপ করে তিনি ও আমাদের জন্য রুমের ব্যবস্থা করেছেন বলে টেলিফোনে আমাকে জানান। মনে মনে খুশী হলাম। আল্লাহ্ তাঁর অপার মহিমা ও বিশেষ অনুগ্রহে নিজ মেহমানের ইচ্ছানুযায়ী থাকার ব্যবস্থা করেদিলেন। পরের দিন ভোরে যথা সময়ে কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছে দেখি ভাইপো মনসুর, জামাল তার স্ত্রী টুনু এবং নাতনী এসা সবাই ষ্টেশনে হাজির। চেয়ারম্যান ওয়াহিদুল আলম আগে থেকেই একটি মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেই মাইক্রোবাসে চেপে সকলে হোটেল গ্রীনে এসে ৩ জনে পাশাপাশি ৩টি কক্ষে উঠে হাত মুখ ধুয়ে গোসল সেরে, নাস্তা করে বেলা নয়টার দিকে ওয়াহিদের মাইক্রোবাসে করে সকলে মীরপুর হাজী ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা দিই। হাজী ক্যাম্পের প্রধান ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম সেখানে হজ্বযাত্রীদের বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে হুদা সাহেব, আলম সাহেব ও ৩ জনের স্ত্রীকে বসিয়ে আমি আর ওয়াহিদ প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত কাউন্টারে যাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল কাজ সমাধা হল এবং বলে দেয়া হল যে আমরা হাজী ক্যাম্পে না থাকলেও চলবে। যাত্রার দিন অর্থাৎ ২২ তারিখ সকাল ১০টায় এসে রিপোর্ট করলে চলবে। বুঝতে পারলাম এ বৎসর কোয়ারেনটাইনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেই। হাজী ক্যাম্পে থাকাটা বাধ্যতামূলক নয়। ফিরে এসে আলম সাহেব ও হুদা সাহেবকে একথা বলায় সকলে হোটেলে থাকতেই সিদ্ধান্ত নেন। তদ্মতে হোটেলে ফিরে এসে দুপুরের খাবারের পর সকলেই নিজ নিজ কক্ষে বিশ্রাম গ্রহণ করি। ১৯, ২০, ২১শে জুলাই এই তিন দিন ঢাকায় আমাদের বিশেষ কোন কাজ ছিল না। মনে হলো যেন আমরা ২২ তারিখ সকালে আসলেও চলত।

তিন জনে মিলেই আলোচনা করে স্থির করলাম এক সাথে যখন সফর করব কারো মনে কোন রকম সংকোচ, দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকা বাঞ্চনীয় নয়। হুদা সাহেবই বলে দিলেন যখন যা প্রয়োজন তখন তা খরচ করবে, খাওয়া দাওয়া করবে এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিন জনে সমানভাবে বহন করব। ঢাকায় অবস্থানকালীন ৩ দিনের মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্র জামালের বাসায় একদিন বৈকালিক চা পান করলাম, আরেক দিন খান বোর্ডিংয়ের জামালের বড় ভাই সমাজকল্যাণ দফতরের ডিপুটি ডাইরেক্টর এন, আই, খান তাঁর বাসায় আমাদেরকে এক রাত্রে ডিনার দেন। এই সময়ে আমরা সকলে সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটা ও করি। একদিন পর আলম সাহেবের বড় ছেলে চট্টগ্রাম থেকে কার নিয়ে হাজির হয় এবং তার মাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ও কেনাকাটা করে।

www.pathagar.com

যাত্রার দিন ঘনিয়ে আসছে। প্রশ্ন জেগেছে ৬ জনের মনে–প্রথমে মক্কায় যাব না মদিনায়। কারো ইচ্ছা আগে মক্কায় যাই, কারো ইচ্ছা মদিনায়। হাতে সময় আছে ঢের। ইচ্ছা করলে আগে মক্কায় যেতে পারি, মদিনায় যেতে ও কোন অসুবিধা নেই। হজ্বে অনুসরণ করবার জন্যে আমি পটিয়ার মুফতি আবদুর রহমান সাহেবের লিখিত "পবিত্র মক্কা মদীনার পথে" বইটি সংগ্রহ করেছিলাম। হজ্বের উপর লিখা অন্যান্য বইগুলোর তুলনায় এই বইটি আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয় এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই আমি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। মক্কা মদিনা যাওয়া সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমি ২১ তারিখ বিকালে হুদা সাহেবের কক্ষে ৬ জনের সাধারণ সভা আহবান করি। মুফতী আবদুর রহমান সাহেবের বইয়ে প্রথমে মক্কা যাবেন না মদিনা যাবেন এ' ব্যাপারে এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, সময় থাকলে প্রথমে মদিনা যাওয়াই শ্রেয় এবং হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও এমত পোষণ করেন। "মক্কা মদীনার পথের" এই অধ্যায়টি সকলকে পড়ে শুনানোর পর আমরা সকলেই বুঝতে পারি এবং একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে আল্লাহ চাহেত আমরা প্রথমে মদিনার পথে রওয়ানা হব। সুতরাং মীরপুর হাজী ক্যাম্পে আমরা এহরাম বাঁধব না। উল্লেখ্য যে, যাঁরা প্রথমে মক্কা যাবেন তাঁরা মীরপুর হাজী ক্যাম্পে এহরাম পরে বিমানে আরোহন করেন।

হোটেল গ্রীন সম্পর্কে একটি কথা অবশ্যই বলতে হয়। হোটেলটির পশ্চিম দিকে লম্বালম্বি একটি গৃহের কয়েকটি কক্ষ বার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই বারের উত্তরাংশে ছোট্ট একটি কক্ষ আবার এবাদত খানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হোটেলে অবস্থান কালে এই এবাদত খানায় আমরা প্রায় সময় নামাজ আদায় করেছি। হোটেলের বারটি খোলা হয় সন্ধ্যার পর। এশার নামাজ পড়তে যাবার সময় অনিবার্য রূপেই মদের তীব্র গন্ধ শুঁকতে শুঁকতেই এবাদত খানায় গিয়েছি এবং ঐ গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে নামাজ শেষে ফিরে এসেছি। মনে মনে ভাবলাম এবং আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম–কি বিচিত্র আল্লাহর লীলা। পানশালা আর ভজনালয় একই সাথে নিরুপদ্রবে সহ অবস্থান করছে !

পানশালায় যেমন খদ্দেরের অভাব নেই মসজিদেও মুসল্লির কমতি নেই। দু'টিই চলছে পাশাপাশি, একটির সাথে আর একটি পাল্লা দিয়ে। আরো দেখেছি, যে বেয়ারা বারে মদ পরিবেশন করছে, সেই আবার নামাজের সময় হলে নামাজের কাতারে সামিল হয়ে গেছে।

২১ তারিখ সকালে চট্টগ্রাম হতে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বীরু এবং কনিষ্ঠপুত্র সাজ্জাদ আমাদের বিদায় জানাতে ঢাকায় এসে উপস্থিত হয়। হুদা সাহেবের বড় ছেলে আশরাফ ও এসে পৌঁছে। সন্ধ্যার পরে বুলবুলের মেঝ ভাই প্রাক্তন এম, পি, সিরাজুল ইসলাম সাহেব তাঁর বন্ধু লিয়াকত সাহেবকে নিয়ে আমাদের হোটেলে হাজির। রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে চট্টগ্রাম হতে বিদায়ের প্রাক্কালে দেখা করতে পারেননি বলে তিনি সৌজন্য প্রকাশ করে বললেন দুপুরে হাজী ক্যাম্পে গিয়ে

www.pathagar.com

আমাদের খুব খোঁজ করেছেন। মাইকে ঘোষণা দিয়ে ও আমাদের কোন হদীস করতে না পেরে অবশেষে হোটেলে এসেছেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় হোটেল গ্রীনের এবাদত খানায় মগরিবের নামাজে ইমামতির ভার পড়েছিল আমার উপর। নামাজে সামান্য একটু ত্রুটি হয় বলে আমার মনে হয়েছিল। ব্যপারটি ক্ষুদ্র বলে আমি গুরুত্ব দিই নাই। খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ি। ফজরের আজান দিলে বিছানা হতে উঠে ডান পা'টি মাটিতে রাখার সংগে সংগে আমি পড়ে যাই। মনে হল, পা'টি আমার দেহের ভার বহন করতে সক্ষম হয়নি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে নামাজ শেষ করে আসলাম। আমার স্ত্রী ঐ সময়ে তার ডান হাত উপরে তুলে ব্লাউজ খুলে আমাকে দেখাল। দেখলাম বগলে ১৫/২০টির মত ফোঁড়া। সবগুলিই পেকে সাদা হয়ে রয়েছে। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম এবং আল্লাহকে স্মরণ করলাম এবং শাফা প্রার্থনা করলাম। আজকে রাত্রেই আমাদের যাত্রা। অথচ দুজনেই দুদিকে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ইতিপূর্বে আলম সাহেব আর হুদা সাহেব আমাকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন অর্থাৎ আমাদের যাত্রা আমার নেতৃত্বেই পরিচালিত হবে। অথচ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আজ অর্থাৎ ২২ তারিখ সকাল ১০টার সময় পূর্ব নির্ধারিত মতে ৬ জনেই হাজী ক্যাম্পে যাই। কিন্তু আমার পক্ষে দৌড়াদৌড়ি করে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা সম্ভব না হওয়ায় এবার আলম সাহেব আর ওয়াহিদ তারাই ছুটাছুটি করে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করলেন। আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে বুলবুলকে নিয়ে হাজী ক্যাম্পের মেডিক্যাল মিশনে যাই। দেখলাম একটি চেয়ারে একজন মহিলা সহকারী বসে আছেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি একজন ডাক্তার। তবে পেশায় নবীন। তাকে বুলবুলের অসুস্থতার কথা বললাম। তিনি না দেখেই একটা ঔষধ লিখে দিতে চাইলেন। আমি লিখবার আগে রোগীকে দেখবার জন্য পীড়াপিড়ি করলাম। কিন্তু তিনি দেখতে রাজী নন। অবশেষে তার পাশে আরেকটি চেয়ারে আরেকজন ডাক্তার বসা ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে পরামর্শ করলেন। ডাক্তার আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে এ জাতীয় অসুখ হয়। দেখতে হবে না। বিশেষ করে সেখানে মহিলা রোগীকে বস্ত্র উন্মোচন করে দেখবার মত পরিবেশের অভাব ছিল। তাই তিনি লিখে দিয়ে বললেন যে ঔষধটি তাদের কাছে নেই। বাহির থেকে কিনে নিতে হবে। তারপর আমার পা'টি দেখালে তিনি ভালো করে দেখবার বা পায়ে একটি আংগুল দিয়ে টিপে দেখবার ও কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। ছয়টি ছিটালজিন ট্যাবলেট আমার হাতে দিয়ে বললেন–দিনে ৩টা করে খাবেন। হাজী ক্যাম্পের মেডিকেল মিশনের এই দীনহীন অবস্থা, চিকিৎসকদের উদাসীনতা এবং অব্যবস্থা দেখে মনে মনে হতাশ হলাম। কানুন মতে হাজী ক্যাম্প থেকে হজ্বযাত্রীদের বাইরে বেরুবার কথা নয়। তাদের যাবতীয় চিকিৎসার ভার এই মেডিকেল মিশনের উপরই ন্যাস্ত। তবু সরকারকে ধন্যবাদ যে নামমাত্র হলেও মেডিক্যাল মিশন নামে একটি সাইনবোর্ড, দুয়েকজন চিকিৎসক নামধারী ব্যক্তি এবং ছিটালজীন জাতীয় দু চারটি টেবলেট রেখে সরকার দায়িত্ব পালন করবার চেষ্টা করছেন। অতঃপর বিমানের

www.pathagar.com

টিকেট, রাত্রে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ছেলেদের প্রবেশের অনুমতি পত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করলাম। বাংলাদেশ বিমান প্রত্যেক হজ্বযাত্রীকে একটি ছাতা, একটি কোমর বন্ধ, গলায় ঝুলিয়ে রাখা যায় মত একটি থলে ও একটি তস্‌বিহ্‌র ছড়া উপহার প্রদান করেন। আবার বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ব্যাংকে যেতে হল। কিছু ড্রাফট, কিছু নগদ, কিছু ট্রাভেলার চেক নিয়ে সকলে মিলে আবার হোটেলে ফিরে এলাম। এই সময় বুলবুলের মেঝ ভাই সিরাজ সাহেব হোটেলে এসে হাজির হন। আমাদের দুপুরের খাবার দিলে তাঁকেও আমাদের সাথে বসতে অনুরোধ জানালাম। তিনি রাজী হলেন না। অবশেষে বুলবুল অশ্রু তরাক্রান্ত কণ্ঠে ভাই বোন একত্রে খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি রাজী হন। আমার পায়ের অবস্থা দেখে তিনি সমবেদনা প্রকাশ করলেন। কেমন করে এতদূরের রাস্তা পারি দেব সে সম্পর্কে উদ্বীগ্নতা প্রকাশ করলেন এবং ঢাকাতে তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু আছেন বলে বিকালের দিকে তাঁকে নিয়ে আসবেন কথা দিয়ে চলে যান। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম নিলাম। এখন হতে সকলকে আমার জন্য উদ্বীগ্ন দেখা যাচ্ছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে যাত্রা শুরু হবে এবং হজ্বব্রত পালন খুব একটা আরামপ্রদ ভ্রমন নহে। এই ব্রত পালনে বিস্তর কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। আমার পায়ের এই অবস্থা দেখে আমার চেয়ে ও আমার সহযাত্রীগণ, ছেলেরা এবং হিতাকাঙ্খী সকলের উদ্বীগ্নতা আরো বেড়ে গেল। সকলে ডাক্তার দেখাবার কথা বলছেন। ঐ সময়ে সাধারনতঃ কোন ডাক্তারকে চেম্বারে পাওয়া যায় না। পরে চেম্বারের সময় হলে আলম সাহেব কয়েকজন ডাক্তারের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেও তাৎক্ষণিক ভাবে সাক্ষাতের অনুমতি পাননি। অবশেষে বায়তুল মোকাররমের অধ্যাপক ডাঃ ওয়ালি উল্লাহ সাহেবের কাছে ফোন করে আজই হজ্বে যাত্রা করছি বলায় তিনি যাওয়ার সাথে সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। এদিকে তখন ঢাকা শহরে মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হোটেল থেকে বের হওয়া দায়। কষ্ট করে আলম সাহেব সহ ওয়াহিদের মাইক্রোবাসে গিয়ে উঠলাম। বায়তুল মোকাররমে গিয়ে ডাক্তারকে দেখাই। তিনি দেখে শুনে ঔষধ দিলেন ব্রুফেন টেবলেট। তারপর ফিরে আসলাম। আসার পথে বৃষ্টির গতিবেগ আরো বেড়ে যাওযায় বার বার চেষ্টা করা সত্বেও গাড়ী থেকে নেমে ঔষধ কেনা সম্ভব হয়নি। পথে পাবো বলে বায়তুল মোকাররম থেকেও কেনা হয়নি। তদুপরি এই ব্রুফেন নামক ঔষধটির প্রতি আমার আগে থেকেই একটু কেমন জানি অনীহা ছিল বলে ঔষধটি আর ইচ্ছে করে কিনিও নাই, খাইও নাই। কেবল মাত্র দরুদ শরীফ পরে আল্লাহর কাছে আরজি পেশ করতে থাকলাম। ঐদিন রাত্রে হোটেল গ্রীনে আমরা একটি ভোজ দিলাম। তাতে হুদা সাহেবের বেহাই, বেহান, ছেলেরা, আলম সাহেবের শ্যালক, ছেলেরা আমার ছেলেরা, ভাইপো জামাল সস্ত্রীক, নাতনী এসা সকলে একসাথে মিলে খেলাম। অতঃপর যাত্রার পালা। হোটেল থেকে বেরুতে রাত ১০টা পেরিয়ে যায়। হাজী ক্যাম্পে এসে যখন পৌঁছি তখন প্রায় ১১টা বাজে। ঐদিন হাজী ক্যাম্পে যাত্রীদের মধ্যে আমরাই বোধ হয় সকলের শেষে পৌঁছি। ঢাকায় এই কয়েকদিন অবস্থানের মধ্যে চেয়ারম্যান ওয়াহিদুল আলম সাহেব আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা দান

www.pathagar.com

যাত্রার রাত্রেও হাজী ক্যাম্পের বিমান অফিসে সমস্ত মালামাল দ্রুততার সাথে তুলে দেন। হাজী ক্যাম্পে একেত দেরীতে এসেছি। কিন্তু মালামাল ভিতরে চলে গেছে সকলের আগে। এদিকে হুদা সাহেব অনেক খোঁজা খুঁজির পর বললেন তাঁর পরিচয় পত্র পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজা খুঁজির পর যখন পাওয়া গেল না পরিশেষে তখন তিনি একখানা ডুপ্লিকেট ইস্যু করিয়ে নিলেন। ছেলেদের এবং অন্যান্য সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ছেলেদেরকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে হাজী ক্যাম্পের বিমান অফিসের হজ্ব টার্মিনালে ঢুকে পড়লাম। আত্মীয় স্বজন সকলের সাথে এখানেই বিদায়। এখান থেকে বিমানের বাসে করে বিমান বন্দরে গিয়ে বিমানে আরোহন করতে হবে। বিমান অফিসে হজ্ব টার্মিনালে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমরা বিমানের যাত্রী হয়ে গেলাম। বাইরের আর কারো সাথে যোগাযোগ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। বিমানের কাউন্টার আমাদের কারো লাগেজ খুললনা। ওজন করে টেপ লাগিয়ে দিল। অতঃপর বোডিং কার্ড নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পাই, এখানে সকল হাজীরাই এহরামের দু'খন্ড শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে বসে আছেন। দেখলাম আমরা ৬জন এবং অপর জনা চারেক ব্যতীত ২৫০ জন যাত্রীর সকলেই এহরাম পরিহিত অবস্থায় বসে আছেন। অর্থাৎ আমরা এই জনা দশেক মদিনার এবং বাকী সকলেই মক্কার যাত্রী। তাঁরা প্রথমে মক্কায় গিয়ে ওমরাহ শেষ করে মদিনায় যাবেন। জেয়ারত করে হজ্বের আগে পুনরায় মক্কা এসে ওমরাহ এবং হজ্ব দুই করবেন। এই পদ্ধতি কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ)র মত অনুযায়ী শরীয়ত সিদ্ধ নহে। আমাদের ওলামায়ে কেরামগণ এ'ব্যাপারে মোটেই যত্নবান নহেন বলেই মনে হয়। জনৈক মৌলানা সাহেব ক্ষুদ্র মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তলবীয়া পাঠ করাচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে মক্কা মদিনায় সারা পথে কি ভাবে চলতে হবে, কি করতে হবে ইত্যাদি উপদেশ দিচ্ছেন। আমরাও সকলের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে "লব্বাইকা আল্লাহুম্মা লব্বায়েক" পড়তে শুরু করলাম। সাথে সাথে পিছনকে ফেলে মন চলে গেল মদিনা মুনওরায়া আর মক্কা মোয়াজ্জেমায়। মৌলানা সাহেবের উপদেশের সারবস্তু হল– আমরা যেন আরব দেশে আমাদের সকল কাজে ধৈর্য অবলম্বন করি, কেহ মন্দ বললেও যেন প্রতিবাদ না করি। মোয়াল্লেমের সাথে যেন কোন ঝগড়া না করি। আমাদের আচারে আচরণে, কাজে কর্মে দেশের যেন কোন দুর্নাম না হয়। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য যেন কায়মনোবাক্যে দোয়া করি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলে পিলে ও আত্মীয় স্বজন সকলের সাথে এখানেই শেষ বিদায় হয়ে গেল। অতঃপর বিমান–বাসের শেষ ট্রিপে বিমান বন্দরে এসে পৌঁছি। এখানে কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়নি। লাউঞ্জে এসে বসতেই তবলীগ জমায়েতের জনৈক আলেম বেশ কিচুক্ষণ নসিয়ত প্রদান করলেন। সুষ্ঠু ও শুদ্ধভাবে, শরীয়ত সম্মত পন্থায় কিভাবে হজ্ব পালন করা যায় সে সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরে বিস্তারিত বয়ান করলেন। অতঃপর ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে বিমানে আরোহণ করলাম।

হজ্বযাত্রী বহনের জন্যে বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ভাড়া করা একটি ডি, সি–৮ বিমান আনা হয়েছে। অতি পুরানো একটি রদ্দিমার্কা এই বিমান। খুব সম্ভবত

www.pathagar.com

ব্যবহারের অনুপযোগী, অকেজো পরিত্যাক্ত। বুলবুল একবার টয়লেটে গিয়ে বেরোবার সময় দেখে দরজা আর খোলে না। অবশেষে শব্দ শুনে আমি গিয়ে বাহির থেকে চেষ্টা করে ও দরজা খুলতে না পেরে ষ্টুয়ার্ডকে ডেকে আনি। তিনি ও খালি হাতে খুলতে না পেরে পরে হাতুরী রেঞ্জ এনে কৌশলে দরজা খুলে বুলবুলকে টয়লেট থেকে বের করি। ষ্টুয়ার্ড বললেন যে, আরো একবার এরকম হয়েছিল। এ দরজার তালাটি নষ্ট হয়ে গেছে। বিপুল সম্পদের অধিকারী অথচ ভাগ্যদোষে গরীব দেশ, বাংলাদেশ–বিপুল অর্থব্যয়ে এই বিমানটি কেন ভাড়া করেছিল আমাদের মত সাধারণ লোকের তা' জানার কথা নয়। বিমানের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ তা'জানেন। আশা করি এ ব্যপারে জাতিকে তারা ব্যাখ্যা দেবেন। সে যাক, বিমানটি মোটামুটি সুপরিসর, মধ্যখানে চলাচলের পথ রেখে দুদিকেই তিনটি করে আসন, তার এক সারিতে আমরা ৩ জনের ৩ স্ত্রী এবং তার পেছনের সারিতে আমরা ৩ জন আসন গ্রহণ করলাম। রাত্রি আড়াইটায় নির্ধারিত সময়ে বিমান আকাশে পাড়ি দিল। উঠে গেলাম ধরণীর ধূলা হতে ৩৬ হাজার ফুট উর্দ্ধে। বিমানের মধ্যে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে সকলেই তলবীয়া পাঠ করতে লাগলাম কিছুক্ষণ ধরে। বিমানের সরবরাহ কৃত নাস্তা খেয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম এলনা। আল্লাহর জিকির করতে করতে এগিয়ে চললাম। আমাদের ঘড়িতে ফজরের নামাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তবু ও সুবেহ সাদেকের লক্ষণ নাই। বাইরে ঘোর অন্ধকার। বুঝলাম আমাদের ঘড়ির হিসাবে এখানে সূর্য উঠবে না। সূর্যের গতির সাথে সমতা রক্ষা করে একই দিকে ছুটে চল্‌ছে আমাদের বিমান। ফলে এ রাত আমরা বৃহত্তম রাত হিসাবে পেয়ে গেলাম। অবশেষে বিমান হতে ঘোষণা দেয়া হল, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে। এখন থেকে ৪০ মিনিটের মধ্যে ফজরের নামাজ আদায় করে ফেলতে হবে। বিমানে ওজুর পানির ব্যবস্থা নেই বলে তৈয়মুমের মাটি সরবরাহ করা হল। তৈয়মুম করে নিজ আসনে বসেই ফজরের নামাজ আদায় করলাম। তারপর জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলাম দিগন্তের পানে। ফুলের মত ভোর ফুটছে। উষার আলোকে পৃথিবী ঝলমল করছে। সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে, দার্জিলিংয়ের কাঞ্চন জঙ্গার শীর্ষে দাঁড়িয়ে সূর্য্য উদয়ের দৃশ্য অবলোকন যেমন অপরূপ, বিমান হতে সূর্য্য উদয়ের দৃশ্য আরো মোহনীয়। সেটা দেখেছিলাম ফেরার পথে। মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম। আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য ও চমৎ কারিত্বের জন্য। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর আমাদের বিমান অবতরণ করল দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। এখানে আমাদেরকে এক ঘন্টা অবস্থান করতে হয়। কিন্তু কাউকে বিমান বন্দরের টার্মিনালে যেতে দেয়া হয়নি। এমনকি নীচে মাঠেও নামতে দেয়া হয়নি। জনৈক ষ্টুয়ার্ডকে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন টার্মিনালে যেতে দিলে হাজী সাহেবানরা টার্মিনাল অপরিস্কার করে ফেলে এবং পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। এজন্য বিমান সে ব্যবস্থা করেনি। তবে বিমানের দরজাটি খুলে দিলেন। আমি এবং কয়েকজন হজ্বযাত্রী বাহির থেকে লাগানো সিঁড়ির প্রথম ধাপে গিয়ে ভোরের হাওয়ায় দূর থেকে এক নজরে বিমান বন্দরটি এবং আমাদের দেশে বহু কথিত দুবাই নগরীর আকাশটি দেখে নিলাম। এক সময়ে বুলবুলের ৩ ভাই দুবাই থাকত। তাই এই দুবাইয়ের প্রতি বুলবুলের কিছু আকর্ষণ ও কিছু মোহ ছিল। সুতরাং আমি সিটে এসে তাকে বললাম এসো দুবাই নগরী দেখে যাও। এই বলে তাকে ও বিমানের সিঁড়িতে নিয়ে গিয়ে দুবাই নগরী দেখিয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

জেদ্দা বিমান বন্দর

এক ঘন্টা পর আবার গর্জন করে বিমান আকাশে পাখা মেলল এবং কিছুক্ষণ পর জেদ্দার বাদশাহ্ আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করল। সৌদি আরবের মাটিতে প্রথম পা রাখতেই দেহ মন শিউরে উঠল। আনন্দে, আবেগে, অনুভূতিতে হৃদয় মন ভরে উঠল। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় শির অবনত হয়ে এল। এখান থেকেই সালাম ও দরুদ পাঠালাম আল্লাহর নবী করিম (সঃ) এর দরবারে–মদিনা মুনওয়ারা। টারম্যাক থেকে বাসে করে এসে হাজির হলাম বিমান বন্দরের বিশ্রাম কক্ষে।

জেদ্দার পুরানো বিমান বন্দর ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরের মত শহরের সাথে লাগানোই ছিল। বর্তমান বিমান বন্দর জেদ্দা শহর থেকে ৬০ কিঃ মিঃ দূরে। অতি প্রকান্ড সর্বাধুনিক বন্দর এই জেদ্দা বিমান বন্দর। সৌদি সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্যতম সেরা সৃষ্টি এই বিমান বন্দর। প্রতি মিনিটে এখানে বিমান উঠছে আর নামছে। অথচ বন্দর টার্মিনালে যাত্রী এবং অন্যান্য লোকজনের তেমন কোন ভীড় পরিলক্ষিত হল না। এই বন্দরে ৪টি টার্মিনাল আছে। একটিতে শুধু মাত্র আভ্যন্তরীন, আরেকটি আন্তর্জাতিক, আরেকটিতে রাজ পরিবারের সদস্য এবং অন্যটিতে কেবলমাত্র হজ্বযাত্রীরাই যাতায়াত করেন। এক টার্মিনাল হতে অন্য টার্মিনালটি অনেক দূরে এবং এক টার্মিনালে দাঁড়িয়ে অন্য টার্মিনাল দেখা যায় না। বিমানের ধরন অনুযায়ী নিজ নিজ টার্মিনালে সে হাজির হয় এবং তিনি যেই ধরনের যাত্রী সেই টার্মিনাল দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সেরে নগরে বেরিয়ে যান। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মত আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রীকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা বা বিদায় দেয়া এখানে সম্ভব পর নয়। কিছুক্ষণ পর মদিনার যাত্রী এবং মক্কার যাত্রীদেরকে পৃথক করা হল। আমরা কয়েক জন মদিনার যাত্রীকে ইমিগ্রেশন কক্ষে প্রবেশের ফটকে আনিয়ে দাঁড় করানো হল। আমাদের সাথের মেয়ে ছেলে দিগকে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে না দিয়ে সাথে সাথে ইমিগ্রেশন কক্ষে ঢুকিয়ে দিল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের সাথের এক প্রৌঢ় হজ্বযাত্রী সংগে তার বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে যাচ্ছিল। তার মাকে যখন ইমিগ্রেশন কক্ষে পার করিয়ে দেয়া হল তার সে কি ছটফটানি। সে ও জোর করে মায়ের সাথে ভিতরে ঢুকে যেতে চায়। কেননা তার মনে হচ্ছে তার মাকে যেন কোথায় নিয়ে যাওয়া হল। তিনি যেন সেখানে কিছুই চিনবেন না, হারিয়ে যাবেন। এই ভয়ে অর্থাৎ মাকে একা তিনি কোথাও যেতে দিতে রাজী নন। সম্ভবতঃ বাড়ীতে সকলে তাকে বলে দিয়ে ছিল ও সাবধান করে দিয়েছিল ভীড়ের মধ্যে মাকে ছেড়ে একাকী কোথাও যেন না যায়। অবশেষে তার কান্ড দেখে জনৈক সৌদি কর্মচারী এসে জানতে চাইলেন তিনি অমন করছেন কেন? সাথের একজন আরবী জানা সহযাত্রী তাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। অবশ্য আমরা অভ্যন্তরে যাওয়ার অনুমতি পেলে সেই প্রৌঢ় হজ্বযাত্রী সর্বপ্রথমে প্রবেশাধিকার পান এবং ভেতরে গিয়ে মায়ের সাথে মিলে শান্ত হন। ইমিগ্রেশনের

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমরা শুল্ক বিভাগে এসে পৌছলাম। প্রথমে ঢুকতেই দেহ তল্লাশী। আমার পকেটে কিছু পান সুপারী ছিল। লাগলো ফ্যাসাদ। তাকে বুঝাবার চেষ্ঠা করলাম। তিনি কি যেন ভাবলেন। অবশেষে ছেড়ে দিলেন। এখন লাগেজ খোলার পালা। লাগেজের প্রত্যেকটি জিনিষ খুলে তন্ন তন্ন করে দেখল। সাথে কিছু ঔষধ নিয়ে গিয়েছিলাম। ঔষধগুলি তাঁর হাতে পড়তেই ডাক্তারের ডাক পড়ল। প্রত্যেকটি ঔষধ কোনটি কি জন্যে নেয়া হয়েছে ডাক্তার বুঝিয়ে দিলে তবেই ছাড়লেন। আমার হোন্ডলটি খুলে তোষকের অভ্যন্তরে কিছু নিয়েছি কিনা হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখবার সময় এক জায়গায় হাতের আংগুলের ডগায় একটি শক্ত তুলা বীচি ঠেকল। সাথে সাথে ছুরি দিয়ে তোষকের কাপড় কেটে সেটি বের করে দেখল, তারপর ছাড়ল। শুল্ক বিভাগের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে পুনরায় যখন আমি আর বুলবুল একসাথে আবার পরিপাটি করে লাগেজ গুলি বাঁধছিলাম দুজনেই হেসে উঠলাম–এই জন্যে যে এত তন্ন তন্ন করে দেখলেও আমাদের আসল জিনিষ ধরতে পারেনি। সেটি হল কিছু শুকটি মাছের গুড়ো। হেভার চেকের অভ্যন্তরে খুব সুন্দর পলিথিনের প্যাকেটে আবদ্ধ করে গন্ধ রূদ্ধ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে কাপড়ের ভাঁজের ভিতর বুলবুল সেটি রেখে দিয়েছিল। সেটি ধরা না পড়ায় বুলবুলের সে কি আনন্দ। অতঃপর বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমরা যে পথে বেরুলাম ইহা বিমান বন্দরের হজ্ব টার্মিনাল। এই টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করে নব নির্মিত হাজী ক্যাম্প। টার্মিনাল থেকে বেরুবার সাথে সাথেই দেখলাম আলম সাহেবের এক ভাগিনা ও আর এক নাতি আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আমার হাতে একটি ঠান্ডা পানির বোতল দিয়ে বল্‌ল ব্যাংক থেকে টাকা ভাঙ্গিয়ে নিন। পানির বোতলটি হাতে নিয়ে প্রথমে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারিনি। তাই কিছুক্ষণ 'থ' বনে রইলাম। মক্কা থেকে একজন লোক অভ্যর্থনা করতে এল, অন্যকিছু না, কেবল মাত্র একটি পানির বোতল কেন হাতে ধরিয়ে দিল ! অবশ্য তার আধঘন্টা পরেই বুঝতে পেরেছিলাম আরব দেশে এই পানির বোতলটিই গরমের দিনে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক, আদ্রতাহীন। মেঘশূন্য আকাশে প্রখর রৌদ্র। আমাদের ভ্রমনকাল জুলাইয়ের শেষে, গ্রীষ্মের প্রখরতা ছিল অত্যন্ত তীব্র। সুতরাং অতি ঘন ঘন পানির পিপাসা এবং পিপাসার সাথে সাথে পানির প্রয়োজনীয়তা অতি তীব্র ভাবে অনুভূত হয়। পিপাসার সেই কাতরতা বাংলাদেশে থেকে অনুভব করা সম্ভব নয়। পর পরই হুদা সাবেহ ও আলম সাহেব ও বেরিয়ে এলেন। হুদা সাহেবের দুঃখ তাঁর স্ত্রীর পান খাওয়ার সাদা পাতাগুলি শুল্ক বিভাগ নিয়ে ফেলে দিয়েছে। অতঃপর হাজী ক্যাম্পের একটি বাঙ্কে এসে বসলাম। মালপত্র সব এক জায়গায় জড়ো করে রাখলাম।

এই হাজী ক্যাম্পটি অতিসম্প্রতি নির্মিত। বাঙ্কে বসে উপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্যাম্পটির নির্মান কৌশল অতি আধুনিক। ইহা কোন গৃহ নয়, এর তিন দিকে উন্মুক্ত। একদিকে বিমান বন্দরের প্রাচীর। মাথার অন্ততঃ ৩০ থেকে ৪০ ফুট উপরে বিরাট আকারের কেনোপি অর্থাৎ চাঁদোয়া (বৃহদাকার ছাতার মত)।

www.pathagar.com

বিরাট সুপরিসর ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোন স্তম্ভ বা পিলার নাই। কেবলমাত্র বহির্দ্বারের বাউন্ডারীতে সুউচ্চ কতগুলি পিলার। সেই পিলারের সাথে দড়ি দিয়ে একটির সাথে আর একটির সংযোগ করে অনেক গুলি চাঁদোয়া সংস্থাপন করা হয়েছে। জেদ্দা হাজী ক্যাম্প নির্মাণের এই নকশা নাকি জনৈক বাংলাদেশী প্রকৌশলীর তৈরী। নকশা অনুযায়ী ফাইবার গ্লাস নির্মিত এই পিলার ও চাঁদোয়াগুলি নাকি ইটালীতে নির্মাণ করে জেদ্দায় এনে সংস্থাপন করা হয়েছে। এই চাঁদোয়ার নীচে বাংকগুলি বৃত্তাকারে মধ্যখানে খালি জায়গা রেখে বসানো হয়েছে। এই বাংকগুলি ও ফাইবার গ্লাস নির্মিত। চাঁদোয়ার উপরের কেন্দ্রস্থলে আনুমানিক একফুট ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার মঠ্কার মুখের মত উন্মুক্ত ছিদ্র। বাংকে বসে সে চাঁদোয়ার কেন্দ্রস্থলের শুন্যতার মধ্য দিয়ে আকাশ পথে তাকিয়ে বিস্ময় মানলাম সৌদি কর্মকান্ড দেখে। এই হাজী ক্যাম্পের মাঝে মাঝে স্তম্ভের সাথে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র লাগানো আছে। আবার মাঝে মাঝে উন্মুক্ত তিনদিক হতে দমকা বাতাস ও এসে গায়ে লাগে। ফলে প্রচন্ড এই গরমের দিনেও তেমন তাপ অনুভূত হয় না। মোটামুটি স্বস্তিতে বসা যায়। কেহ কেহ বাংকে, আবার কেহ কেহ নীচে মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে থাকে। এই বিশাল হাজীক্যাম্পে হজ্বযাত্রীদের জন্য স্থান সংকুলান যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় এই ক্যাম্প বর্তমানে আরো সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ক্যাম্পের সাথে আরো দুটি ক্যাম্প নির্মাণাধীন দেখলাম। ক্যানোপি এবং স্তম্ভ ইত্যাদি সংস্থাপিত হয়ে গেছে তবে বাংক, মেঝে ও অন্যান্য কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় এখনো ব্যবহার উপযোগী হয়নি। আগামী বৎসর বা তৎপরবর্তী বৎসর সমূহে এই সম্প্রসারিত ক্যাম্প ব্যবহৃত হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

হাজী ক্যাম্প স্থিত বাংলাদেশ হজ্ব মিশনের অনতি দূরে একটি অর্ধবৃত্তাকার বেঞ্চিতে আমরা বসার সাথে সাথে শেখ আবদুর রশিদ ওরফে শেখ রশিদ তাঁর স্ত্রী দুই কিশোর ছেলে ও এক কিশোরী মেয়েকে নিয়ে হাজির। শেখ রশিদ আমরা ছয় জনের জন্য তার বাসা থেকে পাক করে দুপুরের খাবার এবং কিছু ফলমুল নিয়ে আসেন। তিনিও প্রথমে আমাকে একটি পানির বোতল ধরিয়ে দিলেন। ততক্ষণে পানির বোতলের মর্যাদা বুঝতে শিখে ফেলেছি। তাই আর অবাক হলাম না। আগ্রহ সহকারে হাত পেতে নিলাম। পরে দুপুরের খাবারের সময় হলে তাঁর আনীত খাবার আমরা ৬ জনে তৃপ্তি সহকারে খেলাম এবং সহযাত্রী অন্ততঃ আরো ১০/১৫ জন হজ্বযাত্রীকে তৃপ্তিসহকারে ঐ খাবার খাওয়ানো হয়। কিন্তু শেখ রশিদ ও তাঁর পরিবারের কেউ আমরা অনেক বলা সত্বেও খেলেন না। আমরা পীড়াপিড়ী করাতে বললেন বাসায় গিয়ে খাবো। অথচ জেদ্দা শহরের উপকণ্ঠে অন্যূন ৬০ কিলোমিটার দূরে শেখ রশিদের বাসা। শুল্ক বিভাগ আমার তচনচ করে দেয়া হোল্ডঅলটি আমি পরিপাটি করে বাঁধতে পারিনি। শেখ রশিদের দুই ছেলে আমার আর হুদা সাহেবের এলোমেলো লাগেজ গুলি খুব পরিপাটি করে বেঁধে দেয়। দেখলাম ছেলে দু'টি বেশ ফুট ফুটে ও স্মার্ট। শেখ সাহেবের স্ত্রী খাবার সময় আমাদের পাশে বসে খাওয়া পরিবেশন করছেন এবং প্রত্যেকে সব কিছু পাচ্ছেন কিনা যত্ন সহকারে তত্ত্বাবধান

www.pathagar.com

করছেন। খেতে খেতে মনে হল তিনি যেন এক স্নেহময়ী মাতা ও ভগ্নী। অন্তরের দরদ মিশিয়ে খাবার পরিবেশন করছেন আপন জনকে, বিদেশের মাটিতে।

ফিরবার সময় শেখ রশিদের সাথে আবার দেখা হবে। তাই এখানেই তাঁর কিছুটা পরিচয় দিয়ে রাখি। তিনি হুদা সাহেবের আত্মীয় ও বন্ধু হন। বাড়ী চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি উপজেলার তৈলপারী গ্রামে। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কলকাতায় তদানিন্তন পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলীর পি, এ, ছিলেন। হোসেন আলীর সাথে তিনিও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কছেদ করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা উত্তর কালে নানা কারণে সেই চাকুরী তিনি আর গ্রহণ না করে সৌদী আরবে এসে প্রথমে ইসলামী ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক জেদ্দা শাখায় চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে সে চাকুরী ও ছেড়ে দেন এবং বর্তমানে সৌদী এরাবিয়ান এয়ার লাইন্সের সিনিয়ার ফিন্যান্সিয়েল এনালিষ্ট হিসাবে জেদ্দায় কর্মরত আছেন এবং জেদ্দা শহরের উপকণ্ঠে একটি বাসায় সপরিবারে বসবাস করছেন। হুদা সাহেব সস্ত্রীক হজ্বে যাচ্ছেন এই খবর পেয়ে তিনি জেদ্দা বিমান বন্দরে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। হুদা সাহেবের দলে ৬ জন আছেন এই খবর সম্ভবত তিনি হুদা সাহেবের কাছ থেকে পূর্বেই পেয়েছিলেন।

আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে যারা মক্কার যাত্রী ছিলেন তারা সহজেই বাস পেয়ে গেলেন এবং মক্কা চলে গেলেন। আমরা যারা মদিনার যাত্রী সহজে বাস পেলাম না। কমপক্ষে ৪২ জন না হলে একটি বাস পাওয়া যায় না। আমরা সংখ্যায় মাত্র জনা দশেক। অন্য দেশের ভিন্ন ফ্লাইটের যাত্রীদেরকে নিয়ে ও অমাদের মদিনা যাত্রীর সংখ্যা ২০ পেরুলনা। এমতাবস্থায় আমরা বাংলাদেশ হজ্ব মিশনের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁরা বললেন হয় আমাদেরকে পরবর্তী বাংলাদেশ ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে নতুবা অন্য কোন দেশের হজ্বযাত্রীদের সাথে বাসে দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে তাঁরা চেষ্টা করবেন। আলম সাহেব এই অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে ছোট্ট গাড়ী ভাড়া করে মদিনার পথে যাত্রা আরম্ভ করতে খুব জোর দিলেন। হুদা সাহেবের তা মনঃপুত নয়। অবশেষে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমি বাংলাদেশ মিশনে গেলাম। হুদা সাহেব ও ছিলেন সাথে। জনৈক ফ্লাইট ল্যাফটেন্যান্ট নামটা ভুলে গেছি, অত্যন্ত অমায়িক ভদ্র লোক। তাঁকে আমাদের সমস্যার কথা বললে তিনি আমাদেরকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে না যেতে অনুরোধ করলেন। কেননা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমরা মদিনা রওয়ানা হলে আমরা যে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বাসভাড়া সমেত ৮৬৯ রিয়াল প্রদান করেছি তার বড় অংশ বৃথা যাবে' নষ্ট হবে। তার চেয়ে ও বড় কথা তিনি যা বললেন সেটা হল যে, জেদ্দা ও মদিনার পথে প্রায় ৮ জায়গায় পুলিশ চেকপোষ্ট আছে। ভ্রমণ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্রে কোন রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে সে যাত্রীকে পুলিশ আর যেতে দেবে না। ড্রাইভার তখন তাকে ফেলে চলে যাবে। ঐ অবস্থায় কেউ তার দায়িত্ব

www.pathagar.com

নেবে না এবং সমূহ বিপদের আশংকা দেখা দিতে পারে। তিনি আমাদের সেই ঝুঁকি না নিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বললেন যে, তিনি আমাদের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। আমরা যেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। একটা উপায় হয়ে যাবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে আশ্বাস দিলেন।

অনন্যোপায় হয়ে নিজ বেঞ্চিতে এসে আবার আসন নিলাম। এই বার চাঁদোয়ার ছিদ্র দিয়ে আকাশ পানে নয়, চারিদিকর পরিবেশের, অন্যান্য দেশের হজ্ব যাত্রীদের আনাগোনা ইত্যাদি দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার হজ্বযাত্রী ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায় সম সংখ্যক নারী আর পুরুষ এবং এরা সকলে সব সময় দলবদ্ধ হয়ে থাকে। সকলের পোষাক ও প্রায় একই ধরণের। আমাদের সম্মুখে আনুমানিক ২৫ ফুট দূরে নীচে মেঝেতে চাদর বিছিয়ে দিয়ে সকলে আসন গেড়ে বসেছে। আমাদের বাংগালী মহিলাদের মত মালয়েশীয় ও ইন্দোনেশীয়ার মেয়েরা এক কোনে জড়োসড়ো হয়ে বসে নেই। দেখলাম তারা দিব্যি এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। কেউ টয়লেটে যাচ্ছে বা স্নানাগারে গোসল করছে। মেয়েরা ২ থেকে ৪ জন করে করে দলে দলে হাঁটাহাঁটি করছে। দূরে কয়েকজন মেয়েকে দেখলাম পেন্ট পরা আঁটসাট জামা গায়ে দেয়া, তবে মাথায় পিছনের দিকে একটি শ্বেত শির–বন্ধনী।

এদের চলাফেরা দেখে আমার মনে হল যেন এরা ঢাকা চট্টগ্রমের নিউ মার্কেটকে ও হার মানিয়ে দিয়েছে। আবার যখন জোহরের সময় হয়ে গেল এই মেয়েদেরকেই দেখলাম মাথায় রক্ষিত শিরবন্ধনিটি খুলে দিল এবং সেখান থেকেই একটি সাদা কাপড় ঝুলে পড়ে তার সারাদেহ আবৃত করে ফেলল। এখন আপাদমস্তক আবৃতা এক পর্দানশীন মহিলা হজ্ব যাত্রী। এবং নামাজের সময় পিছনের সারিতে পুরুষদের সাথে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে গেছে। মালয়েশিয়ার মেয়েরাও অনুরূপ। অনেকেরই পিছনে মাথার ঝুঁটির উপর বোরখার সাদা কাপড়ে আরবী কালো অক্ষরে পরিচিতি জ্ঞাপক 'মালয়েশীয়া' শব্দটি লেখা। আমাদের হজ্বযাত্রীদের অধিকাংশ হজ্বযাত্রীই বৃদ্ধ এবং অতিবৃদ্ধ। যারা কম বয়স্ক তারাও পৌঢ়। তরুনের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার হজ্ব যাত্রীদের কে দেখলাম তাদের মধ্যে তরুন তরুনীর সংখ্যাই অধিক। মেয়েদের মধ্যে কয়েকজনকে একেবারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলে ও মনে হল এবং অনেকেই অবিবাহিতা বলে ও অনুমিত হয়। মালয়েশীয়া ইন্দোনেশিয়ার হজ্বযাত্রীদের সাথে আলাপ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভাষাই প্রধান অন্তরায়। সালাম দিযে করমর্দন করে অন্তরংগ হওয়া যায়। কিন্তু ভাষা মনের ভাব বিনিময়ে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এরা ইংরেজী জানে না। তাদের ভাষা আমরা বুঝি না। আমাদের ভাষা তারা বুঝে না। তবে মালয়েশীয়দের কেহ কেহ আরবী জানে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবী বলে কিছু কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মন খুলে আলাপ করা সম্ভব হয়নি। জেদ্দা বিমান বন্দরে টয়লেট এবং হাম্মামের খুব সুন্দর ও উন্নত ব্যবস্থা আছে। নারী এবং পুরুষের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত। আরবী ও ইংরেজীতে পুরুষ ও মহিলা লিখা আছে। যারা লেখা

www.pathagar.com

পড়া জানে না তাদের বুঝার জন্য আছে পুরুষ বা মহিলার ছবি। ছবিটি বলে দেবে এই শৌচাগার মহিলার না পুরুষের। সৌদি সরকার এই হাজীক্যাম্পের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। শৌচাগারটির এক ধারে হাম্মাম অর্থাৎ গোসলখানা মধ্যখানে অজু বা হাত মুখ ধোয়ার জন্য একটি নলের দুইধারে টেপ ও অপর ধারে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা। ঐ শৌচাগারে ঢুকবার জন্য যে ফটক সেখানে মিউনিসিপ্যালটির ২জন কর্মচারী হাতে লম্বা লাঠির ব্রাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সৌদি সরকার খুব সম্ভবতঃ মনে করেন যে, হাজীরা এই সমস্ত শৌচাগার ব্যবহার করে অপরিস্কার করে ফেলবেন। তাই একজন লোক একটি শৌচাগার থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ফটকে দাঁড়ানো পৌরকর্মচারী তাতে প্রবেশ করে টয়লেটের অভ্যন্তরস্থ টেপ খুলে হাতের ব্রাশ দিয়ে তা পরিস্কার করে দেবে। যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাতে প্রবশ করে কোন অপরিচ্ছন্নতা দেখতে না পায়। বসার স্থানে ও দেখেছি এই সব পৌরকর্মচারীরা কেহ হাতে ব্রাশ, কেহ কালো রংয়ের পাতলা হালকা মাঝারী ধরনের একটা পলিথিনের থলে হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন যাত্রীর হাত থেকে কোন বস্তু ফেলা মাত্র থলে ওয়ালা লোক তা তুলে নিয়ে থলের ভিতর পুরবে। খাওয়া দাওয়া বা পানি পড়ে কোন স্থান অপরিচ্ছন্ন হলে ব্রাশওয়ালা লোক তা সাথে সাথে মুছে পরিস্কার করে দিচ্ছে। এই সমস্ত পৌর কর্মচারীদের অধিকাংশই বাংলাদেশী। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ও সিলেটের লোকই বেশী। এই সমস্ত কর্মচারীরা তাদের কাজের মধ্যে বাংলাদেশের একশ্রেণীর লোকের মত কর্ত্তব্যে ফাঁকি দেবার কোন জো নেই। সেটা বুঝতে পারলাম যখন অনুরূপ একজন পৌরকর্মচারীকে বললাম যে ভাই তোমাকে কিছু বকশীস দেব, আমার এই লাগেজটা একটু বাসে তুলে দাও। ঐ স্থান থেকে বাসটি আনুমানিক ৩০ ফুট দূরে দাঁড়ানো ছিল। কিন্তু সে জবাব দিল আপনার লাগেজ বিনা পয়সায় সানন্দে আমি তুলে দিতাম। তবে সেটা আমি পারবো না। কেননা সুপারভাইজার আমাদের পাহাড়ায় আছে। তিনি দেখলেই পয়সার লোভে কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করেছি এই অপরাধে আমাকে শাস্তি দেবে। এমনকি চাকুরী ও যেতে পারে। বুঝলাম আমার দেশের মত এখানে কর্ত্তব্য কাজে ফাঁকি দেয়ার জো নেই। এখানে হাজী ক্যাম্পের একপার্শ্বে এক উল্লেখযোগ্য অংশে আছে একটি বিপণি বিতান। ফেরার পথে অনেক হাজী এখান থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার খরিদ করে থাকেন। প্রবেশের সময় সেই বিপনি বিতানে যাবার মানসিকতা ছিল না। যাই ও নি। ফেরার পথে অবশ্য গিয়েছিলাম। সে কথা পরে বলব।

এতক্ষণে আলম সাহেব অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আগত তাঁর নাতি ও ভাগ্নে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মোটর গাড়ী ভাড়া করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। আমরাও অধৈর্য হয়ে তাতে সায় দিয়ে ফেল্‌লাম। শেখ রশীদ সাহেব বললেন, তাহলে আমাকে পাসপোর্ট দিন। আমি তানাজুল নিয়ে আসি। তানাজুল অর্থাৎ রিলিজ বা মুক্তি। আমরা ব্যালটি হাজী। আমাদের জন্য সৌদি সরকারের দায়িত্ব আছে। তারা কোম্পানীর মাধ্যমে মোয়াল্লিম নিযুক্ত করেছেন

www.pathagar.com

আমাদেরকে সহায়তা দানের জন্য। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রিলিজ বা তানাজুল না নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কারো যাত্রা করা আইনতঃ নিষিদ্ধ। অতএব আমরা শেখ রশিদকে তানাজুল নিবার জন্য পাসপোর্ট ছয়টি দিয়ে দিলাম। তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন এই সময়ে বাংলাদেশ হজ্ব মিশন থেকে মাইকে ঘোষণা দেয়া হল, " বাস পাওয়া গেছে, মদিনার জন্য প্রতীক্ষারত বাংলাদেশী হাজী সাহেবানরা আসুন।" আর তানাজুল নেয়া হল না। শেখ রশীদ শুদ্ধ মালপত্রনিয়ে সকলেই ছুটাছুটি করে বাসের কাছে এক রকম ছুটে এলাম। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাস দেখিয়ে দেয়া হল। কিন্তু বাসে উঠার অনুমতি পেলাম না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জানতে পারলাম কতিপয় পাকিস্তানী হজ্বযাত্রীদের সাথে একযোগে এই বাসে আমাদেরকে মদিনা পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তাদের সংখ্যাবেশী এবং সকলের একত্রে বাসে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তাই তারা অন্য একটি বাসে চলে গিয়েছে। আমারা পড়ে রইলাম হাজী ক্যাম্পেরই অভ্যন্তরে বাসের রাস্তার ধারে। এই অবস্থায় বিমানের কেউ কেউ বললেন পরবর্তী ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সেই যাত্রীদের নিয়ে একসাথে মদিনা যাবার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ আরো ২৪ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। শেখ রশীদকে বাসায় চলে যেতে বললে তিনি আমাদেরকে বাসে তুলে না দিয়ে কিছুতেই যেতে চান না। কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে এই পর্যন্ত কিছুই খাননি। এই কারণে আমরা তাকে জোর করে বাসায় পাঠিয়ে দিলাম। হজ্ব মিশনের আরেকজন কর্মচারী এই অবস্থায় আমাদের জন্য আরেকটি বাসের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। দেখলাম তিনি ঐ রাস্তার ধারে একটি টেবিলের পাশে বসা এক নিগ্রো ভদ্রলোককে বাসের কথা বলছেন। এই ভদ্রলোক তথায় বাসের লাইনম্যান বলে আমার মনে হল। মিশনের কর্মকর্তা আমাদের কথা বলতেই নিগ্রো ভদ্রলোক বললেন "কম নফর"? অর্থাৎ কতজন লোক? আমাদের লোক সংখ্যা জেনে তিনি অপেক্ষা করতে বললেন এবং ঐদিনের মধ্যেই আমাদের বাসের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। আমরা ও আশা নিরাশার দ্যোদুল্যমানতায় নিজ নিজ লাগেজের উপর বসে পড়লাম। অবশেষে মগরীবের সময় হয়ে এল। এমন সময় আমাদেরকে একটি বাসে উঠতে বলা হল। তৎমতে আমরা বাসে উঠলাম। মালপত্র সব তুলে দিলাম। কয়জন হাজী উঠলাম গুনে নেয়া হল। আর কয়জন দরকার তাও দেখা হল। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম দীর্ঘাকৃতির বলিষ্ঠদেহী লম্বা আলকেল্লা পরিহিত ফর্সা রঙের মাত্র কতিপয় হাজী আমাদের বাসে উঠে পড়লেন। গুনে দেখা গেল আসন সংখ্যা পুরা হয়েছে। ড্রাইভার উঠল আমাদের সকলের পাসপোর্ট নিয়ে নিল। একজন লোক যিনি এ ব্যাপারে সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন তিনি ডান হাতের তর্জ্জনি আর মধ্যম আংগুল জোড় করে একবার ঠোঁটের উপর রাখছেন আবার হাতটি নাড়ছেন। মুখে শব্দ করছেন 'মমনু'। বুঝতে পারলাম ঐ ভদ্রলোক বাসে ধুমপান নিষেধ বলে জানিয়ে দিচ্ছেন। পরে বুঝতে পারলাম বাস এত জোরে চলে এবং এত প্রবল বেগে বাতাস ভেতরে ঢুকে কেউ যদি তাতে ধুমপান করে বাসের ভেতর লংকা কান্ড হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

অবশেষে একদিকে মুয়াজ্জিন মগরীবের আজান দিচ্ছেন আর অপর দিকে বাসের ড্রাইভার ষ্টিয়ারিংয়ে বসে চাবি ঘুরিয়ে ষ্টার্ট নিচ্ছে। যাত্রা আরম্ভ হল। ভাবলাম অল্প কিছুদূর গেলে মগরীবের নামাজের জন্য গাড়ী থামবে। কিন্তু না, গাড়ী থামার নামগন্ধ নেই। এদিকে মগরীবের সময় যায় যায়। বাসের বাঙ্গালী হজ্বযাত্রীরা স্বভাবমতে হাঁকা বকা করতে শুরু করেছেন, মগরীবের নামাজ কোথায় পড়ব, ড্রাইভার গাড়ী থামাও ইত্যাদি শোর চিৎকার শুরু করল। কিছুক্ষণ পর বাস এসে একটি পেট্রোল পাম্পে থাম্‌ল। ভাবলাম এখানেই বুঝি মগরীবের নামাজের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু না, কাকশ্য পরিবেদনেষু ! পেট্রোল নেওয়ার পর গাড়ী আবার যাত্রা শুরু করল নামাজের ব্যবস্থা না করেই। তখন বাঙ্গালী যাত্রীরা অধৈর্য হয়ে শোর চিৎকার শুরু করে দিল। লক্ষ্যণীয় যে, বাসে ভিনদেশী যে যাত্রীরা উঠেছেন তারা ও হজ্বযাত্রী। কিন্তু তারা নির্বিকার, নিশ্চিন্তে বসে আছেন। মগরীবের সময় চলে যাচ্ছে এ সম্পর্কে একটি শব্দও কারো মুখ দিয়ে বেরুল না। মনে হল যেন তারা পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে। মগরীবের নামাজ না হলে যেন তাদের কোন পরোয়া নেই, এই ধরনের ভাব। পশ্চিম আকাশের শেষ লালিমা টুকু মুছে যায় যায় অবস্থা। অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত। অর্থাৎ মগরীবের সময় অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমি গাড়ীতে বসা অবস্থায় তৈয়মুম করে মগরীবের নামাজ পড়ে ফেললাম এবং সাথীদেরকেও পড়তে বললাম। কিন্তু কেউ পড়ল না। অবশেষে একস্থানে গিয়ে বাস থামল। সেখানে ছোট্ট একটা মসজিদ। হুড়মুড় করে সকলে নেমে পড়ে মগরীবের নামাজ আদায় করলেন বাজামাত। আমিও সকলের সাথে এই সময়ে জামাতে শরীক হয়ে পুনরায় মগরীবের নামাজ আদায় করি। নামাজ সেরে পার্শ্ববর্তী একটি দোকানে ঢুকে এক কাপ চা খাবার জন্যে উদ্যত হলে ড্রাইবার বললেন সে ব্যবস্থা সামনে হবে। বাস চলল, অতিদ্রুত গতিতে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। আমি আর বুলবুল পাশাপাশি একটি সীটে বসেছিলাম গাড়ীর বাম দিকে। গাড়ীর ডানদিকে দেখি দুটি আসনের একটি আসন খালি, অপরটিতে লম্বা আলকেল্লা পড়া এক লোক উপবিষ্ট। এই সময়ে বুলবুলকে একটু সচ্ছন্দে গা হেলিয়ে বসবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে আমি স্ব আসন থেকে উঠে ডানদিকের খালি আসনটি গ্রহণ করি এবং অপর আসনে উপবিষ্ট ভিন্নদেশী হাজী সাহেবকে সালাম জানালাম। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন ও করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করে তাঁর সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। এতক্ষণ ধরে আমাদের মধ্যে বলাবলি হচ্ছিল যে আমাদের ভিন্নদেশী সহযাত্রীগণ মিশরীয়। আমি ও তাই তাকে মিশরীয় ভেবে মিশর সম্পর্কে ইংরেজীতে আলাপ করার চেষ্টা করলাম। দেখলাম ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন না এবং আমার সামান্যতম আরবী জ্ঞানের মাধ্যমে বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করায় তিনি তাঁর বেলায়েত অর্থাৎ বাড়ী মরক্কো বলে জানালেন। তখন ভুল ভাঙ্গল, বুঝতে পারলাম এরা মিশরীয় নয়, মরক্কোর অধিবাসী–বাদশা হাসানের দেশের লোক। কথা বলতে তাঁরও খুব আগ্রহ। আমার একটি কথার জবাবে অনেক কথা বলে ফেলেন যার একটি ও আমি

www.pathagar.com

বুঝতে পারিনি। আমার কথা ও তিনি তেমন হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হননি। ফলে আলোচনা জমিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এই সময়ে তিনি তাঁর থলে খুলে দুটি বৃহদাকারের সাগর কলা বের করলেন এবং একটি আমাকে দিয়ে অপরটি নিজে খেতে শুরু করলেন। আমি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়লাম, প্রথমে নিতে চাইলাম না। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে আরবের হাতে পড়েছি, না নিয়ে উপায় নেই, খানা খেতে হবে সাথে। বাম দিকে ফিরে বুলবুলকে যাচনা করলাম, সে নিলনা, তার সামনের সিটে হুদা সাহেবকে অফার করলাম। তিনিও রাজী হলেন না। অবশেষে কলাটি আমাকেই গলাধঃ করণ করতে হল।

গাড়ী চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে দেখি কোন কোন গাড়ী পেছন থেকে এসে আমাদের গাড়ীর বাঁদিক ধরে ওভারটেক করে চলে যাচ্ছে। কিছুদুর যাবার পর একস্থানে রাস্তার ডান পার্শ্বে বাসটি দাঁড়াল। আরবীর সাথে ইংরেজী লেখাদেখে বুঝতে পারলাম এটি একটি পুলিশ চেকপোষ্ট এবং এখানেই চেকিংয়ের কথা জেদ্দা হজ্ব মিশনে বলা হয়েছিল। গাড়ী থামার সংগে সংগে একটি থলে কাঁদে ঝুলিয়ে ড্রাইভার নেমে গেল। কিন্তু কোন যাত্রীকে নামতে দেয়া হল না। ড্রাইভার রাস্তা থেকে প্রায় ১০০ ফুট দূরে অবস্থিত পুলিশ অফিসে চলে গেল। বুঝলাম সেখানে পাসপোর্টের চেকিং হচ্ছে। আনুমানিক আধঘন্টার মধ্যে ড্রাইভার ফিরে এল, আবার যাত্রা শুরু হল। এভাবে পথে পথে বেশ কয়েকবার চেকিং হল। তবে সব কাজ ড্রাইভারই সম্পন্ন করেছে। আমরা শুধু গাড়ীতে বসে থাকলাম। আমাদের কোথাও কোন কাজে অংশ নিতে হল না। চল্‌তে চল্‌তে বাস আবার এক জায়গায় এসে থামল। এখানে সকলে এশার নামাজ পড়লাম। আমি আর আলম সাহেব গিয়ে কিছু পেপ্‌সী কোলা কিনে নিলাম ও গাড়ীতে বসে সকলে খেলাম। এভাবে পথে পথে বিভিন্ন জায়গায় গাড়ী থামানো হল এবং প্রত্যেকে ইচ্ছামত খাবার দাবার ও ঠান্ডা পানীয় কিনে খেল। রাত্রী দ্বিপ্রহরের পরে এক জায়গায় এসে গাড়ী যাত্রা বিরতি করল। মনে হল ইহা একটি সরাইখানা। আমি আর আলম সাহেব গাড়ী থেকে নামলাম। এগিয়ে গিয়ে সরাইখানার ময়দানে ঢুকলাম। এটি একটি মাঝারি ধরনের ময়দান। তবে তৃনাচ্ছাদিত নয় এবং মরুভূমির দেশে সেটা অকল্পনিয়। দেখলাম মাঠটি ছোট ছোট পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত। সরাইখানার সামনে সেই মাঠের উপর আমাদের দেশীয় টেবিলের উচ্চতার চেয়েও ৬ ইঞ্চি উচু কতগুলি টেবিল মাটির সাথে খুঁটি দিয়ে স্থায়ী ভাবে প্রোথিত। টেবিল গুলির প্রস্থ ২ ফুটের বেশী হবে না। তবে দৈর্ঘ্য প্রায় ৪/৫ ফুট। তারই সামনা সামনি ৬ ইঞ্চি নীচু করে অনুরুপ ভাবে বসবার জন্য চৌকির মত করে স্থায়ী ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি আর আলম সাহেব অনুরূপ একটি চৌকিতে গিয়ে বসলাম। আলম সাহেব বললেন যে, এটাই হল আরবের সনাতন প্রথা। ইহাই এদেশের চেয়ার টেবিল এবং দেখলাম আশে পাশের কয়েকটি চৌকিতে কয়েক জন আরব দুই পা তুলে চেপ্টা পেরে বসে গল্পগুজব করছে। কেউ সোলেমানী পান করছে, কেহ বা হুক্কা টানছে। সোলেমানী অর্থাৎ দুধ ছাড়া চা। আরব বাসীরা বিশেষ উপাদানে এই চা তৈরী করে। খেতে মোটামুটি সুস্বাদু। আরবের আবহাওয়ায় এই সোলেমানী খুব উপযোগী বলে মনে হল। তাদের মতে এই সোলেমানী পান করলে শরীরের ব্যথা বেদনা, জড়তা সব

www.pathagar.com

কেটে যায়। তাই তারা সোলেমানী পানে অভ্যস্ত। দুধ চা খায় না। আমি আর আলম সাহেব আমরা সোলেমানী পানে অভ্যস্ত নই। দুধ চা খেতে চাইলাম। দুধকে আরবীতে বলে হালিব, চা কে বলে শাই। সরাইখানার বেয়ারা প্রথমে আমরা সোলেমানী খেতে চাই কিনা জানতে চাইলে লা'লা' করে জবাব দিলাম। পরে হালিব শাই বলাতে একবার ব্যবহারযোগ্য কাগজের গ্লাসে করে দুই গ্লাস দুধ চা এনে দিল। আমরাও চৌকির উপর আরবী কায়দায় পা তুলে চেপটাপেড়ে বসে আরবীয়দের হুক্কা টানা দেখতে লাগলাম। এই হুক্কাগুলি বেশ বড় এবং নলগুলি ১০/১২ ফুট লম্বা ও মোটা। মনে মনে ভাবলাম শাহেনশাহ্ আকবর এই আরব দেশ থেকেই এই হুক্কা দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিলেন, নাকি আরব বাসীরাই সম্রাট আকবরের হুক্কা দেখে আরবে তা প্রচলন করেছিলেন। কথাটা আলম সাহেবকে বলাতে তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমি ভেবেছিলাম আরবীয়রা বুঝি এক কাপ চা খাওয়ার পর বাংলাদেশে সেকালের গ্রামের চায়ের দোকানের মত সারাদিন বসে বসে হুক্কা টানে। তামাকটা তখন বাংলাদেশের চায়ের দোকানে বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হত। আরবের এই সরাইখানায় কিন্তু এক কাপ চায়ের দাম এক রিয়াল হলেও এক চিলিম তামাকের দাম ২ রিয়াল। অর্থাৎ আমাদের অন্যূন ষোল টাকা। স্থানীয় আরবরা এক কাপ চা খেয়ে সম্ভবতঃ অন্য মাদক দ্রব্যের অভাবে ২ রিয়ালের তামাকেই নেশার সাধ মিঠায়। এতো গেল সরাইখানার বাইরে মাঠের অবস্থা। যেমন আমাদের দেশে কোন কোন হোটেল রেস্তোরায় বাইরে লন এর সুব্যবস্থা আছে। সরাইখানার ভিতরে উঁকি মেরে দেখলাম সেখানে আধুনিক পন্থায় চেয়ার টেবিল সাজানো এবং ২/১ জন খদ্দের সেখানে বসে আধুনিক কায়দায় চা পান করছে। সরাইখানাটি দোতলা। মনে হল উপরে থাকার ব্যবস্থাও আছে। বাস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে দেখে আলম সাহেব সকলের জন্য পানীয় কিনতে উদ্যত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ফলের জুস, পেপ্সি বা সেভেন আপ ইত্যাদি কিছু কিনবেন, নাকি বোতল ভর্ত্তি পানি (মিনারেলওয়াটার) কিনবেন। উল্লেখযোগ্য এদেশে টিনভর্ত্তি ফলের জুস, পেপ্সি, সেভেন আপ ইত্যাদি এবং বোতল ভর্তি পানি প্রচুর পাওয়া যায়। এক বোতল পানির দাম এক রিয়াল আবার একটিন ফলের জুস বা পেপসির দামও এক রিয়াল। আবার প্রত্যেকটি টিন বা বোতল একই ফ্রীজের একই স্থানে রাখা হয়। ফ্রিজ খুলে নিজের পছন্দমত নিয়ে কাউন্টারে গিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। আলম সাহেবকে বললাম এদেশের জলবায়ু এখনো তো ভালো করে বুঝতে পারছি না। এরিয়েটেড ওয়াটার অতিরিক্ত পান করলে হয়তো কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কিন্তু সাদা পানি অতিরিক্ত পান করতে আমাদেরকে প্রত্যেকে উপদেশ দিয়েছেন। সহযাত্রীদের নিকটও পানির বোতলই দেখা যাচ্ছে। অতএব একই দামে ফলের জুস বাদ দিয়ে বোতল ভর্তি সাচ্চা পানিই কিনতে বললাম। পানি নিয়ে বাসে উঠে বসলাম। ড্রাইভার একবার দাঁড়িয়ে পিছন দিকে দেখে নিল সবাই উঠেছে কিনা। অতঃপর আবার যাত্রা শুরু হল। পথিমধ্যে এরূপ আরো কয়েক জায়গায় গাড়ী থেমেছে।

www.pathagar.com

মদিনা মুনওয়ারা

অতঃপর মাগরীবের আজানের সময় শুরু করে ৪৫০ কিঃ মিঃ রাস্তা অতিক্রম করে মদিনা মুনওয়ারা এসে যখন পৌঁছলাম তখন ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেছে। মদিনায় এসে বাস থামল। বাম পার্শ্বে মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বামদিকে নজর দিতেই 'গম্বুজে খাজরা' (সবুজ গম্বুজ) নজরে এলো, সাথে সাথে এক অজানা আবেগ–অনুভূতি, শিহরণ, আনন্দ ও আহ্লাদে সমস্ত দেহমন ভরে উঠল। অশ্রুজলে দুচোখ পূর্ণ হয়ে গেল, হৃদয় গগনে শির অবনত করে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ নজরে আসার সাথে সাথে বাস থেকে নেমে দৌড়িয়ে রওজা শরীফের কাছে গিয়ে সালাম পেশ করবার ও জেয়ারত করবার কথা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে উল্লেখ থাকলেও আমাদের গাইড তখনও এসে না পৌছায় আমাদেরকে বাস থেকে নামতে দেয়া হল না। সুতরাং বাসে বসেই সালাম পেশ করলাম সরওয়ারে দোজাহান হয়রত আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর দরবারে–যে রওজা মোবারক এক নজর দেখবার জন্য এতকাল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন লোক বাসে উঠে পরিস্কার বাংলা ভাষায় বলতে লাগলো যে বাঙ্গালী কতজন আছেন। ইতিমধ্যে আমাদের লাগেজ নেমে গেছে। আমাদের সকলের হদীস নিয়ে তিনি আমাদের বাস থেকে নামালেন। তার পরিচয় জানতে চাইলে জানালেন তিনি মোয়াল্লেমের লোক। নাম সিরাজুদ্দিন, বাড়ী সিলেট। সিরাজ বললো, থাকার ঘর আছে। ১৫০ রিয়াল করে ভাড়া দিতে হবে। বাস থেকে নামার সাথে সাথে পবিত্র মদিনা শরীফের মাটিতে পা রাখবার সময় আমার পায়ের ব্যথা ছিল একথা আমি অনুভব করি নি। আল্লাহর অপরিসীম মেহেরবানীতে মদিনা মুনওয়ারায় পা রাখার সাথে সাথে আমায় আর খোঁড়াতে হয়নি। যদি ও একটু একটু ব্যথা অনুভব করছিলাম। বুলবুলের বগলের সেই ফোঁড়া ও মদিনায় আর দেখা যায় নি। সম্পূর্ণ রূপে উপশম হয়ে গেছে। সিরাজুদ্দিনের সাথে তার নির্দ্দেশ মত কিছুদূর হেঁটে চললাম। তার লোকজন আমাদের মোট বয়ে নিল। একটি ঘরের বারান্দায় আমাদের মালামাল রেখে সকলকে নিয়ে অন্য একটি ঘরে ঢুকল। ঘরটি পুরানো, স্যাত স্যাতে অন্ধকার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ট। সেখানে অন্যান্য কতিপয় হাজী বিছানা পাতলো। ঘরটি আমাদের পছন্দ হয়নি। আমাদেরকে একটি ভালো ঘর দিতে বললাম। সিরাজ বলল এ ঘর আপনাদের জন্য নয়। আপনাদেরকে ভালো ঘর দেবো। তবে পয়সা একটু বেশী দিতে হবে। আমরা রাজী হলাম। তখন পায়ের ব্যথার অজুহাতে আমাকে মালামাল এবং মেয়েদের পাহারায় ঐ বারান্দায় বসিয়ে রেখে হুদা সাহেব আর আলম সাহেব সিরাজকে নিয়ে ঘরটি দেখতে গেলেন। এসে রিপোর্ট করলেন, ঘরটি তিনতলায় মসজিদে নববীর সন্নিকটে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সংলগ্ন বাথরুম ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরটি মোটামুটি আলম সাহেব আর হুদা সাহেবের পছন্দ হয়েছে। তবে ভাড়া নিয়ে শুরু হল দরকষাকষি। সিরাজের মতে ঐ ঘরটি ১২জন লোকের থাকার ঘর। সুতরাং জন প্রতি ১৫০ রিয়াল হিসাবে বার জনের ১৮০০ রিয়াল ভাড়া দিতে

www.pathagar.com

হবে। আমরা সংখ্যায় ৬ জন। আমাদের ভাড়া দেবার কথা ৯০০ রিয়াল। সিরাজ বললো ১২ জনের স্থলে ২জনের কমিয়ে ১০ জনের ভাড়া দিবেন। হুদা সাহেব বললেন আমরা ৬ জনের স্থলে ২ জনের বাড়িয়ে ৮ জনের ভাড়া দেবো। এ বিষয়ে ভাড়া সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ৩ জনেই আমার কাছে বিষয়টি রিপোর্ট করলেন। ব্যাপারটি বুঝতে পারলাম। অগত্যা আমি আরো একজন বাড়িয়ে দিলাম। সিরাজ আরো একজন কমিয়ে দিল। অর্থাৎ আমরা ৬ জন থাকলেও ৯ জনের ১৩৫০ রিয়াল ভাড়া দিতে হবে। তাতেই সকলে রাজী হল। এই সময়ে মসজিদে নববীর মিনার হতে সুমধুর কণ্ঠে ফজরের নামাজের আজান ধ্বনি শুনা গেল। আমরা মালামাল ফেলে নামাজে যোগদান করতে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। সিরাজ বলল ব্যস্ত হবেন না। এই বেলা নামাজ আপনারা ঘরেই পড়বেন। জোহর থেকে আপনাদের নামাজ মসজিদে নববীতে শুরু হবে এবং ৪০ ওয়াক্ত এক নাগাড়ে শেষ করবেন। তবে ইচ্ছে করলে আপনারা ১০ দিন পর্যন্ত এখানে থাকতে পারবেন। তার কথাই মেনে নিলাম। সিরাজের লোকজন আমাদের মালামাল বয়ে নিয়ে উপরে তুলে দিল। সে জন্য ১০ রিয়াল তাকে দিতে হল। সিরাজ ঘর বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলাম, ঘরটি ১১ ফিট X ১৬ ফুট বিশিষ্ট একটি কক্ষ। তার মেঝেতে ১২ খানা ছোট ছোট ফোম এবং ফোমের বালিশ তার উপরএকটি করে চাদর পাতা রয়েছে। দেখে বুঝলাম অতি সুন্দর ব্যবসায়ী কৌশল। ১২ জন লোক এই ঘরে থাকলে তাদেরকে আর নড়াচড়া করতে হবে না। একজনের সাথে একজন লেগে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হবে। কিন্তু ফোমের বিছানা পেতে তারা দেখাবার চেষ্টা করছে যে এটা ১২ জনের থাকার ঘর।

সে যাকগে। আমরা বিছানাপত্র খুলতে আরম্ভ করলাম। এমন সময়ে লম্বা আল খেল্লা ও লুঙ্গি পরিহিত মুখে খাট খাট কাঁচা পাকা দাঁড়ি, মাথায় সাদা গোলটুপি পরিহিত একজন ভদ্র লোক ঘরে ঢুকে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন– "আপনারা কে? কার হুকুমে এখানে ঢুকেছেন?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম– "আপনি কে"? উত্তরে তিনি জানালেন–"আমি এই ঘরের মালিক।" কিন্তু তাঁর কাপড় চোপড় ও চেহারা দেখে তিনি এই ধরনের একটি ঘরের মালিক হতে পারেন সেটা বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হলো। আমরা নতুন দেশে নতুন লোক। কথা না বাড়িয়েই সরাসরি বললাম–সিরাজ আমাদেরকে এই ঘরে এনেছে। তখন তিনি বললেন, সিরাজ এনে থাকলে ঠিক আছে। তবে দরদাম কথাবার্তা কি হয়েছে? আমরা বললাম সে সব সিরাজের কাছ থেকেই জানবেন। পরে জানলাম, এই ভদ্রলোকের নাম হাশেম, বাড়ী ফেণী। সে ঐ ঘরের দারোয়ান, সারাক্ষণ পাহারায় থাকে। যাত্রীদের তত্বাবধান করে, রান্নাবান্না, বাজার করা ইত্যাদিতে সহায়তা দান করে। যে কয়দিন ছিলাম, আমি তাকে হাশেম চাচা বলে ডাকতাম। বাজার করা থেকে শুরু করে রান্না বান্না সহ সকল কাজে সে আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল। মাঝে মাঝে আমরা আছরের সময় মসজিদে গিয়ে এশার পরে এসেছি। হাশেম চাচাকে বলে গেলে সে ভাতগুলি রান্না করে রেখেছে। একদিন মসজিদ হতে

www.pathagar.com

এসে অনেক ডাকাডাকি করে ওঁ হাশেম চাচাকে পেলাম না। পরে যখন দেখা হল প্রশ্নের উত্তরে বলল–"পার্শ্বের কক্ষের যাত্রীরা মক্কায় চলে যাওয়ায় ঘরটি খালি হয়ে গেছে। তাই বোর্ডার ধরবার জন্য বাস ষ্টেশনে গিয়েছিলাম।" বুঝলাম এইটাও হাশেম চাচার অন্যতম দায়িত্ব এবং এই দেশে প্রতিযোগিতা করে হাজীদেরকে ঘরের মালিকেরা বা এজেন্টরা নিজ নিজ ঘরে নিয়ে আসেন। বিদেশ ভ্রমণ কালে কোন জায়গায় উঠলাম তার ঠিকানা জেনে নেয়া দরকার। অন্যথায় হারিয়ে গেলে যথাস্থানে পৌছা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে হাশেম চাচাকে ঘরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জানালেন ঠিকানা নাই। পাঞ্জাব হোটেলের পাশে বললে লোকে দেখিয়ে দেবে। পরে জেনেছি আমরা যেখানে ছিলাম সেটা আবু জর গিফারী রোড থেকে পশ্চিম দিকে একটি প্রশস্ত গলি পথের ভিতর। গলিপথের মুখে আরবীতে একটি নম্বর লিখা আছে। সেটা টুকে নিলাম। সে গলিতে পাঞ্জাব হোটেল নামে একটি পাকিস্তানী হোটেল আছে। হোটেলটি মোটামোটি সকলের কাছে পরিচিত।

মসজিদে নববী

ফজরের নামাজ পড়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিই। তৎপর সকলে উঠে গা গোসল ধূয়ে সকালের নাস্তা করি। এই সময়ে আলম সাহেবের শ্যালক ভুলু এসে উপস্থিত। সে মদিনায় একটি কারখানায় কাজ করে। বেলা নয়টার দিকে পবিত্র মসজিদে নববী তথা বহু আকাংখিত, বহুদিন ধরে হৃদয়ে লালিত, পাক পবিত্র রওয়াজা মোবারকের পানে ভুলু সহ ৭ জন সকলে একসাথে ছুটলাম। গলিপথ থেকে বেরুতেই মসজিদে নববীর মিনার গুলো নজরে এলা। অজানা এক পুলক, ভক্তি, শ্রদ্ধা আর আবেগ নিয়ে দরুদ পড়তে পড়তে এগিয়ে চললাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌছে গেলাম। দেখলাম প্রকান্ড সুউচ্চ মসজিদে নববী। ভুলু আমাদেরকে মসজিদের পূর্ব দিকেই নিয়ে গেল। এই মসজিদে ঢুকবার জন্য নারী পুরুষদের পৃথক পৃথক ফটক আছে। এর একটি ফটক দিয়ে আমরা ৩জনের স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। আমরা সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে 'বাবে জিবরিলের' আগে 'বাবুন্নেছা' ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কিছুদূর অগ্রসর হলে পিছন দিক থেকে আলম সাহেব আমাকে আংগুলের একটি গুঁতা দিয়ে বামদিকে দেখিয়ে বললেন এই তো! অর্থাৎ এইতো রওজায়ে পাক। সাথে সাথে সেদিকে তাকিয়ে সালাম পেশ করলাম সৈয়দুল মুরছালিন, রহমতুল্লিল আ'লামিন সমীপে। অবশ্য পরে জেনেছি রওজায়ে মোবারক ঠিক এখানে নয়। আলম সাহেব আঙ্গুলির সংকেত করে যেটা দেখিয়েছিলেন সেটা রওয়াজা মোবারকের উত্তরাংশে "বিশ্বদুলালী, নবী নন্দীনী, খাতুনে জান্নাত, ফাতেমা জননী" (রাঃ) এর গৃহ এবং সেখানে বর্তমানে তাঁর ও শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) এবং হুজুরে পাক (দঃ) এর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী রক্ষিত আছে। আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাম দিকে

www.pathagar.com

মোড় নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলাম। আলম সাহেব ও হুদা সাহেব ইতিপূর্বে আরো একবার হজ্ব করেছেন। সুতরাং মসজিদের বিভিন্ন স্থান তাঁদের ভাল জানা। আমি আনকোড়া নতুন। বলে না দিলে কোনটা কি বুঝার উপায় নাই। এই স্থানে দাঁড়িয়ে বললাম–দুখ্লুল মসজিদের দুই রাকাত এবং শোকরানা আদায়ের জন্য ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ুন। তৎমতে ৩ জনেই নামাজ পড়লাম। অতঃপর আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। এইস্থানে কিন্তু প্রচন্ড ভীড় এখানে আমাদের বামদিকে অর্থাৎ মসজিদের পূর্বদিকে হাবীবে খোদা হায়াতুন্নবী হযরত রসুলে করিম (দঃ) এর রওজা মোবারক এবং ডান দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে মসজিদে নববীর মিম্বর। মসজিদে নববীর এই স্থানটিকে রিয়াজে জান্নাত অর্থাৎ বেহেশতের টুক্‌রা বা অংশ বলা হয়। এই স্বর্গীয় পূত পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে হুজুরের দরবারে বারবার সালাম পেশ করলাম। রিয়াজে জান্নাতে নামাজ পড়ার জন্য বারবার চেষ্টা করে ও ব্যর্থ হই। ভীড়ের মধ্যে ৩জন ৩ জনের কাছ থেকে হারিয়ে গেলাম। আমি তখন আরো কতিপয় হাজীকে অনুসরণ করে মসজিদের সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে দক্ষিণ দিকে ফিরে পূর্ব দিকে চলতে চলতে আবার রওয়াজা পাকের দক্ষিণে এসে দাঁড়ালাম। দক্ষিণের এই অংশটি মসজিদে নববীর মূল অংশ হতে একটি রেলিং দিয়ে পৃথক করা আছে। এখানে ঠিক মধ্যখানে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে নামাজের ইমামতি করেন। মূল মসজিদ থেকে রেলিং দিয়ে এটিকে পৃথক করার কারণ হল এই স্থানটি জেয়ারতের জন্যই চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। মদিনা মুনওয়ারা মক্কা মোয়াজ্জেমা হতে উত্তর দিকে। সুতরাং মসজিদে নববীতে দক্ষিণ মুখী দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া হয়। হযরত নবী করিম (দঃ) এর শিরমোবারক পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং চেহারা মোবারক কেবলা অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ফিরানো। সুতরাং মসজিদের দক্ষিণের এই স্থানে উত্তর মুখী হয়ে দাঁড়ালে হুজুরে পাক (দঃ) এর চেহারা মোবারকের সামনা সামনি দাঁড়ানো হয়। এই স্থানে এসে যখন দাঁড়ালাম দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যাকে আর রোধ করতে পারিনি। ভাবে, আবেগে তন্ময় বিভোর হয়ে সালাম জানালাম। পকেটে রক্ষিত অজিফা বের করে দরুদ ও সালাম পাঠ করতে আরম্ভ করলাম। এ সময়ে এখানে আমি বেশ দেরী করে ফেলে ছিলাম। হায়াতুন্নবী (দঃ) কবরের মধ্যে জীবিত আছেন –ইহা আমার বদ্ধমূল ধারণা। সুতরাং ভাবে তন্ময়ে বিভোর হয়ে আর সকলের কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। হুজুরে পাক (দঃ) এর জেয়ারত শেষে মুফ্‌তি আবদুর রহমান সাহেবের কিতাবের অনুসরণে আরো একটু পূর্ব দিকে সরে গিয়ে হযরত সিদ্দিক এ আকবর আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) চেহারা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করলাম। তারপর আরো একটু ডান দিকে সরে গিয়ে আমীরুল মো'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) এর চেহারা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকেও সালাম পেশ করলাম। অতঃপর রওয়াজা শরীফের জালি মোবারকের সমান্তরালে পূর্বদিকে গিয়ে উত্তর দিকে ফিরে দেখতে দেখতে উত্তর দিকে চলতে চলতে শেষ প্রান্তে আসলে সেখানে অত্যধিক ভীড় পরিলক্ষিত হল।

www.pathagar.com

জানলাম সেটা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাঃ) র ঘর। মসজিদে ঢুকার সাথে সাথে আলম সাহেব আংগুলি সংকেতে যেটা দেখিয়ে ছিলেন। হযরত ইমাম হাসান ও হোসেন (রাঃ) এই ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। শেরে খোদা আলী (কঃ) এই ঘরে থাকতেন। সে জন্য ইরানীরা বিশেষতঃ শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে অত্যধিক ভীড় করেন। অতঃপর যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সেই একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে কাঠের বাক্স হতে সেন্ডেল নেবার সময় হুদা সাহেবেরও দেখা পেয়ে গেলাম। দু'জনেই মেয়েদেরকে যেখানে এসে দাঁড়াতে বলেছিলাম সেখানে এসে দেখি তারা নেই। আলম সাহেব বা ভুলু কারো দেখা পেলাম না। দুজনেই ভাবলাম তারা এতক্ষণ অপেক্ষা করার কথা নয়। নিশ্চয়ই বাসায় চলে গেছে। বাসায় এসে দেখি যে আমাদের ঘরের দরজাটা তালাবদ্ধ। উল্লেখ্য যাবার সময় চাবিটা আমার কাছে ছিল। সেই তালাবদ্ধ দরজায় পিঠ রেখে নীচে মেঝেতে বুলবুল আর মিসেস হুদা বসে আছেন। বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করাতে ক্ষোভে, ক্রোধে তারা জবাব দিল–আলম সাহেব ও ভুলু এখানে এনে আমাদেরকে এভাবে বসিয়ে রেখে তারা খেতে চলে গেছেন। ভাবতে অবাক লাগল! তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। কিছুক্ষণ পর আলম সাহেব সস্ত্রীক ফিরে এলেন। এসেই অভিযোগ করলেন–"সোবহান সাহেব, আপনি মসজিদে এত দেরী করলেন কেন? মেয়েদের কষ্ট হয়েছে।" আবার তাজ্জব বনার পালা। মেয়েদের বলতে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রীর কথাই বলেছেন। আলম সাহেবের অভিযোগের কোন উত্তর দিলাম না। চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম কথাতো এমন ছিলনা। চট্টগ্রামে হুদা সাহেবের বাসায়, আলম সাহেবের বাসায় ৬ জন মিলিত হয়ে বিস্তারিত আলাপ করে স্থির করেছিলাম আমরা কষ্ট করবার জন্যই যাচ্ছি। আরাম করবার জন্যে নয়। হজ্বব্রত পালন খুব সহজ নয়, আরামদায়ক ও নয়। যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়। আমরা হোটেলে খাব না, কষ্ট করে বাসায় নিজেরা পাক করে খাব, নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী। আমরা নিজের আরাম খুঁজব না, কষ্টকে তুচ্ছ মনে করব। আল্লাহর রেজামন্দী হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে কষ্ট করে আল্লাহর এবাদতে মশগুল রাখব। ভাবলাম ভুলু হয়তো কোন আরামদায়ক পন্থা দেখিয়েছে যে জন্য আলম সাহেব মদিনা শরীফে প্রথম দিনেই সমষ্টিগত ভ্রমনের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজ ব্যক্তিগত আরামের সন্ধানে চলেছেন। রাত্রে দেখলাম ভুলু আমাদের ৬ জনের জন্য পাক করে খাবার নিয়ে এসেছে। আলম সাহেবের অনুরোধে সকলে খেলাম। খাবার কিছুক্ষণ পর আলম সাহেব আমাকে ঘর থেকে ইঙ্গিতে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন যে, ভুলু বলছে মদিনায় তিনি যে কয়েকদিন থাকবেন ভুলু তারা দু'জনের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে চায়। আমি কোন আপত্তি করলাম না। তারপর থেকে এক ঘরে থাকলে ও আলম সাহেবের খাওয়া দাওয়া, মসজিদে আসা যাওয়া সব তিনি পৃথক ভাবে করতে লাগলেন। আমরা বাকী ৪ জন একসাথেই রইলাম এবং একসাথে খাওয়া দাওয়া ও একসাথে মসজিদে যাতায়াত করতে লাগলাম। আলম সাহেব এখান থেকেই কার্যতঃ আমাদের নিকট হতে পৃথক হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

পরে একদিন মৌলানা আবদুল হালিম শাহ সাহেব বাসায় এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি চট্টগ্রামেরই অধিবাসী এবং হুদা সাহেবের পূর্ব পরিচিত। বহুদিন ধরে মদিনা মুনওয়ারায় অবস্থান করছেন এবং তিনি মসজিদে নববীর অন্যতম খাদেমও বটে। মসজিদে নববীতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নামাজের পৃথক স্থান নির্ধারিত আছে। নামাজের সময় নারী পুরুষ একত্রিত হতে পারে না। তবে ফজর ও জোহরের নামাজের পর জেয়ারতের উদ্দেশ্যে মহিলারা রওয়াজা পাকের সন্নিকটে গমন করতে পারেন এবং এই সময়ে মসজিদের মূল অংশে প্রবেশ করে রেয়াজে জান্নাত এবং অন্য যে কোন স্থানে নফল নামাজ আদায় করতে পারেন। সুতরাং প্রোগ্রাম হল পরের দিন ফজরের নামাজের পর আমরা বাসায় চলে আসব। সকালে নাস্তা করার পর ৭টার দিকে শাহ সাহেব আমরা ৪ জনকে নিয়ে মসজিদের বিভিন্ন অংশের সাথে ও রওয়াজা পাকের সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিবেন এবং জেয়ারত কার্যে সহায়তা দান করবেন। তদানুযায়ী পরের দিন সকালে শাহ সাহেবের সাথে আমি বুলবুল সস্ত্রীক হুদা সাহেব মসজিদে নববীর চত্বরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। শাহ সাহেব আংগুলি নির্দেশ করে একটি স্থান দেখিয়ে বললেন এখানেই ছিল আবু আয়ুব আনসারী (রাঃ) এর বাসগৃহ, যে ঘরের নীচের তলায় হুজুর করিম (দঃ) মদিনায় পদার্পন করে সর্ব প্রথম অবস্থান করেন। তারপর আরেকটি স্থান দেখিয়ে বললেন যে, এখানেই "আল কাসোয়া" হযরত (দঃ) এর উট এসে বসে গিয়েছিল। মক্কা হতে মদিনায় হিজরত কালে কোবা হতে এসে হুজুরের উষ্ট্র আল-কাসোয়া এ স্থানেই বসে পড়েছিল। এ স্থানের নিকটবর্তী গৃহটি ছিল আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহ। তাই হজরত (দঃ) আউয়ুব আনসারীর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং আল কাসোয়া যেখানে বসে পড়ে পরবর্তীতে সেখানেই মসজিদে নববী গড়ে উঠে। তখনকার দিনে এ স্থানটি জংগলাকীর্ণ ছিল। ইহার বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। এ জায়গাটি ছিল দু'জন বালকের সম্পত্তি। হুজুর করিম (দঃ) এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে মনস্থ করলে বালকদ্বয় তাহা বিনামূল্যে হযরতকে দান করতে প্রস্তাব করল। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা একটি নজির হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং স্বার্থবাদীরা ইহাকে নজীর দেখিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারে এ আশংকায় হযরত (দঃ) বালকদ্বয়ের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। পরিশেষে ১০ স্বর্ণমুদ্রা মূল্য প্রদান করে উহা খরিদ করেন এবং মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। হযরত (দঃ) স্বয়ং প্রতিদিন শ্রমিকের মত নির্মাণ কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। এভাবে মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হল। সে দিন মসজিদের আজকের মত আড়ম্বর ছিল না। আজকের মত এত বিশাল আয়তন ও ছিল না। সেদিন এই মসজিদের আয়তন ছিল মাত্র ১০০ হাত দৈর্ঘ্য ও ১০০ হাত প্রস্ত। প্রস্তর খন্ড দ্বারা দেয়াল তোলা হয়েছিল। খেজুর গাছের খুঁটির উপরে তক্তা বসিয়ে ইহার ছাদ দেয়া হয়েছিল। তখন এই মসজিদের কেবলা ছিল জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দেস।

সে দিন নিরাভরণ ছিল ক্ষুদ্র এই মসজিদুন্নবী। শাহ সাহেব মসজিদ অভ্যন্তরে অনুচ্চ রেলিং পরিবেষ্টিত মেঝে থেকে কিছুটা উঁচু একটি স্থান দেখিয়ে বললেন এই

www.pathagar.com

স্থানটিতে হুজুরে পাক (দঃ) বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে সাক্ষাৎ প্রদান করতেন এবং তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। মনের পর্দায় ভেসে উঠল ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস। এই মসজিদুন্নবীই ছিল একাধারে উপাসনালয় ও প্রশাসনিক সদর দপ্তর। এখানে বসেই সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রণ করা হত। কত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি এখানে সম্বর্দ্ধিত হয়েছেন, কত সন্ধিপত্র এখানে স্বাক্ষরিত হয়েছে! এখান থেকে যে নির্দেশ জারী হত তাতেই জগতের বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হত, বড় বড় সম্রাটের সিংহাসন টলে উঠত। আবার খলিফাতুল মুসলেমিন, আমীরুল মো'মেনীন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এখানে বসেই দিগ বিদিক জয় করেছিলেন। জরাজীর্ণ বস্ত্র পরিহিত হজরত ওমর এ নিরাভরণ ক্ষুদ্র মসজিদের এ স্থানে বসেই আঙ্গুলি সংকেত করলে অর্ধেক দুনিয়া কেঁপে উঠত। এখানে বসেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ওসমান গনি (রাঃ), এ মসজিদই ছিল মুসলিম বিশ্বের মিলন কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রস্থল। এখান হতেই হযরত নবী করিম (দঃ) ফরমান পাঠিয়েছিলেন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে। পারস্য সম্রাট খসরুর নিকট। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর নিকট, মিসরের শাসনকর্তা মুকাউকিস এর নিকট। এই সম্রাটদের মধ্যে একমাত্র পারস্য সম্রাট খসরু হযরত (দঃ) এর ফরমান এর অবমাননা করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে স্বীয় পুত্র শেরওঁয়ার হস্তে নিহত হন। মুকাউকিস কতৃক উপহার হিসাবে প্রেরিত দুষপ্রাপ্য শ্বেত বর্ণের অশ্ব হুজুর (দঃ) গ্রহণ করেছিলেন। এই অশ্বেরই নাম ছিল 'দুলদুল'–যাহা পরবর্তী কালে হযরত ইমাম হোসেন ব্যবহার করতেন। এ মসজিদের এই স্থানে বসেই সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় অপূর্ব স্পন্দন ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন মরুবাসী নিরক্ষর এক নবী (দঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন। কিন্তু আজ এ স্থান হতে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না। সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় না। এমনকি ধর্মের বাণী ও শোনানো হয় না। কেবলমাত্র দেখলাম সকল হাজী সাহেবানরা পারলৌকিক মঙ্গল হাসিলের জন্য এ স্থানে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করবার জন্য অতি ব্যাগ্র। তাই সব সময় এখানে ভীড় লেগেই থাকে। একজন উঠে গেলে আরেকজন সেস্থান পুরণ করে নামাজ আদায় করেন। আমরাও তাই এখানে নফল নামাজ পড়েছি। পরে একবার বুলবুলকে ও পড়বার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। স্থানটি যথাস্থানে ঠিকই আছে। আয়তনে খুব বড় নয়। মেঝে থেকে দেড় দুই ফুট উঁচু, প্রস্থে আনুমানিক ৫/৭ ফুট, দৈর্ঘ্য ১৫/১৬ ফুট। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এটুকুই হয়েছে যে সে দিন এই মেঝে ছিল সাধারণ মৃত্তিকার আর আজ মর্মর প্রস্তর খচিত। সে দিন এ স্থানের যে গুরুত্ব ছিল আজ কিন্তু তা নেই। এ স্থান আজ হারিয়ে ফেলেছে তার রাজনৈতিক গুরুত্ব, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্য। কেবলমাত্র ধর্মীয় মূল্যমানকে আঁকড়ে ধরেই দাঁড়িয়ে আছে যথাস্থানে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের আর্থসামাজিক কর্মকান্ডকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত থাকার নাম ইসলাম নয়। তাই

www.pathagar.com

সেদিন এই মসজিদে নববী হতেই একই সাথে ধর্ম এবং রাজনীতি উভয়ই নিয়ন্ত্রিত হত। ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে হযরত আলী যখন মসজিদে নববী হতে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করেন তখন হতেই মসজিদে নববী তার রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ইহা কেবলমাত্র উপাসনালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই যুগযুগ ধরে এ মসজিদ কেবলমাত্র মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকেই চাঙ্গা করে দিয়েছে মাত্র, দেয়নি কোন রাজনৈতিক প্রেরণা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক নির্দ্দেশনা।

অতঃপর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে বাম দিকে ঘুরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে রিয়াজে জান্নাতে পৌঁছলাম। এখানে দাঁড়িয়ে বামদিকে ফিরে হযরত (দঃ) এর হুজুরা মোবারকের প্রতি দৃষ্টি পড়লে শাহ সাহেব হুজুর (দঃ) কে সালাম পেশ করলেন। তাঁর মুখে মুখে আমরা ও বললাম। ডান দিকে ফিরে হুজুরের মিম্বরটি দেখালেন এবং বললেন এই রিয়াজে জান্নাত বা বেহেশতের অংশ বা বাগানে দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করা অতীব পুণ্যের কাজ। কিন্তু এস্থানে সব সময় এমন ভীড় লেগে থাকে যে সেখানে নামাজ পড়া অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। তাই অপেক্ষাকৃত ভীড় কম এরূপ একটি স্থানে দাঁড়িয়ে শাহ সাহেব আমাদেরকে রিয়াজে জান্নাতের স্তম্ভ সমূহ একটি একটি করে দেখিয়ে পরিচিতি বর্ণনা করলেন। মেহরাবে নববীর ডান পার্শ্বে একটি স্তম্ভ দেখিয়ে বললেন–এখানে মসজিদ প্রথমে নির্মাণকালে একটি খেজুর বৃক্ষের খুঁটি ছিল। সপ্তম হিজরীতে নবী করিম (দঃ) এই মসজিদ সম্প্রসারণ করার সময় উক্ত খেজুর গাছের খুঁটিটি পরিত্যক্ত হলে খুঁটিটি উচ্চস্বরে কান্নাকাটি আড়ম্ব করে দেয়। পরে হযরত (দঃ) ঐ খুঁটিটির গায়ে হাত বুলিয়ে কেয়ামতের দিন একই সাথে উঠার এবং বেহেশ্‌তে স্থান লাভের আশ্বাস প্রদান করে শান্ত করে মাটির মধ্যে সমাহিত করে রাখেন। সেই খেজুর বৃক্ষের খুটির স্থানে এ স্তম্ভটি নির্মিত হয়। এটির নাম "উস্‌তুয়ানায়ে হান্নানা।" এ স্থানে লোকজনের ভীড় অত্যধিক। সকলেই এখানে দু' রাকাত নামাজ পড়বার জন্য ব্যতিব্যস্ত। অবশ্য কেহ একজন নামাজে দাঁড়িয়ে গেলে কয়েকজন তাকে আগলিয়ে থাকে। যেন তার নামাজে কোন বিঘ্ন না ঘটে। অতঃপর "উস্‌তুয়ানায়ে আয়েশা"– এখানে নামাজ পড়ার ফজিলত সম্পর্কে হযরত (দঃ) এরশাদ করেছেন–"আমার মসজিদে এমন একটি স্থান আছে যেখানে নামাজের ছওয়াবের কথা লোকের জানা থাকলে প্রতিযোগিতা এড়াবার জন্য লটারীর সাহায্য নিত।" হযরত (দঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়শা (রাঃ) সে স্থানটি হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইরকে দেখিয়ে দেন। সে স্থানেই নির্মিত হয় এ স্তম্ভটি। তাই এখানে নামাজ আদায়ের এই প্রতিযোগিতা অতঃপর "উস্‌তুয়ানায়ে আবিলুবাবা" হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) একটি পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজেকে এই স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখেন এবং বরেন যে হযরত (দঃ) নিজ হস্তে বন্ধন না খোলা পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবেন। এমতাবস্থায় দীর্ঘ ৫০ দিন অতিবাহিত হবার পর তাঁর তওবা কবুল হয় এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশ পেয়ে হযরত (দঃ) সেই বন্ধন খুলে দেন। অতঃপর একে একে "উস্‌তুয়ানায়ে ছারীর" যেখানে হুজুর–(দঃ) এহ্‌তেকাফ করতেন এবং

www.pathagar.com

বিছানা পেতে বিশ্রাম করতেন। "উস্‌তুয়ানায়ে হারাচ"–যেখানে হযরত (দঃ) গৃহ অভ্যন্তরে গেলে কোন না কোন সাহাবী পাহারারত থাকতেন। এ সব প্রত্যেকটি স্তম্ভ বেশ বড় ও গোলাকার এবং মর্ম্মর প্রস্তর খচিত। তবে এ সময় ভীড়ের জন্য 'রিয়াজে জান্নাতে' নামাজ পড়া আমরা কাহারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরে অবশ্য আমি একাকী বুলবুলকে নিয়ে সেখানে গেছি এবং মেহরাবে নববী সহ রিয়াজে জান্নাতের প্রতিটি স্তম্ভের কাছাকাছি এক একদিন একেক জায়গায় বা একাধিক জায়গায় এভাবে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি–আল্লাহ পাকের অপরিসীম মেহেরবানিতে। মসজিদে নববীর নির্মাণ কালে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে অর্থাৎ বাম পার্শ্বে একই সময়ে রসুলে করিম (দঃ) এর বাস ভবন ও নির্মিত হয়। মসজিদের পূর্বদিকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ও হযরত সওদা (রাঃ) এর কক্ষ তৈরী করা হয়। হযরত আয়শার কক্ষের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে নির্মিত অন্যান্য কক্ষ সমূহে হযরত (দঃ) এর অন্যান্য বিবিগণ থাকতেন। হযরত (দঃ) উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কক্ষে ইন্তেকাল করেন এবং যেস্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তীকালে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) ইন্তেকাল ফরমাইলে তাঁ'দেরকে হুজুরের (দঃ) উত্তর পার্শ্বে দাফন করা হয়। দাফন করার সময় তাঁ'দের শির মোবারক হুজুরে পাক (দঃ) এর শির মোবারকের সাথে একই সরলরেখায় না রেখে হযরত আবু বকরকে পূর্বদিকে কিছু এবং হযরত ওমরকে তার ও পূর্ব দিকে কিছুটা পশ্চাতে দাফন করা হয়েছে এবং সেই অবস্থাতে বর্তমানে রওয়াজা পাক স্থিত আছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বদিকের হুজুরের (দঃ) অন্যান্য বিবিগণের কক্ষসমূহ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে দাঁড়িয়ে জেয়ারত করা হয়। রিয়াজে জান্নাত হতে বের হয়ে মেহরাবে নব্বী–যেখানে হুজুর (দঃ) দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন, মিশ্বর–যেখানে দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করতেন স্বীয় অনুসারীদের উদ্দেশ্যে, আজান খানা অর্থাৎ যেখানে দাঁড়িয়ে হজরত বেলাল (রাঃ) আজান দিতেন সব দেখালেন একে একে। এখানে কোন আড়ম্বর নেই। সাদা মাটা মেহরাবটি মেহরাব হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কেননা এই মূল মেহরাবের পিছনে মসজিদের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ কেবলা বা সামনের দিকে বর্তমানে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সুতরাং নিয়মানুযায়ী মেহরাব ও মিম্বর মসজিদের শেষ প্রান্তে না হয়ে বর্তমানে মধ্যবর্তী স্থানেই অবস্থান করছে। অর্থাৎ এগুলি মূলতঃ যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দেয়া হয়েছে। পুন্য স্মৃতির বাহক বলে এগুলিকে যথাস্থানে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে মাত্র; কিন্তু কার্যকারিতা নেই। অতঃপর মসজিদের মূল অংশের পশ্চিম দিকে গিয়ে দক্ষিণ মুখী ফিরে রেলিংয়ের গেট অতিক্রম করে দক্ষিণের সম্প্রসারিত স্থানে এসে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে জেয়ারতের জন্য সেই সম্প্রসারিত ও সংরক্ষিত স্থানে উপস্থিত হলাম। অত্যন্ত ভীড় থাকায় শাহ সাহেব একেবারে দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে মসজিদের দক্ষিণ দেয়াল ঘেষে মেয়েদেরকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাদের সম্মুখে আমি আর হুদা সাহেব দাঁড়াই। আমাদের সম্মুখে মৌলানা আবদুল হালিম শাহ সাহেব দাঁড়িয়ে হুজুরে পাকের প্রতি সালাম ও দরুদ পাঠ করেন। তাঁর মুখে মুখে আমরাও উচ্চারণ করি। অতঃপর তিনি

www.pathagar.com

উল্টাদিকে অর্থাৎ কেবলামুখী ফিরে দীর্ঘ এক মুনাজাত করেন। তবে শাহ সাহেবের মুখে মুখে আবৃত করে এবং মোনাজাতে অংশ নিয়ে তৃপ্ত হতে পারিনি। তার কাছ থেকে মসজিদে নববীর সব কিছু পুংখানুপুংখ জেনে নিয়েছিলাম। পরবর্তীতে প্রত্যেকদিন হয়তো একাকী অথবা বুলবুলকে সাথে নিয়ে কখনো বা সস্ত্রীক হুদা সাহেবকে নিয়ে যতদিন মদিনায় ছিলাম প্রতিদিন নামাজ শেষে অন্ততঃ এক বার রওজা পাকে হাজিরা দিয়েছি ও মনের সমস্ত আবেগ মিশিয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সালাম পেশ করেছি। নিজের পরিবার, সন্তান সন্ততি, বাংলাদেশ ও মুসলিম জাহানের ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির জন্যে আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানিয়েছি। মোনাজাত শেষে রওজা মোবারকের দিকে ফিরে পূর্ব দিকে কিছু—অগ্রসর হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রতিও অনুরুপ ভাবে সালাম পেশ করি। তৎপর দক্ষিণ পূর্ব কোণায় আবদ্ধ একটি ঘর দেখিয়ে শাহ সাহেব বললেন–মুলতঃ এটিই হল বা'বে জিবরায়েল। এ দরজা দিয়ে হযরত জিবরাইল (আঃ) প্রবেশ করতেন ও এ ঘরে বসেই হযরত নবী করিম (দঃ) ওহী গ্রহণ করতেন এবং জিবরাইল (আঃ) এর সাথে আলাপ করতেন। বর্তমানে দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ঘরটি ও সম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ। হযরত আয়শার (রাঃ) হুজরা সংলগ্ন উত্তর দিকে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) র কুটীর ছিল। বর্তমানেও তা রয়েছে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখবার জো নেই। বাইর থেকে হাঁটতে হাঁটতে পিতল নির্মিত জালির ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়েই দেখতে হয়। তাও আবার এক স্থানে দাঁড়িয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখার উপায় নেই। কোথাও দাঁড়িয়ে গেলে জনতার স্রোত ঠেলে নিয়ে যাবে বহু দূরে। আবার পিতলের গায়ে হাত লাগালে শুরু হয় পুলিশের খবরদারী। অতঃপর জালি মোবারকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে রওয়াজা মোবারকের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর দিকে ঘুরে পূর্ববৎ জালি মোবারকের ভিতর দিয়ে দেখতে দেখতে উত্তর দিকে হযরত ফাতেমার (রাঃ) কুটীর অতিক্রম করে বা'বে জিবরিলের সম্মুখে উপস্থিত হই। হযরত ফাতেমার (রাঃ) কুটিরের পূর্ব দিকে ছিল হযরত আবু আয়ুব আনসারী (রাঃ) র গৃহ। মদিনায় হিজরত করে রসুল খোদা (দঃ) সর্বপ্রথম সেখানেই অবস্থান করেন। তার উত্তরে অনুচ্চ রেলিং দ্বারা ঘেরা আর একটি উঁচু ভূমি দেখিয়ে শাহ সাহেব বললেন–এখানে ছিল মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা জুন্নুরাইন হযরত ওসমান গনি (রাঃ) র গৃহ। হযরত ওসমান (রাঃ) হুজুরে করিম (দঃ) এর দুই কন্যা বিবাহ করেন। সেজন্য তাঁকে জুন্নুরাইন বা দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী উপাধি দেয়া হয়েছিল। এ স্থানেই হযরত ওসমান গনি (রাঃ) কে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। বাধা দিতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী নায়লার আংগুল কর্তিত হয়ে যায়। আবার মানস পটে ভেসে উঠল–খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলের শেষের দিকে মুসলমানদের মধ্যে–সৃষ্ট মতানৈক্য, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, শত্রুতা এবং স্বার্থপরতার কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠল পবিত্র কোরানে মজিদ সম্মুখে নিয়ে এখানে বসে আছেন শুভ্রশশ্রু মন্ডিত ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ খলিফাতুল মুসলেমিন হযরত

www.pathagar.com

ওসমান গনি (রাঃ)। তাঁর দাড়ি মোবারক ধরে তাঁকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল তাঁরই সংকলিত পবিত্র কোরানে মজিদ। চোখ ভরে এল জল।

ইসলাম প্রচারের সূচনাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত ওসমান (রাঃ)। সম্ভ্রান্ত বংশীয়, ধনাঢ্য, সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন এই হযরত ওসমান। ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। ইসলামের প্রথম যুগে নিপীড়নের কালে হযরত (দঃ) এর আদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন আবিসিনিয়ায় স্বীয় স্ত্রী হযরত (দঃ) এর কন্যা রোকাইয়া সহ। পরবর্তীকালে হযরতের (দঃ) সংগে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। স্বীয় স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে হযরতের নির্দেশে বদর যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তাছাড়া ওহুদ, খন্দক সমস্ত যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সকাতরে ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জীবন ও সমুদয় ধন সম্পদ। সংকলিত অবস্থায় যে কোরান আজ বিশ্বমুসলিম শ্রদ্ধা ভরে তেলাওয়াৎ করে সেই সংকলন হযরত ওসমানই (রাঃ) করেছিলেন স্বহস্তে। এই সৎ, নিষ্ঠাবান, ধর্মপরায়ন, সত্যবাদী, নিরহংকারী, বিনয়ী খলিফা হযরত ওসমানের এ হত্যাকান্ডকে পুঁজি করে সিরিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি হয়। এই ওসমান হত্যার কারণে মদিনায় গৃহযুদ্ধের সুচনা হয়। হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফ্ফীনের যুদ্ধ হয়। আমর ইব্নে আস এর কৌশলে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরিনামে ইসলামী খেলাফত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সিরিয়া ও মিশর মুয়াবিয়ার শাসনে চলে যায় এবং বাকী অংশে হযরত আলীর (রাঃ) আধিপত্য বজায় থাকে। এইখানেই মুসলিম বিশ্বে সৃষ্টি হয় অনৈক্য, বিভেদ এবং হযরত আলীর মৃত্যুর পর হজরত মুয়াবিয়া হযরত হাসানকে পরাজিত করে নিজকে খলিফা ঘোষণা করেন ও পরবর্তীকালে স্বীয় পুত্র এয়াজিদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে খেলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেই একই ধারাই চলে আসছে গত চৌদ্দশ'বছর ধরে।

লক্ষ্য করলাম শিক্ষিত হাজী সাহেবানরাও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন। এ সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ কিছু চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেন না। কারো ভাবনার অবকাশ নেই মুসলিম বিশ্বে আজ অনৈক্যের কারণ কি? ইরাক ইরানের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মূল উৎস কোথায়? মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে মদিনার এই মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে সেই অতীত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনা যায় কিনা! সে সম্পর্কে ভাববার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও হাজী সাহেবানদের নেই। তাঁরা সকলেই নামাজ পরে জেয়ারতে মশগুল এবং সকলকেই আজ এই ধারনাই দেয়া হয়েছে যে মসজিদে নববীতে নামাজ আর জেয়ারত ছাড়া অন্যকোন চিন্তা করলে বৃথা সময় নষ্ট হবে। তাই দেখি আজ জীবন থেকে, জীবনের কর্মকান্ড থেকে ইসলাম বিচ্ছিন্ন। আল্লাহর এবাদত অনুষ্ঠান সর্বস্ব। অথচ আল্লাহর নবী করিম (দঃ) জীবন ও ধর্মকে একীভূত করে, জীবনের প্রতি কর্মের মধ্যেই, প্রশাসনের প্রতিটি ফরমানের মধ্যেই, ধর্ম পালনের দীক্ষা দিয়ে গেছেন।

সেই দিকটি আজ সমস্পূর্ণ বিস্মৃত। তাই আজ দেখি প্রশাসনিক কেন্দ্র রিয়াদ আর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার স্থান মদিনা আর মক্কা। তুরস্কের ওসমানীয়

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে নাম সর্বস্ব খেলাফতের অবসান এবং সর্বশেষে ইসরাইলীদের হাতে জেরুজালেমের পতনের পর আজ বিশ্ব মুসলিমের পক্ষে কোন ধর্মীয় নির্দেশ বা ফরমান জারী করবার ও কোন ব্যক্তি স্থান বা প্রতিষ্ঠান নেই। এই মসজিদে নববীতে বসে আল্লাহর নবী (দঃ) নিজ জীবনকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। এখানে বসেই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, শাসন কার্য্য পরিচালনা করেছেন। বিচার কার্য পরিচালনা করেছেন। আবার আহেরাত্রে আল্লাহর এবাদতে ও মশগুল ছিলেন। অথচ আজ আমরা কেবলমাত্র নবী করিম (সঃ) এর এবাদত পদ্ধতিকেই অনুসরন করে চলেছি সত্য, কিন্তু তাঁর বাকী সব আচরণকে বিসর্জন দিয়েছি। তারই ফলশ্রুতিতে আজ বিশ্ব মুসলিম সমাজ সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য মন্ডিত হয়ে নবী করিম (দঃ) এর সকল আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সে দিনের মত প্রলংকরী শক্তি হিসাবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে না।

অতঃপর হুদা সাহেবের বকুনিতে ধ্যান ভাঙ্গল। বাবুন্নিছা দিয়ে মসজিদ হতে বেরিয়ে আসলাম। সিঁড়ি বেয়ে বাসায় উঠার সময় সম্মুখে একটি বিড়াল 'ম্যাঁও'করে উঠল। সংগে সংগে হুদা সাহেব টাঠ্যাচ্ছলে বললেন, "দেখ দেখ, এখানকার বিড়াল্ত দেখি আমাদের দেশের বিড়ালের মত একই রকম "ম্যাও" করে। এরাতো আরবীতে "ম্যাও" করে না। এমনকি খারিজ মোখারিজ ওত ঠিক করে বলছে না। হুবহু আমাদের বাংলদেশী বিড়ালের মত একই রকম ম্যাও। তবে মানুষ কেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্নভিন্ন রকম কথা বলবে? জবাবে বললাম একদম হক কথা। এই বিড়ালের মত সারা বিশ্বের মানুষেরই একই ভাষায় কথা বলা উচিত। যেমন পৃথিবীর সবদেশে মানুষের হাসি কান্নার শব্দ একই রকম। যে রকম শব্দ করে বাংলার মানুষ হাসে কাঁদে, একই রকম শব্দ করে আরবের মানুষ ও আনন্দে হাসে, ব্যথায় কাঁদে, আঘাত পেলে উহ্ শব্দে আহাজারি করে। তবে মানুষ বিড়ালের চেয়ে উৎকৃষ্ট জীব। তাই ভাব বিনিময়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে মদিনা ও মক্কায় বিড়াল দেখেছি অনেক, কিন্তু কুকুর দেখিনি একটিও। ইসলামের দৃষ্টিতে কুকুর অপবিত্র জীব। তাই সম্ভবত এদেশে কেউ যত্ন করে কুকুর পোষে না। এদিক ওদিক দুয়েকটি দেখা গেলেও মিউনিসিপ্যালটির পক্ষ থেকে সে গুলিকে হত্যা করা হয়। ফলে এদেশে কুকুর কদাচিত দেখা যায়। কিন্তু বিড়াল সম্পর্কে সেরূপ নির্দেশ নাই। বরঞ্চ কোন কোন সাহাবা বিড়ালকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে হুজুর (দঃ) এর সম্মুখে আসতেন, বসতেন, আলাপ করতেন। যেমন প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। তাঁর আসল নাম ছিল ভিন্ন। বিড়ালকে অত্যধিক স্নেহ করতেন বলে তাঁকে আবু হোরায়রা অর্থাৎ বিড়ালের বাপ বলে সম্বোধন করা হত। তাই এদেশে বিড়াল দেখেছি প্রচুর। মক্কায় "হেরম শরীফের" ভিতরে ও দেখেছি বিড়াল। একদিন সাফা মারোয়ার সায়ী সাংগ করে ক্লান্ত হয়ে নীচের দিকে কিছু নেমে একটি সিঁড়ির উপর আমি আর হুদা সাহেব সস্ত্রীক ৪ জন বিশ্রাম নিবার জন্য বসেছি। দেখি মিসেস হুদা বুলবুলকে সিঁড়ির নীচে ইঙ্গিত করে কি একটা দেখাচ্ছোন। বুলবুল তা দেখে আমাকে বল্লো

www.pathagar.com

"দেখো দেখো ওখানে কি?" দেখি এক বিড়াল মাতা তার সদ্য প্রসূত ৫টি শাবক বুকে জড়িয়ে নিয়ে দিব্যি আরামে আদর করছে। কেউ এদেরকে তাড়ায় না। সদা ব্যস্ত পুলিশেরাও এদেরকে কিছু বলে না। অবাধ রাজত্ব এখানে এদের।

আরবদেশে এসে আমাদের দেশের সাথে বেশ কয়েক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। যেমন রাস্তায় এখানে গাড়ী চলে ডান দিক ধরে, গাড়ী থামে রাস্তার ডান পাশে। সকল যানবাহন চালক বামদিকে বসে গাড়ী চালায়, অর্থাৎ ষ্টিয়ারিং বাম দিকে, গাড়ী থেকে নামবার দরজা ডানদিকে। প্রথম প্রথম এই অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগল। প্রধান প্রধান রাস্তায় প্রায় ক্রসিং এ ফ্লাইওভার অর্থাৎ ওভার ব্রীজ। ফলে রাস্তা ক্রসিং এ একদিকে গাড়ী যাবার সময় অপর দিকের গাড়ীকে আমাদের দেশের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। যেখানে রাস্তা ক্রস করতে হয় সেখানে ফ্লাইওভার নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং চৌরাস্তার মাথায় ও গাড়ী না থেমে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ কোথাও চোখে পড়েনি। এত বিপুল পরিমাণ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সিগন্যালের মাধ্যমে। অবশ্য আজকাল বিদেশের প্রতিটি আধুনিক শহরে এই ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ বৎসর গ্রীষ্মকালেই হজ্ব হয়েছে। আগামী কয়েক বৎসরে ও গ্রীষ্ম কালে হজ্ব হবে। তাই এ সময়ে এখানে রোদের প্রখরতা অত্যন্ত প্রচন্ড। জলবায়ু আদ্রতাহীন, শুষ্ক। শরীর থেকে ঘাম বেরুবার পূর্বেই শুকিয়ে যায়। তাই পানির পিপাসা অত্যধিক এবং পিপাসার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ পানি পান করতে হয়। নইলে শরীরে ডিহাইড্রেশন শুরু হয়ে যেতে পারে।

এখানে রাত্রি সাড়ে ৩টার সময় তাহাজ্জদের আজান দেয়া হয়। তবে তাহাজ্জদের নামাজ জামাতে হয় না। এখানে আউয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ নামাজের সময় হবার সাথে সাথে মসজিদে জামাত শুরু হয়। যেমন ছোবেহ সাদেক হবার সাথে সাথেই ফজরের আজান দেয়া হয়। আজান দেয়ার ২ মিনিট পর একামৎ শুরু হয়। ফজরের নামাজ পড়ে যখন মসজিদ থেকে বের হই ঐ সময়ে আমাদের দেশে আজান ও দেয়া হয় না। আমাদের দেশে যখন আমরা ফজরের নামাজ পড়ে বের হই তখন চারিদিকে ফর্সা হয়ে যায়। আর সেখানে তখন ও থাকে অন্ধকার। অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজ সম্পর্কে ও একই কথা। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার সাথে সাথে জোহর, অনুরূপ ভাবে অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজ ও। আমাদের দেশে মসজিদে আজান দেয়ার পর আমরা ধীরে সুস্থে অজু করে মসজিদে যাই, সুন্নত পড়ি, অতঃপর জামাত হয়। কিন্তু এখানে ঘড়ি দেখে আগে ভাগে মসজিদে এসে উপস্থিত না হলে আজানের পর জামাত ধরা দুষ্কর। আমাদের দেশে একামতের মধ্যে প্রতিটি ডাক দু'বার উচ্চারণ করে, আরবে করা হয় একবার। যেমন আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর–আমরা দেশে বলি ৪ বার, আরবে বলা হয় দু'বার। "আসহা দু'আ----লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে একবার। এরূপ প্রত্যেকটি ডাক আরবে একবারই বলা হয়। কিন্তু "কাদকামতিচ্ছালাহ' দুবার ঠিকই বলে। জানাজার নামাজে কেবলমাত্র ডান দিকেই সালাম ফিরিয়ে নামাজ সমাধা করা হয়। বামদিকে সালাম ফিরানো হয়না। জোহর, আছর, এ'শা এই ৩ ওয়াক্তে আমরা ফরজ নামাজের পূর্বে ৪ রাকাত করে

www.pathagar.com

ছুন্নতের নামাজ আদায় করি। কিন্তু আরবে তারা পড়ে দু' রাকাত। দেশ থেকে যাত্রার সময় অনেকেই বলেছিলেন যে আরব দেশে ছুন্নতের জন্য সময় দেয়া হয় না। আমি লক্ষ্য করেছি কথাটা সত্য নয়। সময় ঠিকই দেয়া হয়। তবে দু' রাকাত পড়তে দুই মিনিটের বেশী প্রয়োজন হয় না। তাই দু' রাকাত নামাজ পড়ার দুই মিনিট সময় দেয়া হয়। কোন কোন সময় আমি চার রাকাতের নিয়ত করে ফেলেছি। কিন্তু শেষ করবার আগেই জামাত শুরু হয়ে গেছে। দেখেছি যারা দুই রাকাত পড়েছে তারা ঠিকমতই জামাত ধরতে পেরেছে। কিন্তু মক্কায় কাবা শরীফের অভ্যন্তরে দেখেছি হজ্বের সময় যখন মাত্রাতিরিক্ত ভীড় তখনই সুন্নতের জন্য ন্যূনতম সময় দিয়ে জামাত শেষ করা হয়েছে। কিন্তু হজ্বের পর দেখেছি যখন অনেকেই চলে গেছেন, ভীড় কমে গেছে। সে রকম অবস্থায় সুন্নত পড়বার জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। চার রাকাত সুন্নত আদায় করার আর ও কিছুক্ষণ পর জামাত শুরু হয়েছে। এতে আমার মনে হয় হজ্বের সময় ভীড়ের কারণে সুন্নতের জন্য নূন্যতম সময় দিয়ে জামাত শেষ করা হয় এবং বৎসরে অন্যান্য সময় প্রয়োজনীয় সময় দেয়া হয় বলে আমার মনে হয়। জামাতে নামাজ পড়ার সময় ইমাম সাহেব "সুরা ফাতেহা" শেষ করলে আমরা চুপিসারে "আমীন" বলি। কিন্তু উভয় হেরমে দেখেছি সকলে মিহি কণ্ঠে অনুচ্চ স্বরে "আমীন" শব্দটাকে টেনে দীর্ঘায়িত করে উচ্চারণ করে। অতি নিম্ন স্বরে টেনে টেনে আ-মি-ন বলে। ফলে সমবেত কণ্ঠের 'আমীন' শব্দটি একটি শ্রুতি মধুর সুরঝংকার সৃষ্টি করে। তাছাড়া বিভিন্ন মাজহাবের বিভিন্ন কায়দায় নামাজ পড়ার পদ্ধতিতো আছেই। "মিনায়" মুফতি মওলানা আবদুর রহমান সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলাম-জোহর আছর ও এশার সুন্নত পড়ার মধ্যে এরূপ তারতম্য কেন? আমরা সকলেই সুন্নতের তাবেদার। অথচ কেহ দুই রাকাত আবার কেহ চার রাকাত পড়ছে। এ রকম কেন? মুফতিয়ে আবদুর রহমান সাহেবের জবাব হল-হাদীসে চার রাকাত এবং দুই রাকাত উভয় রকম বর্ণনাই আছে। তবে মুফতি আজম হযরত আবু হানিফা (রঃ) চার রাকাতকে গ্রহণ করেছেন। কেননা চার রাকাতের মধ্যে দুই রাকাত অন্তর্ভূক্ত আছে। তাই আমরা যারা হানিফী মতাবলম্বী তারা চার রাকাত আদায় করি।

কিন্তু অন্যান্য ইমাম সাহেবরা চার রাকাত এর হাদিসকে জয়ীফ অর্থাৎ দুর্বল জ্ঞান করে দুই রাকাতের হাদীসটিকে সবল মনে করে গ্রহণ করেছেন। তাই তারা দুই রাকাত আদায় করেন। ভাবলাম তাহলে হযরত নবী করিম (দঃ) এর জীবনের সকল আহ্কাম, চাল-চলন, আচার আচরন, অর্থাৎ তাঁর জীবন ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রক্ষা করতে পারিনি এবং পারিনি বলেই এই মতভেদ। আবার এ সম্পর্কেও সকলে একমত যে হযরত নবী করিম (সঃ) জোহর আছর ও এশার ফরজের পূর্বে কখনো কখনো দুই রাকাত, কখনো কখনো চার রাকাত সুন্নত আদায় করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উম্মতগণকে কোনটি অনুসরণ করতে বলেছেন বা ছাহাবায়েকেরাম কিভাবে সুন্নত আদায় করেছেন তার সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। ফলে মতভেদ দুর হয়নি। ফলস্বরূপ মুসলিম মনিষীগণ তথা ইমামগণ দ্বিমত পোষন করতে একমত হয়েছেন।

www.pathagar.com

আবার দেখেছি ফরজ নামাজের জামাত শেষে আমাদের দেশের মত এখানে মুনাজাত করা হয় না। এ সম্পর্কে অবশ্য দ্বিমত দেখা যায় না। নবী করিম (দঃ) ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করেছেন এমন কোন সঠিক সবুদ পাওয়া যায় না। তবে ফরজ নামাজের জামাত অন্তে মুনাজাত কখন থেকে কিভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে সে সম্পর্কে ও সঠিক কিছু জানা যায় নি।

সৌদি সরকার হাজীদের সুযোগ সুবিধার প্রতি সদা যত্নবান বলে মনে হল। মদিনায় জেয়ারতকারীদের এই গ্রীষ্মের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হল পানি। তাই দেখেছি সমগ্র সমজিদে নববীর অভ্যন্তরে প্রতিটি স্তম্ভের সাথে দুটি করে ছোট্ট ড্রাম আকারের ঠান্ডা পানির ব্যারেল বসানো আছে। সে ব্যারেলের নীচের দিকে দুটি থাকের মধ্যে দু'ডজনের মত একটির ভিতর আর একটি ভাঁজ করে প্লাষ্টিকের গ্লাস রাখা হয়েছে। ঐখান থেকে আংগুল দিয়ে টেনে একটি গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে টেপের মুখে ধরে টেপ টিপে অতি সহজেই পানি নেয়া যায়। মসজিদের অভ্যন্তরে একটি স্তম্ভ অপরটি হতে খুব বেশী দূরে নয়। এভাবে সারা মসজিদে অসংখ্য ছোট ছোট ড্রাম আকারের লাল রঙের এবং প্রত্যেকটি একই রকমের একই সাইজের ড্রাম রক্ষিত আছে। মক্কা থেকে জমজমের পানি এনে বরফ দিয়ে ঠান্ডা করে এই সব ড্রামের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। যে কেউ অনায়াসে হাত বাড়িয়ে উক্ত ড্রাম থেকে পানি নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেন। শীতল পানীয় জলের এই সুলভ ব্যবস্থা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে। আবার মদিনা, মক্কা ও মিনা ৩ জায়গাতেই দেখেছি মোটা পলিথিনের প্যাকেটে পানি ভর্তি করে সেগুলোকে ঠান্ডা করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহনের দ্বারা পরিবহন করে সেই পানির প্যাকেট হাজীদের মধ্যে পরিবেশন করা হয়েছে। সেই প্যাকেটের গায়ে ইংরেজী, ফরাসী ও আরবী ভাষায় লেখা আছে – "পানীয় জল, তীর্থযাত্রীদের প্রতি হিজ ম্যাজেষ্টি বাদ্‌শাহ্ ফাহ্‌দের উপহার।" একদিন আমি মহিলাদের প্রবেশ দ্বার দিয়ে বুলবুলকে মসজিদে নববীর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে পুরুষদের স্থানে নামাজ আদায় করি। নামাজ শেষে মহিলাদের ফটকের বাইরে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুলবুলের জন্য অপেক্ষা করছি। বুলবুলের ভিতর থেকে আসতে দেরী হচ্ছে। এদিকে আমার ভীষণ পানির পিপাসা লেগে গেছে। বাইরে রেলিং থেকে ভিতরে কয়েক হাতের মধ্যে পানির ড্রাম আছে। ভিতরে সবাই মহিলা। সুতরাং সেখানে পুরুষের যাওয়া নিষেধ। অথচ পানি না হলে আমার চলে না। এহেন অবস্থায় হঠাৎ দেখলাম ভিতর থেকে একজন ভিনদেশী মহিলা হজ্বযাত্রী ড্রাম থেকে একগ্লাস পানি নিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়ে চলে গেলেন। আমার মনে হল আমার মা, ভগ্নি কাউকে যেন আমি এক গ্লাস পানি দিতে বলেছিলাম, আর সে যেন আমার নির্দেশ মত আমার হাতে পানির গ্লাস তুলে দিল। সে পানি পান করে তাপিত প্রাণ শীতল হল। আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তাঁর কুদরতের কথা ভেবে। একবার ভেবেছিলাম মেয়েটি বুঝি পুন্য লাভের উদ্দেশ্যে আমাকে জলপান করিয়েছিল। কিন্তু না। আমার আশে পাশে ত আর ও অনেক লোক ছিল। তাদের কাউকে ত সে পানি দেয়নি। তীব্র চাহিদা ছিল আমার, পেয়েছিলাম ও আমি।

www.pathagar.com

যুগে যুগে সম্প্রসারিত এবং উৎকর্ষিত হবার পর বর্তমান সৌন্দর্য ও কারুকার্য মন্ডিত বিশাল মসজিদটি অপূর্ব শোভা লাভ করেছে। শিল্পের দিক দিয়া ও এই মসজিদটি গুরুত্বের দাবীদার। সারাসনিক স্থাপত্য কলার নজির এই পবিত্র মসজিদুন্নবী। হিজরী ১৭ সনে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) স্থান সংকুলানের সুবিধার জন্য মসজিদটির দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ কেবলার দিকে এবং পশ্চিম দিকে কিছু সম্প্রসারণ করেন। পূর্বদিকে হযরত (দঃ) এর বিবিগণের যে কক্ষগুলো ছিল তাতে তিনি হাত দেন নাই। সেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে যায়। ২৯ হিজরীতে হযরত ওসমান (রাঃ) পাথরের দেয়াল, পাথরের স্তম্ভ এবং কাঠের ছাদ দ্বারা মসজিদটি আরো সম্প্রসারিত করে পুনঃনির্মাণ করেন। তিনিও পূর্বদিকে হস্তক্ষেপ না করে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত করেন। দিনে দিনে ইসলামের বিজয় ডঙ্কাদিক হতে দিগন্তরে ছুটে গেছে, দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে মুসলমানের সংখ্যা। তাই যুগে যুগে মসজিদুন্নবী সম্প্রসারিত হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। আবার মসল্লিদের স্থান সংকুলানের অভাব পরিলক্ষিত হয় হিজরী ৮৮ সনে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে। ওমর–বিন–আবদুল আজিজ তা মর্মর পাথর দ্বারা পুনঃনির্মাণ করেন। এবারে তিনি পূর্বদিকে হযরত (দঃ) এর বিবিগণের হুজুরা সমূহ ভেঙ্গে দিয়ে সেদিকে ও মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তাছাড়া ছাদ, দেয়াল ও স্তম্ভ সমূহ বিভিন্ন শিল্প ও কারুকার্য দ্বারা শুশোভিত করে এবং চার কোণায় চারটি সুউন্নত মিনার সংস্থাপন করেন। এই সুউন্নত মিনার তখনকার দিনে সত্যি এক নতুন শিল্পকলার সৃষ্টি বলে সমাদৃত হত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরবর্তীকালে মসজিদ নির্মাণের সময় এই স্থাপত্য শিল্পের অনুসরণ করা হয়েছে। দিল্লীর 'জামে মসজিদ' "আগ্রার তাজমহল" ও 'মতি মসজিদ' এবং লাহোরের 'জামে মসজিদ' পেশোয়ারের প্রধান জামে মসজিদ, ওয়াশিংটনের ইসলামিক কেন্দ্র মসজিদ, তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে নির্মিত "সুলতান মাহমুদ মসজিদ," কায়রো "জামে মসজিদ," জাপানের কোবে শহরে নির্মিত মসজিদ, জার্মানীর বার্লিন শহরে নির্মিত মসজিদ, এশিয়া মাইনরে সিবাল নগরের মসজিদের মিনার নির্মাণে মুলতঃ এই আদর্শের অনুকরণ করা হয়েছে। ১৬০ হিজরীতে খলিফা মেহেদী মসজিদে নববীর প্রথম উন্মুক্ত চেহেন বা প্রাঙ্গণটি বর্দ্ধিত করে উভয় দিকে দালান নির্মাণ করেন। তার ও প্রায় ৭০০ বছর পর হিজরী ৮৮৬ সনে মিশরের শাসনকর্তা এটা পুন নির্মাণ করেন। বর্তমানে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের দক্ষিণ অংশ এবং উত্তর অংশ দুই পৃথক যুগের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বহন করে। একটু সুক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায় এই দুই ভাগের নির্মাণ কৌশল সম্পুর্ণ পৃথক এবং দুই অংশ দুই যুগের সৃষ্টি। তুরস্কের ওসমানীয় বংশের খলিফা আবদুল মজিদ খান দক্ষিণের অংশটি নতুন ভাবে তৈরীর কাজে হাত দেন। কিন্তু কাজ শেষ হবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালে খলিফা আবদুল আজীজ খান দীর্ঘ পনর বৎসর কাজ করে ১২৭৭ হিজরীতে নির্মাণ কাজ শেষ করে বর্তমান সুনির্দিষ্ট রূপ প্রদান করেন। এই অংশ এখনো সেই অবস্থায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাই বলে মসজিদের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা কখনো থেমে যায় নি। সারা জাহানে ইসলাম ধর্মের জয়যাত্রা যুগে যুগে বেড়েই চলেছে। মসজিদে নববীতে

www.pathagar.com

জেয়ারতকারীর সংখ্যাও দিনে দিনে তাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই পরবর্তীকালে দর্শনার্থীদের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেঠানোর জন্য ১৩৭২ হিজরীতে ইবনে সউদ নতুন সংস্কারের উদ্যোগ নেন এবং উত্তরাংশের অংশটি আর ও পরিবর্ধন করেন। বাদশাহ ফয়সলের আমলে এই সংস্কার পরিকল্পনা সর্বাংগ সুন্দর রূপে প্রতিফলিত হয়। ফলে এই পবিত্র মসজিদুন্নবী ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের এক অনবদ্য দৃষ্টান্তের রূপ লাভ করে। এই সুন্দর মিনার সমৃদ্ধ মসজিদের তিনদিকে সর্বমোট ২০টি প্রধান প্রবেশদ্বার আছে। যেমন 'বাবে জিবরীল', 'বাবুন্নেসা' 'বাবে আবদুল আজিজ' 'বাবুস সালাম' ইত্যাদি ইত্যাদি। তার যে কোন একটি দিয়ে প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণ দিকে যেহেতু কেবলা সেহেতু সে দিকে কোন দরজা নাই। মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা শেষতো হয়নি বরঞ্চ এখন আরো তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাই দেখেছি দক্ষিণ দিক ছাড়া মসজিদের বাইরে অপর তিনদিকেও বিস্তর মুসল্লির সমাগম। প্রখর রৌদ্রে বসে নামাজ পড়া অতীব কষ্টকর বলে সৌদী সরকার তার কোন কোন স্থানে ইতিমধ্যেই উপরে এজবেসতাস জাতীয় টিনের ছাদ দিয়ে শেড নির্মাণ করেছেন এবং যেখানে শেড নির্মাণ করতে পারেননি সেখানে তেরপলিন দিয়ে ছাউনি দিচ্ছেন। আমাদের চোখের উপরেই এ সমস্ত কাজ হতে দেখেছি। ভবিষ্যতে মসজিদ এদিকে ও সম্প্রসারিত হবার সম্ভাবনা নজর এড়ায়নি। মসজিদের অভ্যন্তরে জায়গা না পেয়ে বাইরে যেখানে প্রথম দিন রোদের মধ্যে নামাজ পড়েছি পরের দিন গিয়ে দেখি সেখানে তেরপলিনের ছাউনী দেয়া হয়েছে। শুনেছি মসজিদের চারিদিকের স্থানগুলো পূর্বে দোকান পাটে ভর্তি ছিল। মসজিদ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সৌদি সরকার এস্থানগুলো হুকুম দখল করেছে ও দোকান পাট ভেঙ্গে দিয়ে উচ্ছেদ করে তীর্থ যাত্রীদের স্থান সংকুলানের সাময়িক ব্যবস্থা করেছেন। তিন দিকের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন ভাবে মসজিদ পরিবর্ধন ও সম্প্রসারন করার জন্য সৌদী সরকারের পরিকল্পনা আছে বলে জেনেছি। সউদী সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড এত দ্রুত গতিতে চলছে যে মনে হয়, এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন দেখা যাবে এই স্থানে মসজিদ ভবন তৈরী হয়ে গেছে।

একদিন মসজিদের এরূপ বাইরের শেডে বসে নামাজ পড়ছি। আমার পাশে উপবিষ্ট পাকিস্তানী এক তরুণ হজ্বযাত্রী। উর্দ্দু ভাষায় কথা বলার সুযোগ পেয়ে দুজনে ইচ্ছামত মনের ভাব বিনিময় করলাম। পাকিস্তান সৃষ্টি ও তার ভাঙ্গার ইতিহাস, দু'দেশের বর্তমান হালচাল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিস্তারিত আলাপ করলাম। তার মতে পাকিস্তান সৃজনে বাংগালীদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী আর ভাঙ্গার বেলায় সক্রিয় ইন্ধন যোগিয়েছে পাঞ্জাবী শাসক চক্র ও ক্ষমতালোভী নেতৃবৃন্দ। নামাজ শেষে বিদায়ের পালা এল। সে বসেছিল একখানা নতুন হালকা জায়নামাজ বিছায়ে। বহন করতে সুবিধা বলে অনুরূপ একটি জায়নামাজ আমারও কিন্‌তে ইচ্ছে হল। তাই তাকে জায়নামাজটির দাম জিজ্ঞেস করলাম এবং কোথা হতে কিনেছে জানতে চাইলাম। সাথে সাথে "সে ইয়ে হামারি তরফসে তোহ্‌ফা হ্যায়" বলে জায়নামাজটি আমার হাতে তুলে দিল। ইহাতে আমি

www.pathagar.com

অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম এবং জায়নামাজটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। কিন্তু সে এমন ভাবে পীড়াপীড়ি শুরু করল যে না নিলে মনে ব্যথা পাবে। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর এই প্রীতির উপহার আমাকে নিতেই হল। এই শেডেই আর একদিন আলাপ হল এক ইরানী ভদ্রলোকের সাথে। সে ইংরেজী জানে। হজ্ব সম্পর্কে এদের দৃষ্টি ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। এরা হজ্বকে কেবলমাত্র অনুষ্ঠান সর্বস্ব করে না রেখে, মুসলিম বিশ্বের কল্যাণে এবং ঐক্য সাধনে এই মহাসম্মেলনকে কাজে লাগাবার কথা ভাবেন–ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নির্দ্দেশে ও প্রেরণায়। সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব। হঠাৎ তারই পার্শ্বে দেখি আরেক ইরানী হাজী । নামাজের সময় হয়ে এলে সেজদার জায়গায় সে তার হস্তের তালুর মধ্যে রক্ষিত ক্ষুদ্রাকারের একটি পাথর বা মৃত্তিকা খন্ড রাখে। আমার পাশের ভদ্রলোক তাকে তাদের ভাষায় কি যেন বললেন, ফলে সে পাথরটি পকেটে পুরে ফেলে। বুঝলাম ইরানী শিয়া সম্প্রদায় নামাজের সময় সেজদার জায়গায় এই পাথর ব্যবহার করে তাদের দেশে। এখানে অর্থাৎ মক্কা মদিনায় সেটা ব্যবহার করতে নেই। একদিন আছরের নামাজের পর বাইরে শেডের এক সংযোগ স্থানে একটি নিরিবিলি ফাঁকা জায়গাতে বুলবুল ও মিসেস হুদাকে বসিয়ে আমি আর হুদা সাহেব কিজন্য সামনের দিকে একটু অগ্রসর হয়েছি। এই সময়ে কালো বোরকা পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা বুলবুলদের কাছে এসে বুলবুলের কোলে ছোট্ট দুটি ট্রাউজার ফেলে দিয়ে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে চলে গেল। তা দেখে আমরা বুলবুলদের কাছে ফিরে এলাম। ভদ্র মহিলাকে ডাকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেল। কি তার উদ্দেশ্য ছিল কিছুতেই সেটা বুঝা গেল না। তবে মিসেস হুদা বললেন এ রকম একটা ঘটনা গতকাল ও ঘটে গেছে। এরূপ একজন নারী ভিনদেশী এক মহিলা হাজীকে এই প্রকার কি একটা জিনিস দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সেটার দাম চেয়ে এক কেলেংকারীর সৃষ্টি করেছিল। আমরাও অনুরূপ একটা কিছু আশংকা করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলাম। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ পুরুষ থাকায় সুবিধা হবে না ভেবে সে আর ফিরে আসেনি। কিছুক্ষণ পর সকলেই সেস্থান ত্যাগ করলাম।

আর একদিন জুমার নামাজ পড়ে মসজিদ হতে বেরিয়ে দেখি চারদিকে কড়া সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তারা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম ইরানীরা বুঝি কোন দিকে কোন রূপ গন্ডগোল সৃষ্টি করেছে, ফলশ্রুতিতে পুলিশ প্রহরা বেড়ে গেছে। পরে জানতে পেরেছিলাম ইরানী ফারসী কিছু নয়, ঐদিন দুজন দন্ড প্রাপ্ত আসামীর দন্ড কার্যকর করা হয়েছিল মসজিদের সম্মুখ দ্বারে। তাদের একজন ছিল খুনের আসামী, যার শিরচ্ছেদ করা হয়। অপরজন ছিল চুরির আসামী যার হাতের কব্জিচ্ছেদ করা হয়। তাই বাগাওতের আশংকায় কড়া পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা।

সাধারণত জুমার দিন বাদে জুমা এভাবে দন্ডাদেশ কার্যকর করা হয় এবং কোনরূপ বিশৃংখলার আশংকায় পুলিশ প্রহরা জোরদার করা হয়। আমরা এবং

www.pathagar.com

বহির্বিশ্বের লোকেরা সৌদি ফৌজদারী দন্ডবিধির এই বিধানটির কথাই প্রায় সময় শুনে থাকি এবং অনেকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের কথা ভুলে গিয়ে সমালোচনা ও করে থাকেন। সৌদি সরকারের সনাতন বিচার পদ্ধতির কথা, দেওয়ানী আইন, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা খুব কমই জানি। শতাব্দীকালের প্রাচীন মজলিশ আদালতে এ সমস্ত বিচারকার্য সমাধা হয়। এই মজলিস শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এই মজলিশ আদালতের এখতিয়ার অনেক ব্যাপক। ইহা বেসরকারী আপীল আদালত হিসাবে ও কাজ করে। সারাদেশে এরূপ অনেক মজলিশ আছে। প্রত্যেকটি মজলিশে একজন করে কাজী বা বিচারক আছেন। তবে নেতৃত্ব করেন স্থানীয় গর্ভনর বা নেতৃস্থানীয় শাহজাদারা। মাঝে মাঝে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় আমীর বা শাহজাদারা ও মজলিশ ডাকেন এবং বিচার করেন। সৌদি আরবের সুপ্রীম আদালত হলো বাদশাহ ফাহদ ও যুবরাজ আবদুল্লাহ্‌র মজলিশ। এই মজলিশ পদ্ধতি অতি সহজ বিচার ব্যবস্থা। এতে কোন জটিলতা নেই। নেই কোন দীর্ঘ সূত্রিতার অবকাশ। যে কোন সৌদী নাগরিক বা সৌদী আরবে বসবাসরত বিদেশী, মজলিশে আবেদন পেশ করতে পারেন। সরাসরি আভিযোগ পেশ করতে চাইলে তাও করা যায়। গভর্ণর বা শাহজাদা অভিযোগ পাঠ করে পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য শ্রবণ করে সাক্ষীসাবুদ পর্যালোচনা করে উপদেষ্টাদের সাথে সলাপরামর্শ করে তৎপর প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে তদন্ত করে রায় প্রদান করেন। এই মজলিশ জমি নিয়ে বিরোধ, পুলিশ বা মিউনিসিপালটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঋণ সম্পর্কিত বিরোধ, নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে বিরোধের বিষয়, অর্থ সম্পর্কিত বিরোধ, এবং জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সেচ, যোগাযোগ, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তি করে। এই আদালতে অভিযোগকারীদের চা নাস্তাও পরিবেশন করা হয়। সৌদি আরবের আইন ব্যবস্থায় মজলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মজলিশ বিচার ব্যবস্থা এক ব্যতিক্রমধর্মী ও অনবদ্য আইন ব্যবস্থা। এখানে বিচার বিলম্বিত করবার কোন অবকাশ নেই। কোন বিদেশী অভিযোগ আনায়ন করলে সে সৌদি আরব ত্যাগ করার পূর্বেই বিচারের রায় অবশ্যই পেয়ে যাবে। আমাদের দেশের মত বৃটিশ সৃষ্ট বিচার পদ্ধতিতে বিচার লাভের আশায় দলিল দস্তাবেজ বগল দাবা করে বছরের পর বছর উকিলের বাসা আর কোর্ট কাছারীতে এদেশে দৌড়তে হয় না। এই মজলিশ কর্তৃক ফৌজদারী মোকদ্দমার রায়ে কাউকে শাস্তি দে'য়া হলে বাদে জুমা মসজিদের প্রধান ফটকের সম্মুখে সকলের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে তা কার্যকর করা হয়।

একদিন বুলবুলকে মিসেস হুদার সাথে মসজিদে ঢুকিয়ে দিয়ে হুদা সাহেবকে শুদ্ধ বলে দিলাম আজ আমার ফিরতে একটু দেরী হবে। সুতরাং এ'শার নামাজের পর আপনারা বাসায় চলে যাবেন। আমি এ'শার নামাজ শেষ করে সোজা রওয়াজা পাকের দক্ষিণ দিকে গিয়ে দরবারে পাকে সালাম পেশ করে পূর্ব দিকে ঘুরে আবার রিয়াজে জান্নাতে প্রবেশ করি। এ'শার নামাজের পর মসজিদে নববীর দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তাহাজ্জদের আজানের পূর্বে খোলা হয় না। এ সময়ে মসজিদের ভিতরে অবস্থান করার অনুমতি নেই। সুতরাং বাদে এ'শা সকল

www.pathagar.com

মানুষ মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। রিয়াজে জান্নাত বেহেস্তের একটি বাগিচা বা অংশ। তাই সব সময় এখানে ভীড় লেগে থাকে। সহজে এখানে নামাজ আদায়ের সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই এ'শার পর একবার সুযোগ নিতে মনস্ত করলাম। অতএব বাদে এ'শা জনতার ভিড় একদম কমে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেলে আমি সেখানে গিয়ে ইচ্ছামত নামাজ পড়তে শুরু করলাম। দরুদ আস্তাগফার দোয়া ইত্যাদি ইচ্ছামত পড়তে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুলিশ আমাকে টেনে বের করে দেয়, ততক্ষণ এখানে অবস্থান করি। অবশেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে প্রতিদিনের মত বাসার দিকে না গিয়ে ভাবলাম আজ একটু ভিন্ন পথে যাই। ইয়াস্রেব (মদিনার আদিনাম) শহরে একবার হারিয়ে যাই। আধুনিক মদিনা নগরীর রূপ দর্শন করি। এরূপ ধারণা নিয়ে মসজিদ হতে বাবুন্নেছা দিয়ে বের হয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে থাকলাম। কিছুদূর অগ্রসর হলে দেখি মিশরীয় এক মহিলা হাজী পুলিশের সামনে এসে তার পরিহিত আলখেল্লার নীচের দিকের একটি ছেড়া অংশ দেখিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে কি যেন বলছেন। পরে বুঝতে পারলাম কোন এক পকেটমার তার আলখেল্লার নীচের দিকে ভিতর দিয়ে কেটে কোমরে দরমিয়ানের মধ্যে রক্ষিত টাকাগুলো নিয়ে গেছে। শুনেছি মক্কা, মদিনা ও মীনার ভীড়ের মধ্যে পকেট মাররা এরূপে সুযোগ পেলেই হাতসাফাই করে থাকে। পুলিশ ইচ্ছা থাকা সত্বে ও বেচারীকে কোন রূপ সাহায্য করতে পারল না। কেননা পকেটমারকে এরকম অবস্থায় সনাক্ত করা বা তদন্তের মাধ্যমে খুঁজে বের করা সম্ভবপর নহে। তবে একথা সত্যি যে ধরা পড়লে মসজিদে নববীর সামনে তার হাতের কব্জি রেখেই আসতে হত। আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত প্রকান্ড এক সড়ক। সেই সড়কের দক্ষিণ দিকে একটি পুরানো ইমারত-বর্তমানে ওয়াকফ দফতরের অধীনে একটি মক্তব বলে আরবীতে লেখা সাইনবোর্ড আছে। মৌলানা আঃ হালিম শাহ বলেছিলেন এই ঘরে পরবর্তীকালে হযরত হাসান (রাঃ) বসবাস করতেন। ঘরটি তালাবদ্ধ। ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। সে রাস্তা ধরে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হলে দেখি ইরানীদের মৌন মিছিল চলে যাচ্ছে। মদিনা, মক্কা ও মীনা অন্য সব জায়গাতেই দেখেছি ইরানীরা কখনো অলসভাবে বসে থাকে না। নামাজ শেষ হবার পর এরা বেরিয়ে যায় এবং মিছিল করে দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁটতে থাকে। মদিনা ও মক্কায় এদের মিছিল ছিল মৌন। কিন্তু মীনায় দেখেছি এরা উচ্চস্বরে শ্লোগান দিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মীনায় এদের শ্লোগান ছিল-"ইয়া আইয়ুহাল মুসলেমুন,-এত্তেহাদু, এত্তেহাদু" অর্থাৎ দুনিয়ার মুসলিম এক হও। আলমওত লী রুশী, আলমওত লী আমেরিকা, আলমওত লী ইসরাইল"। অর্থাৎ রুশ, আমেরিকা, ইসরাইল নিপাত যাক, ধ্বংস হউক, মুর্দাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপে হাঁটতে হাঁটতে সত্যি সত্যি মদিনা শহরে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। পথ ঘাট কিছুই চিনতে পারছি না। কোথায় এসে পড়েছি বুঝতে পারছি না। এই কয়েক বৎসর আগেও এই মদিনা শহর ছিল একটি পুরাতন গিঞ্জি শহর। যার প্রতিটি ইমারতই ছিল সেকেলে মাটির তৈরী এবং তার একটি মেঝে ছিল ঠান্ডার জন্য মাটির নীচে। (বর্তমান যুগের এয়ার কন্ডিশন) রাস্তা সমূহ ছিল অপরিসর, বিদ্যুৎ ও পানির

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত। আর আজ দেখলাম মদিনা একটি অত্যাধুনিক নগরী। সড়ক সমূহ অত্যন্ত প্রশস্ত, বিজলী বাতির চোখ ঝলসানো আলো, অত্যাধুনিক মোটরযান সমূহ দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে, একটির পিছে একটি। মদিনা নগরী পুরাতন গিঞ্জি শহর আর নেই। ইউরোপের যে কোন একটি অত্যাধুনিক নগরীর সাথে এই নগরীর তুলনা করা চলে। এভাবে মদিনা শহরে ভ্রমণ করতে করতে একস্থানে রাস্তার একধারে দেখি রেলিং দিয়ে ঘেরা এক উচু স্থানে অনেক লোকের জটলা। সে দিকে বিদ্যুতের ঝলসানো আলো না থাকায় ব্যাপারটি কি বুঝতে পারলাম না। অনুসন্ধিৎসু চিত্তে সেদিকে গিয়ে বুঝতে পারলাম এটি হল জান্নাতুল বাকী। জেয়ারতকারীরা এখানে ভীড় করছেন। অন্ধকারে বিশেষ কিছু টাহর করতে পারলাম না। আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এক প্রশস্ত রাস্তায় এসে পড়ে দেখলাম এটাই আবুজর গিফারী ষ্ট্রীট। সেই ব্যতীক্রমধর্মী প্রসিদ্ধ তাপস হজরত আবজর গিফারী (রাঃ) যিনি ইসলামী অর্থনীতির মূলধারার প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যিনি সর্ব প্রথম প্রতিবাদ করেন। হজরত ওসমানের খেলাফত কালে সেই সাধক পুরুষ ধন সম্পদ সঞ্চয় না করে জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন – মুসলমানদের ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, বিলাস ব্যসন ও অমিতব্যয়িতার বিরুদ্ধে কোরানের আয়াতের বৈপ্লবিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে এবং এই বিলাস ব্যসন ভবিষ্যতে মুসলমানদের সর্বনাশ ডেকে আনবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন, যার ফলে রাবাধায় নির্বাসিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সেই অগ্নিপুরুষ হজরত আবুজর আল গিফারী (রাঃ) এর স্মৃতির বাহক হিসাবে তাঁরই নামানুসারে এই সড়কের নামকরণ করা হয়। সড়কটি অত্যন্ত প্রশস্ত, দুধারে গগনচুম্বী আধুনিক অট্টালিকা, বোঁ বোঁ করে বিভিন্ন মোটরযান আসছে আর যাচ্ছে। দুধারে ফুটপাত ধরে চলছে হাজীদের কাফেলা। এই কাফেলার ভীড় বেড়ে যায় প্রত্যেক নামাজের আগে এবং পরে। এই সড়কটি এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক এলাকা। মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে ফিরবার সময় হাজী সাহেবানরা ঢুকে পড়ে, উন্নতমানের দ্রব্য সামগ্রীতে সাজানো এসব দোকানপাটে। টেঁকের বাকী পয়সা এখানে রেখে ক্রীত সামগ্রী নিয়ে যায় নিজ নিজ দেশে। আমরাও বাদ যাইনি। এই সড়কে এসে পড়ায় বাসা চিনে নিতে দেরী হল না। বাসায় এসে দেখলাম বুলবুল, হুদা সাহেব ও মিসেস হুদা তিন জনেই না খেয়ে আমার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসে আছেন। রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে। আমার ফিরতে এত দেরী হবার কথা নয় বলে বুলবুল উদ্বীগ্নতা প্রকাশ করায় হুদা সাহেব আমাকে খুঁজতে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন ঠিক এমনি সময়ে ফিরার সাথে সাথে বুলবুলের কিছু সোহাগ ভরা মৃদু ভর্ৎসনা ডিনারের আগের সুপের মত অবশ্যই হজম করতে হল।

১৪০৩ হিজরীতে মদিনা নগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এক বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। পবিত্র মদিনার ধর্মীয় গুরুত্ব এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক তৎপরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই শহরের সম্প্রসারণ, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে। এক কথায় পুরাতন মদিনাকে ভেঙ্গে ঢেলে নতুন সাজে নতুন রূপে বর্ত্তমান যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনঃ নির্মাণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মদিনার উন্নয়ন কর্মকান্ড মুলতঃ মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে মসজিদের চতুর্দিকেই করা হয়েছে। কেননা মসজিদে নববীর চতুর্দিকের এলাকা সমূহই হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। দোকান পাট, হোটেল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এখানে ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। যার ফলে এই এলাকাটি ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্য্যটনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মদিনা নগরীর মহাপরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যে এর প্রধান রাজপথগুলো যেন মসজিদে নববীতে এসে শেষ হয়। এ নগরীকে হাইওয়ের সংগে সংযুক্ত করে অত্যন্ত প্রশস্ত বিভিন্ন সড়ক ও নির্মাণ করা হয়েছে।

মদিনাসহ সমগ্র সৌদী আরবে বর্তমানে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। সারা মদিনা শহর সারারাত ধরে এমনভাবে আলোকিত থাকে ঘড়ি না দেখে বা আজান না শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাহাজ্জাদ বা ফজরের সময় নির্ণয় করা দুরুহ ব্যাপার। রাস্তায় সুচ পতন হলেও সহজেই কুড়িয়ে নেয়া যায়। মদিনায় পানি সরবরাহের জন্য ১৭৬ কিঃ মিঃ দূরে লোহিত সাগর থেকে অত্যন্ত উঁচু পর্বত রাশির উপর দিয়ে পাইপ লাইন বসানো হয়েছে। ডি-সেলাইনেশন প্লান্ট বসিয়ে লবণ বিমুক্ত করে এই পাইপ লাইন দিয়ে মদিনায় পানি সরবরাহ করা হয়। হজ্ব যাত্রীরা সহজেই নিজ নিজ দেশে আত্মীয় স্বজনের সাথে আলোচনা করার সুবিধার জন্য টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সৌদি সরকার বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধন করেছেন। মসজিদে নববীর শেডের ধারে রাস্তায়, পথের ধারে লক্ষ লক্ষ হাজীর প্রয়োজন মেঠাবার জন্য ১৫৪টি দেশে সরাসরি টেলিফোন করার ব্যবস্থা চালু করেছে। রাস্তার ধারে অবস্থিত কয়েন বক্স টেলিফোন সেট থেকে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক কল করা হয়। এসব সেটে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। হজ্বের সময় কালে এসব সেটের মাধ্যমে মদিনা, মক্কা ও মীনা হতে কমপক্ষে এককোটি টেলিফোন কল করা হয়ে থাকে। এই টেলিফোনের মাধ্যমে সৌদি সরকার বিপুল রাজস্ব আয় ও করে থাকেন। আমি আর বুলবুল দেশে টেলিফোন করার জন্য আছরের পরের সময়টিই বেছে নিতাম। কেননা সৌদী আরবের সাথে আমাদের দেশের সময়ের তফাৎ বরাবর তিন ঘন্টা। আছরের সময় টেলিফোন করলে সন্ধ্যার সময় সকলকে বাসায় পাওয়া যাবে। তাই এ সময়েই, আছরের নামাজ শেষে শেডের ধারে গিয়ে প্রথমে সরকারী দপ্তর থেকে কাগজী মুদ্রা ভাঙ্গিয়ে কয়েন বা রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করি। কয়েন বক্সের পাশে সরকারী দপ্তরগুলো ২৫ রিয়াল, ৫০ রিয়াল ও ১০০ রিয়ালের মুদ্রার প্যাকেট করে পলিথিন পেপারের মোড়কে বেঁধে রেখেছে। ২৫ রিয়ালের কম ভাঙ্গানো যায় না। আমরা ২৫ রিয়াল করেই ভাঙ্গাতাম। এই টাকা ভাঙ্গানোর জন্য আবার লাইনে দাঁড়াতে হয়। এইভাবে একবার লাইনে দাঁড়িয়েছি, বুলবুল আমার সাথে ছিল, কি যেন খেয়াল হল বুলবুলকেও আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলাম। একজন মহিলা লাইনে দাঁড়িয়েছে দেখে দপ্তরের ভিতর থেকে সাথে সাথে তাকে ডাক দিল এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করে সকলের আগে তার টাকা ভাঙ্গিয়ে দিল। এরূপ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সৌদী আরবে লাইন ডিঙ্গিয়ে আমাদের দেশের মত কোন কাজ করা অসম্ভব ব্যাপার। টাকা ভাঙ্গিয়ে কয়েন বক্স টেলিফোন

www.pathagar.com

সেটের সম্মুখে এসে আবার লাইন। এরূপে ধীরে ধীরে কয়েন বক্সের সামনে এসে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা কয়েন বক্সের উপর রেখে স্মরণ করতে হয় নিজ নিজ দেশের নাম্বার। সৌদী আরব থেকে বাংলাদেশের কোড নম্বর হল ০০৮৮। এই নাম্বার ঘুরালাম। তারপর ঘুরালাম চট্টগ্রামের কোড নং ০৩১। অতঃপর নিজের ইপ্সীত নাম্বার। এভাবে মদিনা ও মক্কা হতে মাঝে মাঝে দেশের বাসায় ফোন করে খবরাখবর নিতাম। মিনায় যদিও স্বল্পকালের অবস্থান তবুও সেখানেও দেখেছি যে রাস্তার ধারে এই কয়েন বক্স টেলিফোন সেট। তবে সেখান থেকে দেশে টেলিফোন করার মত সময় ও মানসিকতা আমার ছিলনা। আমি ডায়েল ঘুরিয়ে বাসার সংযোগ পেলে সাথে সাথে রিসিভারটি বুলবুলের হাতে তুলে দিতাম। সে ছেলেদের সাথে কথা বল্‌তো আমি কয়েন বক্সের মধ্যে টাকা ফেলতে থাকতাম। টাকা ফেলতে মুহূর্ত বিলম্ব হলে লাইন কেটে যায়। তবে হ্যাঁ, লাইন পেতে কখনো অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়নি। কখনো কখনো প্রথম বারেই, কখনো দুই তিন বার ঘুরালেই সংযোগ পেয়ে গেছি। মক্কায় হেরম শরীফের বর্হিদ্বারে রক্ষিত এরূপ এক টেলিফোন সেট থেকে একবার চট্টগ্রামের বাসায় সংযোগ করে বুলবুলের হাতে রিসিভার তুলে দিলাম। সে আলাপ শেষ করে রিসিভার রেখে খুব আনন্দের সাথে বলল–খালেদ একখানা লেটার সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। (উল্লেখ্য আমার তৃতীয় ছেলে খালেদ এবার কলেজিয়েট স্কুল থেকে এস, এস, সি পরীক্ষা দিয়েছিল)। বুলবুলের খুশী ধরে না। সাথে সাথে আমাকে পুনরায় হেরম শরীফের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। মগরিবের পর শোকরানা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুজনেই অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালাম। টেলিফোনের এরূপ সহজ ব্যবস্থা থাকায় দেশে চিঠি পত্র লিখার খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। কয়েকদিন অন্তর অন্তরই দেশের সাথে যোগাযোগ করেছি। টেলিফোনের সেটের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি–কখনো দেখেছি একজন ভারতীয় বা পাকিস্তানী বা অন্য কোন আরব দেশীয় লোক নিজ নিজ পরিবারের লোকজনের সাথে আন্তরিকতার সাথে আলাপ করছে। কত ঘনিষ্ট, মধুর সাংসারিক আলাপ। ছেলেমেয়ে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর। কেউবা নিচ্ছেন ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য। মুহূর্তের জন্য যেন আবার নিজ নিজ দেশের জলবায়ুর সাথে মিশে যায়, একাত্ম হয়ে যায়। একজনের আলাপ শেষ হলে আর একজন এগিয়ে যায়। নিজ নিজ দেশের কোড নাম্বার ঘুরিয়ে বিচিত্র ভাষায় আলাপ শুরু করে দেয়। ভাষা জানা না থাকলে একজনের কথা অন্যের বুঝবার উপায় নেই। এরূপ আলাপ শেষে পুনরায় সম্বিত ফিরে পাই–আবার মরুদেশের রুক্ষ আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়ে বাস্তবে ফিরে আসি। সৌদী আরবের কম্পিউটার পরিচালিত জাতীয় ভিত্তিক এই টেলিফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হাজী নিজ নিজ দেশে অতি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিজ নিজ পুত্র কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে আলাপ করে থাকেন, যদিও ইহা অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্যাপীঠ। ১৯৬১ ইং সনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছটি অনুষদ আছে এবং তিন হাজারের ও অধিক ছাত্র এখানে ভাষাতত্ব, ইসলামী আইন, কোরান শিক্ষা ও

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নে নিয়োজিত। এদের ৮৫% শতাংশই এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ও অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে। বাদশাহ আবদুল আজিজ পাঠাগারে ৩৭ হাজারের অধিক ধর্মীয় কিতাব, ৬,৪০০ ইসলামী পান্ডুলিপি এবং কোরান শরীফের দুর্লভ কপি আছে। শত শত বছর আগের হাতের লেখা কোরান শরীফও এখানে রক্ষিত আছে। এই পাঠাগারে কোরানের এমন একটি কপি আছে যার ওজন ১৫৪ কিলোগ্রাম এবং এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পান্ডুলিপিরূপে পরিচিত।

হজ্বে যাত্রার আগে, হজ্বের প্রস্তুতি নেবার সময়ে আমরা দু'জনের জন্য ছোট আকারের দুটি অজিফা ও দুটি কোরান শরীফ সংগ্রহ করেছিলাম। বুলবুল বলেছিল দুটি প্রয়োজন হবে না, একটিতেই চলবে। আমি বললাম কিনেই যখন ফেলেছি সাথে নিয়ে যাই। তার একটি পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে মদিনায় মসজিদে নববীতে রেখে আসব। মসজিদে নববীতে প্রত্যেকটি পিলার বা স্তম্ভের গোড়ায় একটি করে রেক আছে এবং সেখানে রাশি রাশি কোরানে মজীদ হাজীদের তেলাওয়াতের জন্য সযত্নে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত কোরান শরীফের ছাপা অত্যন্ত সুন্দর, তকতকে ঝকঝকে ও বাঁধাই অত্যন্ত মজবুত। উন্নত মানের সাদা কাগজ এবং প্রত্যেকটি একই ধরনের। আমার নিয়ত অনুযায়ী আমার অতিরিক্ত কোরানের কপিটি আমার সম্মুখের একটি রেকে রেখে দিলাম। উদ্দেশ্য হাজীরা এটা তেলাওয়াৎ করবেন আর আমি কিছু ছওয়াব হাসিল করব। পরে দেখলাম আমার রক্ষিত কোরানের কপিটি রেকে নাই এবং আরো লক্ষ্য করে দেখলাম প্রত্যেকটি রেকে যে সমুদয় কোরানের কপি আছে এগুলো সব সৌদী সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত এবং বাদশাহ ফাহদ কোরানিক এষ্টেট এ মুদ্রিত। অনেক দেশে নাকি কোরানের ভাষা নানাভাবে বিকৃত করা হয়। তাই এই বিকৃতি থেকে কোরানকে রক্ষার জন্য, বাদশাহ ফাহদ কোরানিক এষ্টেট এ মুদ্রিত কোরান ব্যতীত অন্য কোন দেশে মুদ্রিত কোরানের কপি মক্কা এবং মদিনার উভয় হেরম শরীফে রাখবার জন্য সউদী সরকার কর্তৃক অনুমতি দেয়া হয় না। সুতরাং আমার রক্ষিত বাংলাদেশে মুদ্রিত কোরানের কপিটি দেখামাত্র কোন সৌদী পুলিশ বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত নির্দিষ্ট কর্মচারী সরিয়ে ফেলেছেন। উল্লেখ্য এই বাদশাহ ফাহদ কোরানিক এষ্টেটের ছাপাখানায় বৎসরে কোরান শরীফের ৮০ লাখ কপি ছাপার ব্যবস্থা আছে। বিশ্বব্যাপী কোরানের চাহিদা মেঠাবার জন্য সৌদী সরকার এই ব্যবস্থা করেছেন। হজ্ব সমাপনান্তে দেশে ফিরে আসার সময় জেদ্দা বিমান বন্দরে কোরানের অনুরূপ একটি কপি সৌদী সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্বের প্রত্যেক হজ্বযাত্রীকে উপঢৌকন প্রদান করে থাকেন। অন্য কোন দেশে মুদ্রিত কোরান বা অন্য কোন গ্রন্থ এখানে রাখবার অনুমতি দেয়া হলে, ইরানীরা হারমাইনে শরীফাইনের সমুদয় রেক তাদের পুস্তক পুস্তিকায় ভরপুর করে দিত। খুব সম্ভবত ইরানীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়েই স্বাভাবিকভাবে অন্যসব দেশের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে গেছে।

মসজিদে প্রবেশের সময় জুতো বাইরে রেখে যেতে হয়। ফিরে এসে যেস্থানে রেখেছিলেন সে স্থানে যে জুতা বা স্যান্ডেল গুলো পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রায় সময় এই পাদুকা গুলি হারিয়ে যায়। একই অবস্থা দেখেছি মক্কায় হেরম

www.pathagar.com

শরীফের বাইরে। আমিতো নিশ্চিত মনে স্যান্ডেল রেখে ভিতরে প্রবেশ করে নিজ ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেছি। ইত্যবসরে উক্ত স্থান পরিষ্কার রাখার জন্য 'বলাদিয়' অর্থাৎ পৌরসভার লোকেরা ঐ সমস্ত পাদুকা গুলো অনেক দূরে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। বের হয়ে খালি পায়ে চলে যায়। আবার কেউ ফেলে দেওয়া স্তূপ থেকে দুয়েকখানা কুড়িয়ে নেয়। মসজিদে নববীতে কোন কোন প্রবেশ পথের বহির্দ্বারে একপাশে পাদুকা রাখবার জন্য কাষ্ট নির্মীত রেক আছে। একদিন জোহরের নামাজের পর মসজিদে নববী হতে বের হয়ে দেখি আমার স্যান্ডেল জোড়া রেকের যথাস্থানে নেই। অনেক খুঁজে ও যখন পেলাম না, ভাবলাম হাওয়া হয়ে গেছে। অগত্যা নগ্ন চরণে চলতে লাগলাম। পায়ের নীচে প্রথমে কিছুটা তাপ অনুভব করলাম। এদিক ওদিক মাড়িয়ে সতর্কতার সাথে কিছুদূর অগ্রসর হলাম। অল্পক্ষণ পর হঠাৎ এমন একস্থানে এসে পা'দুটি পড়ল যে মনে হল যেন উত্তপ্ত লাল লৌহ খন্ডের মধ্যে পা রেখেছি। সেখান থেকে পা সরিয়ে আনার বা কোনদিকে ছুটে যাবার জো নেই। যে দিকেই পা বাড়াই একই রকম উত্তপ্ত। পীচঢালা পথ, বালুকাময় মৃত্তিকা, চোখের সামনে ভেসে উঠল রোজ কেয়ামত–হাশরের ময়দান! সেদিনের কথা আজ ও মনে পড়লে দেহ শিউরে উঠে। অবশেষে বহু কষ্টে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ভর দিয়ে দৌড়ে কিনারায় এসে রাস্তার ধার থেকে একজোড়া স্যান্ডেল কিনে বাসায় আসি। কিছুক্ষণ পর দেখি ডাঃ আবদুল মান্নান ও মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেব আমাদের খবর নেবার জন্যে বাসায় এসে উপস্থিত। ডাঃ আবদুল মান্নান মদিনায় হজ্ব মিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি প্রায় সময় বাসায় এসে আমাদের কুশলাদি জেনেছেন, কখনো কখনো আংগুর, বেদানা ইত্যাদি ফলাহার নিয়ে এসেছেন এবং প্রয়োজনে দেখে শুনে ঔষধ সরবরাহ করেছেন। অত্যন্ত অমায়িক, মিষ্টভাষী ও কর্তব্য পরায়ণ এই ডাক্তার সাহেব। তিনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সহপাটী বলেও পরিচয় দিলেন। বিদেশে তাঁর কাছ থেকে যেটুকুন সেবাযত্ন পেয়েছি তা কখনো ভুলবার নয়। কিন্তু তিনি বার বার আফসোস করেছেন যে আমাদের জন্যে কিছুই করতে পারেননি বলে। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক সৌজন্য মূলক বিনয় প্রকাশ।

মৌলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব দীর্ঘদিন ধরে মদিনা মনওয়ারায় আছেন। তিনি সেখানকার একটি কারখানায় চাকুরী করেন। ইতিপূর্বে দেশে থাকতে তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। অবশেষে ভাগ্যের অন্বেষণে মক্কায় পাড়ি দেন। সেখানে তেমন সুবিধা করতে না পারায় মদিনায় আসেন এবং বেশ কিছুদিন রওয়াজা মোবারকে ও মসজিদে নববীতে অবস্থান করার পর বর্তমান চাকুরীটি লাভ করেন। বর্ত্তমানে মোটামোটি বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় আছেন। মৌঃ আবদুল হালিম শাহ সাহেব আমাদেরকে সাথে নিয়ে জেয়ারত করায়েছেন এতে তিনি সন্তুষ্ঠ নন। তিনি বললেন যে তাঁর সাথে গিয়ে আমাদেরকে আবার জেয়ারত করতে হবে। কেননা অনেক কিছু জানার ও দেখার আছে। মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব পরের দিন আছরের পরে এসে আমাদেরকে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাবেন এরূপ কর্মসূচী চূড়ান্ত করার পর চলে গেলেন। পরের দিন কথা মতো ঠিক সময়েই তিনি এসে পড়লেন।

www.pathagar.com

তাঁর সাথে আবার গেলাম রিয়াজে জান্নাতে, রওয়াজা মোবারকে ও জান্নাতুল বাকীতে। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করার পর বুঝলাম তিনি একজন উঁচু দরের আলেম। তাঁর বিষয়বস্তুতে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ বিচরণ করে আমাদের জ্ঞান ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ হলো। উপরন্তু তিনি নিজ পকেটের পয়সা খরচ করে আমাদেরকে আপ্যায়ন করেছেন। পরে মওলানা সাহেব আমার ডায়েরীতে তাঁর ঠিকানা লিখিয়ে দিয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতে বললেন এবং দোয়া করলেন যেন পুনরায় আল্লাহ পাক আমাকে হজ্ব নসিব করেন।

আমরা যে দালানের তিন তলায় ছিলাম সেই তেতালায় সর্বমোট ৪টি প্রকোষ্ট। তার একটিতে আছি আমরা, আরেকটি খুবই ছোট্ট, তাতে ছিলেন এক পাকিস্তানি দম্পতি। তাদের সাথে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি বললেই চলে। ঘরে থাকলে সর্বদা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ থাকে এবং বাইরে আসা যাওয়া করতে কদাচিৎ দেখেছি। অপর দুটির একটিতে ছিল ১০/১২ জন বাঙ্গালী, অপরটিতে সমসংখ্যক অসমীয়, ভারতের আসাম রাজ্যের অধিবাসী। অসমীয়রা ছিল প্রায় সমসংখ্যক নর আর নারী। অসমীয় নারীদের দেখেছি চাটগাঁর গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মত এরা দুই খন্ড ভিন্ন ভিন্ন রঙের বস্ত্র পরিধান করে। একখন্ড কোমর থেকে নীচের দিকে, অপর খন্ড মস্তক হতে কোমর পর্যন্ত শরীরের বাকী অংশ আবৃত করে। এদেরকে দেখেছি নিঃসংকোচে চলাফেরা করছে। বাইরে বারান্দায় সাধারণ ব্যবহারের জন্য রক্ষিত বেসিনে ওজু করছে। আবার বেসিনে অন্যলোক ওজু করতে থাকলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অবসর সময়ে কক্ষের মধ্যে রান্না বান্না করছে। সকলে মিলে মিশে খাওয়া দাওয়া করছে নিঃসঙ্কোচে। একমাত্র বাঙ্গালী নারীদেরকেই দেখেছি সর্বত্র পর্দা পুসিদায় লাজ নম্র সঙ্কোচে সর্বত্র চলমান, দন্ডায়মান ও উপবিষ্ট। বারান্দায় রক্ষিত বেসিনে সকলকে ওজু করতে দেখেছি। কিন্তু ওজুর শেষের দিকে পা ধোওয়া নিয়ে হত ফ্যাসাদ। তাই বাঙ্গালী ও অসমীয়া সকলকেই দেখেছি দিব্যি আরামে পা'টি বেসিনের উপর তুলে দিয়েছে, একটি পা ধোয়া হলে অপরটি ও তুলে দিয়েছে। এই অবস্থা আরব দেশে নাকি প্রায় স্বাভাবিক। তাই মিনাতে ও দেখেছি যেখানে কল না টিপে শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পানির ধারা বয়ে যায়, সেখানেও পা ধোয়ার অন্য ব্যবস্থা না থাকায় সকল হাজীকেই দেখেছি ওজুর শেষে অনুরূপ ভাবে সিঙ্কের উপরে তুলে দিয়ে পা ধুচ্ছে। বাঙ্গালীদের প্রকোষ্টে যারা ছিল তাদেরকে দেখেছি প্রায় সময় একটু আধটু নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি ও কথা কাটাকাটি করতে এবং খরচ পত্রের হিসাব নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। তাদের সাথে কিভাবে যেন জুটে গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এক তরুন ছাত্র, নাম রাজীব। ছেলেটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী, ছটপটে এবং মিশুক। সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকে। আমাদেরকে দেখলেই সালাম করে। একদিন হোটেলে খাওয়ার সখ হলো। রাজীব একটা হোটেলের সন্ধান দিয়েছিল, বলেছিল হোটেলটি খুব ভাল। তাই তাকে নিয়ে সেই হোটেলে গেলাম খেতে। সুদুর আরব দেশেও হঠাৎ মৎস খেকো বাঙ্গালী বলেই আমাদের সখ হল আরবের হোটেলে বসে মাছ খাবো। রাজীব বেয়ারাকে আরবী, ইংরেজী, উর্দ্দু সব

www.pathagar.com

ভাষায় মিলিয়ে আমাদেরকে মাছ সরবরাহ করতে অর্ডার বুঝিয়ে দিল। বেয়ারা তাৎক্ষণিক ভাবে পাক করা এক একটি করে আস্ত বড় সামুদ্রিক ভূনামাছ আমাদের প্রত্যেককে পরিবেশন করল। ঐরূপ একটি মাছই দেশে এমন কি বিদেশে ও আমাদের চার জনের খাবার জন্যে যথেষ্ট। অতএব খেতে বসে "চাইট্টা চাইট্টি" শুরু হল। রাজীব আমাদেরকে সংগ দিয়েছিল শুধু, অনেক পীড়াপীড়ি সত্বে ও নিজে কিছু খেল না। পরে যখন বিল পেশ করা হল আমাদের চক্ষু ছানা বড়া। ৪৮ রিয়াল বিল এল। অথচ পাঁচ রিয়াল দিয়ে পাঁচ পোয়া দেড় সের ওজনের একটি মুরগী নিলে আমরা চার জনের দু'বেলা খাবার জন্যে যথেষ্ট হত। মাছ খাবার সাধ সেখানে শুচল। তাই পরে মক্কায় মিছফলা বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ সামুদ্রিক কাঁচা মাছ দেখলেও সেদিকে ফিরে ও তাকাইনি – দাম ও জিজ্ঞেস করিনি।

ওহুদ প্রান্তর

রওয়াজা শরীফে প্রত্যেক দিন কমপক্ষে একবার করে হাজিরা দিয়েছি। সালাম পেশ করেছি। ফজরের নামাজ শেষে বেরিয়ে আসলে রাস্তার ধারে ড্রাইভারেরা অনুচ্চ স্বরে 'জিয়ারা, জিয়ারা' শব্দ করে যাত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করে। অর্থাৎ মদিনার আশে পাশে যে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থানগুলো আছে সেস্থান সমূহ দর্শনের জন্য এই সমস্ত ড্রাইভারেরা এভাবে যাত্রী সংগ্রহ করে তাদের কোস্টার বা মাইক্রোবাসে করে সেখানে নিয়ে যায়, নির্দ্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে। যাত্রীবাহী গাড়ীতে গেলে খুব ভীড় হয় এবং তারা খুব তাড়াহুড়া করে বলে আমরা সস্ত্রীক আলম সাহেব সহ মৌঃ আবদুল হালিম শাহ সাহেবের মাধ্যমে একখানা গাড়ী রিজার্ভ করে ঐতিহাসিক স্থান সমূহ দর্শনে বেরুলাম। সর্ব প্রথমে যেখানে এসে উপস্থিত হলাম সেটা ওহুদ ময়দান।

মদিনার তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ওহুদ পর্বত, তারই পাদদেশে মুসলমানদের মধ্যে অতি আলোচিত, ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিষাদময় স্মৃতি বিজড়িত ওহুদ প্রান্তর। গাড়ী থেকে নেমে সরাসরি এসে উপস্থিত হলাম মসজিদে হামজায়। মসজিদটি মাঠের এক প্রান্তে গমন পথের সাথে সংলগ্ন। আয়তনে ক্ষুদ্র। ওহুদ যুদ্ধে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে শাহাদত প্রাপ্ত হযরত হামজা (রাঃ)র স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁরই নামানুসারে এই মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে। মসজিদের সামনেই দাঁড়িয়ে দেখলাম গরাদে ঘেরা বিরাট এই বালুকাময় মরু প্রান্তর। তারই অপর প্রান্তে রুক্ষ, গাছপালা ও তৃণ আচ্ছাদনহীন শিলাময় ওহুদ শৈল উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়টি খুব বেশী উঁচু নয়। তবে প্রায় তিন মাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। প্রবেশ পথের ফটক বন্ধ। সুতরাং প্রান্তর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা গেল না। শাহ সাহেব আঙ্গুলি সংকেত করে দেখাতে লাগলেন সাইয়েদুস্‌শুহাদা হযরত হামজা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) হযরত মোছ আব–বিন ওমাইর (রাঃ) আখিল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) সহ ওহুদ যুদ্ধের ৭০ জন শহীদের কবর। মাঠের ওপারে দূরে আংগুলি সংকেতে দেখালেন পাহাড়ের উপরে ঐ স্থানেই হযরত নবী করিম (দঃ) এর শিবির ছিল। সেখানে তাঁর দন্ত মোবারক শহীদ হয়। ঘিরা দিয়ে আবদ্ধ বলে সে দিকে যাবার কোন উপায় নেই। দূর থেকেই শুধু

www.pathagar.com

দৃষ্টিপাত করতে হয়। দেখলাম সেদিকে বর্তমানে বেশ কিছু বসতি গড়ে উঠেছে। লৌহদন্ডের কপাট বিশিষ্ট বদ্ধ ফটকের দ্বারে এসে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম, যতদুর যায়। একবার ভাবতে চেষ্টা করলাম মুসলিম বাহিনীর অবস্থান কোথায় ছিল, কোথায় বা অবস্থান নিয়েছিল ২০০ অশ্বারোহী, ৭০০ বর্মধারী সহ ৩০০০ কোরাইশ সেনানী। মনের মুকুরে ভেসে উঠাল ১৪০২ বৎসর আগে হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসের শনিবার ১৫ তারিখ আল্লাহর নবী (দঃ) রণবেশে সজ্জিত হয়ে সেনাপতি রূপে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, শিরে বাঁধা আমামা, কটিবন্ধ জুলফিকার, হস্তে ডাল, অংগে বর্ম। অপরূপ সেই বীরবেশ। ২ জন মাত্র অশ্বারোহী, ৭০ জন বর্মধারী ও ৪০ জন তীরন্দাজ সমেত ৭০০ সৈন্য লইয়া ৩০০০ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত কোরাইশ বাহিনীর মোকাবেলা করছেন ইমানের তেজে তেজোদ্দীপ্ত ৭০০ মুসলিম সেনা–রসুলে খোদার নেতৃত্বে। এই ওহুদ প্রান্তরে অস্ত্রের ঝনঝনানী, অশ্বের হ্রেসাবর একবার ধ্বনিত হয়ে গেল কর্ণের কুহরে। সম্মুখের ঐ ওহুদ পর্বতের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং রসুলে খোদা (দঃ)। সম্মুখে তাঁর ওহুদ ময়দান, পিছনে শৈলগিরি। মনে পড়ল বীর কেশরী হযরত আলীর (রা) আঘাতেই দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল কোরাইশ বীর তাল্হার দেহ। হযরত হামজা (রাঃ)র অস্ত্রাঘাতে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করল তাল্হার ভ্রাতা ওসমান। হযরত হামজা, আলী, আবু দোযানা, জিয়াদ, যুবাইর প্রমুখ বীরগণের শৌর্য ও রণচাতুর্যে সুসজ্জিত কোরাইশ দল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। মুসলিম বাহিনী বিজয় উল্লাসে গনিমত অর্থাৎ শত্রুদের পরিত্যক্ত রসদ পত্র অস্ত্র সম্ভার সংগ্রহে ব্যস্ত। মনের গহনে দুর্বার ইচ্ছা জাগল একবার সেই স্থানে যাই–যেখানে হজরত নবী করিম (দঃ) শিবির স্থাপন করেছিলেন। যে স্থানে তাঁর দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছিল, যে স্থানে হামজা (রাঃ) মর্মান্তিকভাবে শাহাদত বরণ করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ সউদী সরকার রাখেননি। সম্ভবতঃ এখানে ভাবাবেগের আতিশয্যে দর্শনার্থীরা অনেক সময় শরীয়ত পরিপন্থী অনেক কাজ করে বসেন বলে। তাই কোন স্থানের নিশানা পর্যন্ত এখানে রাখা হয়নি। কেউ বলে না দিলে একাকী দেখে বুঝবার উপায় নেই যে কোনটা কোন স্থান। এমন কি শহীদদের কবরের ও লেশমাত্র চিহ্ন নেই। শুধু ধু ধু বালুকাময় লোহার গরাদে ঘেরা এক প্রান্তর–তার অপর প্রান্তে রুক্ষ এক শৈলগিরি। শাহ সাহেবের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। দেরী হলে ড্রাইভার আপত্তি করবে, এই অজুহাতে তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য তাগাদা দিলেন।

ফেরার সময় পথের দ্বারে দেখলাম কতেক নারী পুরুষ পৃথক পৃথক ভাবে পসরা সাজিয়ে মদিনার তেতুল, খেজুর ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী বিকিকিনি করছে। মদিনা শহরে বুলবুল ইতিমধ্যে তেতুলের সন্ধান কোথাও পায়নি। তাই দেশে আনার উদ্দেশ্যে কিছু তেতুল কিনার জন্য ইচ্ছা করায় দুজনে সেদিকে অগ্রসর হলাম। আমাদের দেশে মদিনার তেতুল ও খেজুরের আলাদা একটা মর্যাদা আছে। আল্লাহর নবীর দেশের ফল বলে সকলে আগ্রহ করে একটু খেতে চায়। তাই সেখান থেকে কিছু তেতুল, কলেমা অঙ্কিত কিছু খেজুর খরিদ করলাম। কলেমা অঙ্কিত মানে এই খেজুরগুলি আকারে একটু বড়, রংয়ে কালো, শুকিয়ে কুচ্‌কে গেছে। খেজুরের গায়ে

www.pathagar.com

কুচ্‌কিগুলি এমনভাবে আঁকা বাঁকা অবস্থায় বিরাজ করে থাকে সূক্ষ ভাবে দেখলে আরবী লেখা বলে কল্পনা করা যায়। তাই বলা হয় এই খেজুরের গায়ে আরবী হরফে কলেমা অংকিত আছে। এরূপ ধারনার আসলে কোন্ ভিত্তি নেই। ধর্মপ্রাণ মানুষের শুধু সরল বিশ্বাস। আমি প্রশ্ন করাতে একটি খেজুর বুলবুল হাতে নিয়ে আমাকে বলল দেখনা এই যে, এখানেই কলেমা লিখা। বললাম বুঝেছি খেজুর বংশে এরা কুলীন। তাই বাজারে দামে ও চড়া।

তারপাশে ডালার উপর দেখলাম একটি বৃন্তের কয়েকটি শাখায় কাঁটা জাতীয় কি একটা বস্তু। হাতে নিয়ে বুলবুলকে জিজ্ঞেস করলাম দেখতো এটা কি জিনিষ। সে বলল, ওটা চিননা? এটাকে বলা হয় মরিয়ম ফুল। কি কাজে লাগে জিজ্ঞেস করায় বলল–তোমার ওসব জেনে দরকার নেই। তবে দুটো আমাকে কিনতে বললো। এবার ধরলাম কি কাজে লাগে সেটাই জানলাম না কিনতে যাবো কেন? উত্তর দিল, দেখো সব কথা পুরুষদেরকে বলা যায় না। তবে জেনে রাখো মাতৃজাতির সৃষ্টির বেদনা কালে পানিতে ভিজিয়ে রাখলে এটা ফুলে ফেঁপে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠে এবং সে পানি গুলো খাইয়ে দিলে সুপ্রসব হয় বলে মুসলিম নারীদের বিশ্বাস। সুদূর আফ্রিকা হতে দূর প্রাচ্য পর্যন্ত একই বিশ্বাস প্রচলিত। নিজের প্রয়োজন না থাকলে ও কারো কাজে আসতে পারে এই ধারণায় মরিয়ম ফুল দুটি কিনলাম। এগুলি নাকি নষ্ট হয় না। শুকিয়ে গেলে দীর্ঘদিন পরেও পানিতে রাখলে আবার সজীব হয়ে উঠে। কিছু সময় ব্যয় হল দেখে আলম সাহেব ও হুদা সাহেব একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। হুদা সাহেব বললেন–তোমার কেনা কাটার অভ্যাস গেল না। জবাব দিলাম পথে যেতে যেতে দুর্লভ বস্তু সুলভে পেয়েও যে হেলায় ফেলে যায় সে বোকা এবং পরে পস্তায়।

ফিরতে যাবো এমন সময় তিন মাইল বিস্তৃত ওহুদ পাহাড়ের একটি অর্ধ বৃত্তাকার উঁচুস্থানে আমাদেরই মত কিছু কিছু দর্শনার্থী এদিক ওদিক দেখছেন, কেহ কেহ নফল নামাজ আদায় করছেন। প্রশ্নের উত্তরে শাহ সাহেব বললেন ঐখানেই সেই গিরিপথ যেই পথ দিয়ে খালেদ ইব্‌নে ওলিদ মুসলিম তীরন্দাজদের ব্যূহ ভেদ করে পশ্চাদ দিক হতে ওহুদ প্রান্তরে প্রবেশ করে মুসলিম বাহিনীর বিপর্য্যয় সৃষ্টি করেছিলেন। পাহাড় বেয়ে উঁচুতে উঠতে সঙ্গীদের কেহই রাজী না হওয়ায় আমি একাকী আরোহণ করলাম সেই পাহাড় শৃঙ্গে। ইহাই আইনায়েন পাহাড়। এরই পাদদেশে, এখানেই হজরতের (দঃ) আদেশে মোতায়েন ছিল ৪০ জন মুসলিম তীরন্দাজ, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর এর নেতৃত্বে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী এই গিরি পথটি সরু, সমতল ও নাতি প্রশস্ত, মুল প্রান্তরে প্রবেশের বিকল্প এক পথ। দু'ধারে পাহাড় দু'টিও খুব বেশী উঁচু নয়। মুসলিম বাহিনীর গনিমত সংগ্রহের ব্যস্ততার সুযোগে এই স্থানে রণবীর খালেদ ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে তার অধিনস্থ সকল অশ্বারোহী পিছনের এই পথ দিয়ে 'ওলো ওজ্জা' 'ওলো–হোবল,' ধ্বনী তুলে ওহুদ প্রান্তরে প্রবেশ করে যুদ্ধের চিত্রকে পাল্টিয়ে দিয়েছিল। দিশেহারা হয়ে পড়েছিল মুসলিম বীরদল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী পিশাচিনী হিন্দা শহীদানের নাক, কান কেটে গলায় মালা পড়ল, বীরবর হামজার হৃদপিন্ডটি ছিড়ে নিয়ে চিবাতে লাগল।

www.pathagar.com

অমানুষিক নিষ্ঠুরতা আর পৈশাচিক উল্লাস নৃত্য সুফিয়ান স্ত্রী হিন্দার। ভক্ত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিজেদের দেহকে আড়াল দিয়ে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন হযরত (দঃ) এর জীবন। লোষ্ট্র নিক্ষেপে ক্ষত বিক্ষত, হযরতের (দঃ) সম্মুখের দুটি দাঁত মোবারক ভেঙ্গে গেল। হযরত হামজার হত্যাকারী ওহায়শীর হযরত (দঃ) এর মস্তক লক্ষ্য করে হানা তরবারীর আঘাত আপন হস্ত দিয়ে রোধ করছেন হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ। হযরত (দঃ) এর পবিত্র লহুতে লালে লাল হয়ে গেল ওহুদ গিরি প্রান্তর। আর হযরত বলছেন "হে আল্লাহ আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তাহারা অজ্ঞ, তাহারা ভ্রান্ত।" দূরে পুনরায় যুদ্ধের আস্ফালন করতে করতে দলবল নিয়ে ফিরে যাচ্ছে কোরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান। নতুন করে মনে পড়ল ওহুদ যুদ্ধের শিক্ষা। রণক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ লংঘনের ভয়াবহ পরিণতি। নিজের অজান্তেই আঁসুতে ভরে গেল আঁখি দ্বয়। অবশেষে নয়ন মুছতে মুছতে যখন নেমে এলাম আলম সাহেব ও হুদা সাহেব উভয়েই ভারী গলায় আমার বিলম্বের জন্য নাখোশ মেজাজ দেখালেন। মনে হল গাড়ী নিয়ে ঘুরে গেলেই যেন দায় সাড়া হয়ে যায়। আসাটাই মুখ্য, পরিদর্শন গৌণ। বললাম এই ঐতিহাসিক স্থানের সাথে কত পূন্য স্মৃতি, কত ভাব, কত বেগ আর আবেগ আছে জড়িয়ে। এই স্মৃতিকে অন্তরে বহন করেইতো মুসলিম জাতি বেঁচে আছে। এহেন একটি ঐতিহাসিক স্থানে এসে কেবলমাত্র চোখ বুলিয়ে চলে যাবো তেমন বান্দা আমি নহি। বার বার এখানে আসতে পারবো সে ভরসা ও সুদূর পরাহত। তাই মনভরে, চোখ ভরে চারিদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন না করে চলে যাবার জন্যে তো এখানে আসিনি। চোখ ভরে যদি না দেখলাম, মন ভরে যদি অনুভব না করলাম তাহলে এত অর্থব্যয়ে এখানে আসা নিরর্থক। অবশেষে তাঁরা ও স্বীকার করলেন এবং তারপর হতে আমার ওরূপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার কারণে বিলম্ব হেতু আর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

মসজিদে কোবা

ওহুদের শহীদানকে সালাম জানিয়ে, বিদায় নিয়ে, গাড়ী হাঁকিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলাম মদিনার উপকণ্ঠে মসজিদে কোবায়। কোবা একটি সুন্দর গিরি উপত্যকা। সৌদী সরকার অনেক অর্থ ব্যয়ে এখানে গড়ে তুলেছেন সবুজের সমারোহ। প্রশস্ত রাস্তার মধ্যরেখায় আইল্যান্ডে একই সারিতে রোপণ করেছে রাশি রাশি নিম গাছ। সরকার এখানে চিত্ত বিনোদনের জন্য গড়ে তুলেছে এক সবুজ উদ্যান, পুষ্পল পুষ্প বিতান, আধুনিক ভাষায় পার্ক। এই স্থানটি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, তকতকে ঝকঝকে। এখানে দেখলাম বেশ ঘন ঘন খেজুর বাগান, বৃক্ষের ডগায় ঝুলে আছে অর্ধপাকা লাল্‌চে রংয়ের থোকায় থোকায় খেজুরের থোবা। তাকালেই খেতে লোভ হয়। মোট কথা মরুময় মদিনায় কোবা নামক স্থানটি একটি মরুদ্যান। বাজারে সাধারনত এরূপ খেজুর পাওয়া যায় না। তবে মদিনায় একটি দোকানে এরূপ একটি খেজুরের থোবা দেখেছিলাম। এই সেই কোবা পল্লী–মক্কা হতে মদিনায় হিজরত কালে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে আল্লাহর নবী (দঃ) ৬২২ খৃঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর সর্ব প্রথম মদিনার উপকণ্ঠে আল কাসোয়ায় আরোহণ করে উপনীত হয়েছিলেন। যে অমূল্য রতনকে

www.pathagar.com

ঘৃণা করে কাঁচ জ্ঞানে তাড়িয়ে দিল মক্কাবাসী, তাঁকেই লুফে নিল, বরণ করে নিল, হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা দিয়ে, মদিনার আনসারবৃন্দ, এই কোবা উপত্যকায় দাঁড়িয়ে। মদিনাবাসীদের সেদিন কি আনন্দের দিন, উল্লাস আর উদ্দীপনায় সকলের হৃদয় ভরপুর, আকাশের চাঁদ যেন তারা হাতে পেল। কি এক স্বর্গীয় পুলকে মদিনার আনসার আর মক্কার মোহাজের সকলেই আপ্লুত। মূল শহরে প্রবেশের পূর্বে এস্থানে হযরত (দঃ) সাদ বিন খাইসামার গৃহে বার দিন অবস্থান করেন। সেই গৃহের কিন্তু কোন হদীস করতে পারিনি। এই বার দিন সময়ের মধ্যে হযরত (দঃ) এখানে যে মসজিদ নির্মাণ করেন তারই নাম 'মসজিদে কোবা।' এই মসজিদ নির্মাণের সময় ছাহাবায়ে কেরামদের সাথে হযরত (দঃ) স্বয়ং স্বহস্তে মাল মসল্লা বহন করে নির্মাণ কার্য্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই মসজিদে কোবাই কোরানে উল্লেখিত ইসলামের প্রথম মসজিদ। হযরত (দঃ) এর স্বহস্তে নির্মিত সেই মসজিদের অস্থিত্ব এখন নাই, এমন কি তার কোন চিহ্ন বা নিশানাও নাই। সেটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। তদস্থলে আছে আধুনিক নির্মাণ শৈলীতে, কারিগরী কৌশলে নির্মিত বিরাট আকারের অতি সুন্দর এক মসজিদ। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরব স্থাপত্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন– বর্তমান মসজিদে কোবা। অভ্যন্তরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ইটালিয়ান টাইলসের মেঝে। প্রবেশ করলেই স্বর্গীয় পুলকে মন ভরে যায়। দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লাম– কৃতজ্ঞতা ভরা হৃদয়ে, নিজের সত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়ে। অবশেষে বিনয়াবনত মস্তকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠলাম।

খন্দক

অতঃপর এক জায়গায় এসে গাড়ী থামলে সকলে নামলাম। শাহ সাহেব বললেন – এইখানেই খন্দকের যুদ্ধ হয়েছিল হিজরী ৫ম ও খৃষ্টীয় ৬২৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ। শাহ সাহেবের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে কষ্ট হল। কেননা দুনিয়ার মুসলমান জানে হযরত (দঃ) ৩০০০ ভক্ত সাহাবাবৃন্দকে নিয়ে নিজ হস্তে কাজ করে এখানে খন্দক খনন করেছিলেন। ১৫ ফুট প্রস্থ ১৫ ফুট গভীর ৯০০০ ফুট দীর্ঘ এক পরিখা। এত বিরাট পরিখার কোন অস্তিত্ব এমন কি চিহ্ন মাত্র ও অবশিষ্ট নাই। কোনখান থেকে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে সে পরিখা শেষ হয়েছিল এমুহূর্তে তা কেউ বলে না দিলে বুঝার কোন উপায় নাই। আমার প্রশ্নের জবাবে শাহ সাহেব অঙ্গুলি দিয়ে দেখালেন–ঐখান থেকেই শুরু হয়েছিল আর ঐখানেই শেষ হয়েছিল। যেহেতু কোন নিশানাই নাই তাই শাহ সাহেবের কথাই মেনে নিলাম। পুরানো দুয়েকজন হাজী সাহেবান বললেন যে, কয়েক বছর আগেও এখানে পরিখার সামান্য কিছু নমুনা ছিল। বর্তমান সরকার সেটি ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। অন্যান্য স্থানে ও দেখেছি বর্তমান সৌদী সরকার ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ রক্ষা করতে মোটেই যত্নবান নয়, বরঞ্চ তারা যেন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে–যে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান গুলোর সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি জুড়িত আছে, সে গুলোকে ধূয়ে মুছে ফেলতে। কেননা অনেক সময় দেখা গেছে অনেক আবেগ প্রবন দর্শনার্থী এই সমস্ত স্থানে এসে মনের আবেগে ধর্মীয়

www.pathagar.com

ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন সব কান্ড করে বসেন যা সৌদী সরকারের দৃষ্টিতে বেদায়াত ও শিরীক। ইসলামকে শিরীক ও বেদায়াত থেকে রক্ষা করার নামে সৌদী সরকার ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ পরোক্ষ ভাবে বিলুপ্ত করে ফেলার পরিকল্পনা করেছেন। সৌদী সরকারের এহেন মনোভাবের প্রতি আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারিনি। না বুঝে ভক্তির আতিশয্যে ভালো মনে করে অনেক সময় ইসলামের নিষিদ্ধ কাজ আমরা যে করি না তা নয়। সেরূপ করবার প্রবনতা মদিনায় রওয়াজা মোবারকে, মক্কায় বায়তুল্লা শরীফে এবং অন্যান্য সকল স্থানে আছে। সেগুলিকে যেমন মুছে ফেলা যায় না, ইতিহাসের এইসব নিদর্শন সমূহও মুছে ফেলার বস্তু নহে। ধর্মীয় অনুভূতি ছাড়াও এইসব স্থানের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যে জাতি তার ইতিহাসকে অস্বীকার করে সে জাতি টিকেও থাকতে পারেনা। ঐতিহাসিক স্মৃতিকে মুছে ফেলা মানে জাতির ইতিহাসকেই মুছে ফেলা। তাই সৌদী সরকারের এহেন মনোভাব যে কোন দৃষ্টি ভঙ্গি থেকেই সমর্থনযোগ্য নহে। এই সমস্ত ঐহিহাসিক স্থান সমূহে এসে ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই খুঁজবার চেষ্টা করবে মুসলমানদের সেই রণকৌশল–পরিখার এপারে মুসলিম বাহিনী আর ওপারে কতদূরে অবস্থান নিয়েছিল, শিবির স্থাপন করেছিল আবু সুফিয়ানের ১০ হাজার সুসজ্জিত কোরাইশ বাহিনী। তিন দিকে গিরি বেষ্টনী, একদিকে উন্মুক্ত। পারস্যবাসী হযরত সোলায়মান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শক্রমে খনন করা হয়েছিল সুদীর্ঘ এই পরিখা। অভিনব এই রণকৌশল ইতিপূর্বে আরব দেশে ছিল অজানা। এই সোলায়মান ফারসীর (রাঃ) প্রখ্যাত বাগানটিরও নাকি এখন অস্তিত্ব নাই। কেননা সেই বাগানে হযরত (দঃ) এর নিজ হাতে রোপীত বৃক্ষের বর্তমান সংস্করণের গোড়ায় দর্শনার্থীরা অনেক বেদাত করত। খালেদ বিন ওলিদ এবং ইকরামা ইবনে আবু জেহেল এর ৭০০ অশ্বারোহী বাহিনীও ভেদ করতে পারেনি সুদীর্ঘ এই পরিখা। দীর্ঘ ২৭ দিন মদিনা নগরী অবরোধ করে রেখেছিল আবু সুফিয়ানের বাহিনী। অবশেষে আল্লাহর গজব নাজিল হল। একেতো আরবের তীব্র কনকনে শীত, তদুপরী একদিন রাত্রে শুরু হল বৃষ্টি, ধূলিঝড় আর মরুঝঞ্জা। উন্মুক্ত প্রান্তরে, কোরাইশদের শিবির গেল ভিজে, আগুন গেল নিভে, খাদ্য এবং রসদপত্র হয়ে গেল লন্ড ভন্ড। ভীতসন্ত্রস্ত দিশেহারা কোরাইশ বাহিনী নিরাশ, হতোদ্যম হয়ে সেই রাত্রেই পালিয়ে গেল মক্কায়। ওহুদের শিক্ষাকে সাহাবায়ে কেরাম এখানে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাই বনি কোরাইশ গোত্রের ইহুদী পল্লীর চারিদিকে নিয়োজিত মুসলীম সৈন্য দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেনি। কোনরূপ নির্দেশ অমান্য করেনি পরিখার পাহারায়। শার্হ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম বনি কোরাইশদিগের পল্লীর অবস্থান এবং কোরাইশ বীর আমর ও নওফেল কোন স্থান দিয়া মুসলিম বাহিনীর ভিতরে প্রবেশ করে সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান করেছিল এবং কোনস্থানে হযরত আলী ছুটে গিয়ে গগন পবন কাঁপিয়ে আল্লাহ আকবর ধ্বনি তুলে তাদেরকে নিহত করেছিলেন। শাহ সাহেবের জবাবে বুঝলাম তাঁর ইতিহাসের জ্ঞান খুব গভীর নয়। যে স্বল্প পরিমাণ সময় আমাদের হাতে ছিল সে সময়ের মধ্যে চিহ্নহীন অবস্থায় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ স্থান সুচিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

অতঃপর শাহ্‌সাহেব আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন পশ্চাৎদিকে মসজিদে ফাতাহ ও অন্যান্য মসজিদগুলির প্রতি। পরিখার এপারে একই সারিতে কিছুদূর পর পর বেশ কয়েকটি মসজিদ আছে। এই মসজিদগুলির নাম যথাক্রমে মসজিদে ফাতাহ, মসজিদে সোলায়মান, মসজিদে আবু বকর, মসজিদে আলী, মসজিদে ওমর, মসজিদে বনি জাফর ও মসজিদে উবাই ইত্যাদি। খন্দকের যুদ্ধের সময়ে এইসব স্থানে পরিখা পাহারা দেয়ার জন্য চৌকি ছিল এবং এক একটি চৌকি এক একজন বিশিষ্ট বীর ছাহাবার তত্ত্বাবধানে ছিল। সেখানে তাঁরা নামাজও আদায় করতেন। সর্বদক্ষিণে স্বল্প উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত চৌকিতে ছিলেন স্বয়ং হযরত নবী করিম (দঃ)। এই মসজিদের নাম মসজিদে ফাতাহ। দেখলাম সেখানে দর্শনার্থীদের অত্যন্ত ভীড়। পাহাড় বেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা, স্ত্রীলোকদের নিয়ে সেখানে যাওয়া সহজসাধ্য নয়। তাই সে দিকে গেলাম না। এরপরের চৌকিতে ছিলেন হযরত সোলায়মান ফারসী (রাঃ) এখানে ও ভীড়ের প্রচন্ড চাপ। ভিতরে ঢুকতে পারলাম না। তবে বাহির থেকে দেখলাম অভ্যন্তরে তীর্থযাত্রীরা গিজ গিজ করছে। তারপরের মসজিদটিতে গিয়ে দেখি এটি বেশ ফাঁকা। লোকজন কম। ইহা মসজিদে আবু বকর। সুযোগ পেয়ে বুলবুলও অন্যান্য সকল সংগীকে ডেকে ভিতরে ঢুকলাম। প্রথামতে নামাজ পড়লাম। সাথের মহিলারাও এক কোণায় দাঁড়িয়ে নিরিবিলি স্থানে নামাজ পড়ল। তৎপর যে মসজিদের কাছে এলাম বলা হল এটি মসজিদে আলী। অনুমান করলাম এইখানেই ধারে কাছে কোথাও কোন জায়গা দিয়ে পরিখা ভেদ করে ঢুকেছিল কুরাইশ বীর আমর ও নওফেল–যারা মহাবীর হযরত আলীর হস্তে নিহত হয়েছিল। সবকটি মসজিদে ঢুকতে পারিনি, যেতে ও পারিনি। বাকীগুলো দূর থেকেই শুধু দেখেছি। আরো একটি মসজিদে ঢুকেছিলাম। নামাজ ও পড়েছিলাম। নোট না থাকায় তার সঠিক নাম মনে পড়ছে না। এই সমস্ত মসজিদ গুলি আকারে ছোট, নির্মাণ কৌশল পুরানো, তেমন কোন চাকচিক্য বা আড়ম্বর নেই এবং সকল মসজিদ গুলি মূলত একই ধাঁচে, একই আকারে ও প্রকারে নির্মিত। খুব সম্ভবতঃ নামাজের স্থান বলে সৌদী সরকার এগুলোকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেননি। খন্দক প্রান্তর দেখতে এসে তীর্থ যাত্রীরা এই সমস্ত মসজিদ গুলিই দর্শন করে। এখানে নামাজ পড়েই সন্তুষ্ট চিত্তে চলে যায়। এখানে দর্শনার্থীর বেশ ভীড় দেখা যায়। জানিনা, এমনকি কোন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হাজী সাহেব ও এই সব ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেছেন কিনা। এই খন্দক প্রান্তরেই কোরাইশ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুসলিমরা উন্নত শিরে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তারা বুকে পেল নব বল, মনে সঞ্চারিত হল নতুন প্রেরণা। এরপরে কোরাইশরা আর কোন দিন মদিনা আক্রমনের সাহস করেনি। আরবের সমস্ত শক্তি একীভূত হয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এখান থেকে এই খন্দক প্রান্তর হতে বিদায় নেয়। এরপর থেকে দিগবিদিকে অভিযান চালিয়েছিল মুসলিম বাহিনী।

www.pathagar.com

এখান থেকে কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে পশ্চিমে যেতে হয় বদর প্রান্তরে। কিন্তু বেশ দূরে বলে কেউ যেতে রাজী হল না। বদরে গেলে সময়মত ফিরে এসে মসজিদে নববীতে জোহরের নামাজ ধরতে পারবো না বলে বলায় আমি ও আর সেদিকে যেতে পীড়াপীড়ি করলাম না। দেখা হল না ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর। সেই পাহাড়, যেখানে বসে হযরত নবী করিম (দঃ) দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে মিনতি করে বলেছিলেন "হে আল্লাহ, আমাকে তুমি যে ওয়াদা দিয়েছিলে তাহা তুমি পূর্ণ কর। মুসলিম বাহিনী যদি আজ এখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বিশ্বে তোমার মহিমা প্রচারের জন্য আর কেহই থাকবে না।" যে প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ সোবহান তায়ালা তাঁর রাসুলকে ওহী নাজিল করে আশ্বাস বাণী শুনিয়েছিলেন–"ন্যায়বান দিগকে সুসংবাদ দাও, নিশ্চয় তোমার প্রভু বিশ্বাসী দিগের নিকট হইতে শত্রুদিগকে দূরে রাখিবেন, কারণ আল্লাহ অবিশ্বাসীদিগকে ভাল বাসেন না" (২২:৩৮)।

মসজিদে কেব্‌লাতাইন

এরপর যেখানে গাড়ী থেকে নামলাম সেটি মরুময়, রুক্ষ, বালুকাময় একটি স্থান। গাড়ী থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করে বালুকাময় প্রান্তরের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে ছোট্ট একটি টিলার উপর এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে নয়ন মেলে তাকালাম– একদিকে দুর্গম গিরি, অন্যদিকে কান্তার মরু এবং মাথার উপর কাঠ ফাটা রোদ, হীনমেঘ আকাশ। তার পাশের আরেকটি মাটির ঢিবির উপর ছোট্ট একখানা মসজিদ– সাময়িক ভাবে নামাজ পড়ার জন্য তৈরী। এখানেই নাকি অবস্থিত ছিল মূল "মসজিদে কেবলাতাইন।" সাথের মেয়েরা সহ সকলেই সেই মসজিদে ঢুকলাম, প্রথামতে নামাজ পড়লাম। ইতিপূর্বে মুসলমানদের কেবলা ছিল জেরুজালেমের মসজিদুল আক্‌সা। প্রথমে সেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন মুসলমানেরা। মদিনার এই মসজিদে সাহাবাগণকে নিয়ে হুজুরে আকদছ (দঃ) নামাজে দন্ডায়মান অবস্থায় ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক নবীজীকে মক্কার কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করার নির্দ্দেশ দিলে সাথে সাথে নবীজি (দঃ) কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন– নামাজে রত থাকা অবস্থায়। সেই হতে মুসলিম বিশ্বের কেবলা হল পবিত্র খানায়ে কাবা। আর এই মসজিদের নাম হল মসজিদে কেবলাতাইন। এই মসজিদে একই নামাজে দুই কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা হয়েছে বলে ইহার নাম মসজিদে কেবলাতাইন বা দুই কেবলার মসজিদ। যে মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়লাম মূল মসজিদের অবস্থান এখানে ছিল বলে আমার মনে হয় না। কেননা দেখলাম এই মসজিদেরই বাম পার্শ্বে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আর এক বিরাট আকারের মসজিদ নির্মাণাধীন। মূল মসজিদ বাদ দিয়ে এত প্রকান্ড আকারের মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে সেটা বিশ্বাস যোগ্য নয়। বরঞ্চ মুল মসজিদকে অভ্যন্তরে রেখেই এই নতুন মসজিদ ভবন তৈরী হচ্ছে, সেটাই অধিকতর যুক্তি সংগত। বোধ হয় নির্মাণাধীন বলেই প্রবেশদ্বার বন্ধ। তাই অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারিনি–তার নির্মাণ কৌশল ও দেখতে পারিনি। দূর থেকে দেখে অনুমান করতে কষ্ট হল না আরবের অন্যান্য বৃহদাকারের সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য অঙ্কিত মসজিদের মতই হবে এই নব নির্মিত "মসজিদে কেবলাতাইন।"

www.pathagar.com

ওসমানের কূপ

আবার গাড়ী চলল। শাহ সাহেব নিয়ে গেলেন আমাদেরকে সেই কুয়ার ধারে, যেই কুয়াটি হুজুর (দঃ) এর নির্দেশে মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য ইহুদীদের সাথে ভাগাভাগি করে অর্ধেক কিনে নিয়েছিলেন হযরত ওসমান (রাঃ)। অর্ধেক মানে সপ্তাহে তিন দিন মুলসমানরা ব্যবহার করবে অপর দিনগুলোতে মুসলমানদের ব্যবহারের কোন অধিকার থাকবে না। ইহুদীরাই সেইদিন গুলিতে এই কুয়ার পানি ব্যবহার করবে। এতে নানারূপ অসুবিধা ও বিশৃংখলা দেখা দেয়ায় পরে অবশ্য কুয়াটি পুরাই কিনে নিয়েছিলেন এবং একচ্ছত্র ভাবে মুসলমানরাই এটা ব্যবহার করতেন। দেখলাম কুয়াটি এখনো আছে। কিন্তু অতীব জীর্ণ শীর্ণ। তলদেশ ভরাট, লেশমাত্র পানি নেই। কুয়াটি নাকি ইচ্ছাকৃত ভাবেই ভরাট করা হয়েছে, কেননা তার ডানপাশে একটি নিম্ন ভূমিতে দেখলাম নানারূপ উদ্ভিদের ক্ষেত্র। চারিদিকে গাছপালা, যেন ছায়া ঘেরা একটি কুঞ্জ বিতান। ক্ষেতের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট নালা দিয়ে ফল্গুধারার মত বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ পানির ধারা। তার উৎস বের করতে গিয়ে দেখলাম–আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গভীর নলকূপ খনন করে ভূমির নীচে থেকে পানি উত্তোলন করে সেচের ব্যবস্থা করে এই সমস্ত ক্ষেত করা হচ্ছে। তাই নিস্প্রয়োজনে কুয়াটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কুয়াটির বামপার্শ্বে ক্ষুদ্রাকৃতির একটি পাকা মসজিদ, আড়ম্বরহীন, নাই কোন কারুকার্য। কিন্তু নির্মাণসামগ্রী ও প্রযুক্তি আধুনিক যুগের। বলা হল এটি মসজিদে ওসমান। এখানে আমরা ছাড়া অন্য কোন দর্শনার্থী দেখলাম না। সম্ভবতঃ ধর্মীয় গুরুত্ব নেই বলে এদিকে দর্শনার্থীরা ভীড় জমায়না। ব্যবহার নেই বলে মসজিদের মেঝে অপরিচ্ছন্ন, ধূলাবালিতে আচ্ছন্ন। সকলে ঢুকে কাঁধের রুমাল দিয়ে মেঝে পরিস্কার করে, পূণ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়লাম। বেরিয়ে মসজিদের বামপার্শ্বে দেখলাম এক লেবু বাগান। বেশ উঁচু উঁচু গাছ, চারি দিকে ঘেরা। বাগানটি বেশ সুন্দর, সবুজ ও শ্যামল–ইহাই নাকি হযরত ওসমানের সেই প্রসিদ্ধ বাগান। ভিতরে প্রবেশ করতে পারলাম না। অনুমতি নেই। বাহির থেকেই দেখলাম। কোন ফাঁকে শাহ সাহেব বাগানের মালি থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন কয়েকটি লেবু। তার একটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই নিন হযরত ওসমানের বাগানের লেবু। সেটি নিয়ে বললাম দিলেনই যখন একটিতে হবে না, আরো একটি দিন। দুটি লেবুই বুলবুলের হাতে দিয়ে বললাম রেখে দাও তোমার ফুটানির ডিব্বার ভিতর–দেশে নিয়ে গিয়ে হযরত ওসমানের বাগানের ফল ছেলেদের হাতে দিও। আমি জানি এই লেবুর মধ্যে কোন অতিরিক্ত স্বাদ নেই, মান ও নেই, মর্যাদা ও নেই। সাধারণ বাগানের সাধারণ লেবু। তবুও হযরত ওসমানের নাম জড়িত আছে বলে ভাবাবেগে বুলবুলকে ঐরূপ বলেছিলাম। দেশে ফিরে এসে দেখি, বুলবুল সত্যি সত্যি লেবু দুটি দেশে নিয়ে ওসমানের বাগানের লেবু বলে ছেলেদের হাতে দিয়েছিল। ততদিনে লেবু দুটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তবু ও ছেলেরা লেবু দুটি নিয়ে চাকু দিয়ে কেটে নিঙরিয়ে রসের সন্ধান করেছিল।

www.pathagar.com

যেতে যেতে পথে পথে দেখেছি বিরাট সুউচ্চ এক পাহাড়। তার শীর্ষে শোভা পাচ্ছে শ্বেত শুভ্র বিরাট এক অট্টালিকা। শাহ সাহেব বললেন এটি হল রাজপ্রাসাদ। বাদশাহ ফাহদ ইব্নে আবুদল আজিজ আল সউদ অথবা রাজ পরিবারের অন্য কোন সদস্য মদিনায় তশরীফ আনলে এখানেই আবস্থান করেন। চারিদিকে উন্মুক্ত বালুকাময় কান্তার মরু। নেই কোন নিরাপত্তা বা অন্য কোনরূপ বেষ্টনী। ঐ সময়ে রাজ–প্রাসাদ দেখার মত মনমানসিকতা ছিল না। তাই পর্যটকদের সেখানে যাবার বা অনুমতি কোনরূপে সংগ্রহ করা যায় কিনা সে সম্পর্কে চিন্তাও করিনি। মাঝে মাঝে সবুজ বৃক্ষ, বৃক্ষের উদ্যান দেখিছি অনেক। প্রকৃতির নিয়মে গজানো নয়, অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফল, এই সমস্ত সবুজ বৃক্ষরাজি আর বৃক্ষের উদ্যান। মাঝে মাঝে আরো দেখেছি খেজুরের ছোট বড় বাগান, সারি সারি খেজুরের গাছ, মরুভূমির মধ্যখানে সরল, সোজা সরু গলিপথ। সর্বত্র খেজুর ধরেছে এই সব তরু রাজিতে। থোকায় থোকায় ঝুলে আছে বৃক্ষের আগায়। কিন্তু ফলের ভারে এরা নুইয়ে পড়েনি। দাঁড়িয়ে আছে সমুন্নত শিরে। লাল্‌ছে রঙের খেজুর, এখনো সম্পূর্ণ পাকেনি। কিছুদিন পরে হয়তো পেরে বাজারজাত করা হবে। খেজুর বাগানের এই মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে গাড়ী ছুটে চলেছে। ঐ খেজুর সম্পর্কে গাড়ীর আরোহীরা করছে নানারূপ মন্তব্য, আর কেউ বা প্রকাশ করছে কাঁচা পাকা খেজুর খাবার ইচ্ছা। মদিনার এই এলাকাটি খেজুর চাষের অন্যতম এক উর্বর ও উন্নত এলাকা।

আরো দেখেছি মদিনার উপকণ্ঠে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক আবাসিক এলাকা। যেমন ঢাকার ধানমন্ডী, গুলশান আর বনানী। এখানকার ইমারতগুলি শুধু আধুনিক নয়, বরঞ্চ অতি আধুনিক বললেও অত্যুক্তি হবে না। কোন গাছ পালা না থাকায় গাড়ী থেকেই দেখা যাচ্ছে –গোটা এলাকাটিই খাঁ খাঁ করছে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে। বেশ বড় বড় প্লট, সুন্দর সুন্দর মনোরম দালান। না দেখলেও দালান অভ্যন্তরের অবস্থা কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। আধুনিক সাজ সরঞ্জামে নির্মিত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। শুনেছি এরূপ একটি দালানের স্নানাগারেই নাকি আরবেরা লক্ষ লক্ষ রিয়াল ব্যয় করে। কয়েক স্থানেই এরূপ আবাসিক এলাকা দেখেছি। এ জাতীয় আবাসিক এলাকা গড়ে উঠাতেই সম্ভবতঃ কোবাতে এবং মদিনায় তেমন কোন আরব বসত গৃহ নজরে পড়েনি। কোবা হিজরতের সময় ছিল একটি গ্রাম। এখানে বেশ কিছু জনবসতি ও ছিল, যারা হুজুর করিম (দঃ) কে সর্ব প্রথমে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। অথচ আজকে সে স্থানে কোন বাসগৃহ দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। খুব সম্ভবতঃ এরা নতুন আবাসিক এলাকায় নতুন আধুনিক ভবন নির্মাণ করে মাটির ঘরে বসবাসের চিরাচরিত সনাতন অভ্যাস ত্যাগ করে সরকারী পৃষ্টপোষকতায় বসবাস করছে। মদিনা শহরের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থলের ও একই অবস্থা। যেমন আমাদের দেশের ঢাকা চট্টগামের মত শহরে আগের মত বর্তমানে বাণিজ্য বিতান আর বাসগৃহ একই স্থানে হয় না। ঠিক তদ্রুপ এদেশে ও তারা বাণিজ্যস্থল হতে দূরে গিয়ে আবাসিক এলাকায় নিরিবিলিতে আরামে, আয়াসে ও বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই মদিনায় এবং পরবর্তীতে মক্কায় ও অনেক অনেক লোকের সাথে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ও মেলামেশা হলে ও কোন

www.pathagar.com

আদিম আরবী স্থানীয় লোকের সাথে কখনো দেখা হয়নি। আমার একবার সখ হয়েছিল আল্লাহর নবীর বংশধর অথবা মদিনার আনসারবৃন্দ যাঁরা হুজুর (দঃ) কে এবং তাঁর সাথের মোহাজেরগণকে নিজের জানমাল, বিষয় সম্পদ কোরবাণী দিয়ে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সেই ইয়াস্রেব শহরে সেই আনসার মোহাজেরদের বংশধরদের মধ্য হতে কারো সাথে সাক্ষাৎ করার–নবীর (দঃ) মহব্বত নিয়ে একটু মেলামেশা করতে। শাহ সাহেবকে একবার বলেওছিলাম–এরূপ কোন মদিনাবাসীর আথিত্য গ্রহণের ইচ্ছার কথা। বলেছিলাম আরবদের অতিথি পরায়নতার কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আমাকে এরূপ কোন এক আরবের বাসায় সম্ভব হলে নিয়ে যান। আমি তাদের জন্য কিছু নাস্তা পানি ফল ফ্রুট নিয়ে যাবো। খুব বেশীক্ষণ অবস্থান করে তাদের বিরুক্তি উদ্রেক করব না। শুধু নবীজির মহব্বতে তাদের সাথে কিছুক্ষণ মেলামেশা করে তাদের বর্তমান জীবন যাত্রার প্রণালী দেখে চলে আসব। শাহ সাহেব দীর্ঘদিন ধরে মদিনায় অবস্থান করছেন। অনেক লোকের সাথে তার জানা শোনা। তবু তিনি পারেননি এমন একজন আরববাসী আমাদের জন্য সংগ্রহ করতে। বুঝলাম সকলে তাঁরই মত বিদেশ হতে আগত। অনুরূপ কোন আরবের সাথে তাঁর জানা শোনা নেই। তাই অনুরূপ কোন আরবের বাড়ীতে আতিথ্য লাভ করার সৌভাগ্য লাভে ব্যর্থ হয়েছি। মদিনায় আমরা খেজুর ও অন্যান্য কিছু কিছু দ্রব্য সামগ্রী কেনা কাটা ও করেছি। এখানকার দোকানীদের দেখেছি এরা প্রত্যেকেই বিদেশ থেকে আগত অভ্যাগত। কেউ স্থানীয় নয়, আরবও নয়। ব্যবসায়ীদের অনেকেই পাকিস্তানী, ভারতীয়, মিশরীয়, ইয়েমেনী এবং অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের। বাংলাদেশী যে একেবারে নেই তা নয়। তবে এদের ব্যবসা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমাদের বাসা থেকে বেরুবার গলি মুখে ছোট একখানি দোকানে চাঁটগার দুই তরুন কাপড়ের ব্যবসা করছে। দোকানটি এত ছোট যে ভিতরে দুজন বসার জায়গা না থাকায় একজন ভিতরে বসে অপরজন বাইরে দাঁড়িয়ে খরিদ্দারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। একদিন এদের সাথে পরিচয় হল। তাদের কাছ থেকেই জানলাম এরা আগে এমনকি গত বছর ও 'বস্তা ব্যবসা' করেছে। বস্তা ব্যবসা মানে কাপড় চোপড়, ঘড়ি, জুতা, স্যান্ডেল, খেলনা, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি বিভিন্ন পসরা এরা বস্তায় ভরে রাস্তার ধারে পসরা সাজিয়ে হকারের ন্যায় ব্যবসা করত। চট্টগ্রামের অনেক ছেলেও নাকি এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল এবং বেশ ভালো মুনাফা করত। কিন্তু এ বৎসর নাকি পুলিশ রাস্তার ধারে পসরা মেলে ব্যবসা করতে দিচ্ছে না। কেউ গোপনে রাস্তার ধারে কখনো ছোট আকারের পসরা খুলে বসলেও পুলিশ আসতে দেখলে বা পুলিশ আসছে বলে খবর পেলে সব মাল বস্তায় পুরে যেদিকে পারে ছুট দেয়। একবার মক্কায় হেরেম শরীফ থেকে আসবার সময় সুড়ঙ্গ মুখে অনুরূপ এক ঘটনায় আমি আর বুলবুল থ'বনে গিয়েছিলাম। একটি রুমাল জাতীয় কাপড়ের উপর কয়েকটি বিদেশী সেন্টের শিশি রেখে আরবীতে বিভিন্ন শব্দ করে খামছা রিয়াল, ছিত্তা রিয়াল বলে চিৎকার করে খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। এখানে রাস্তার ধারে যে কোন মূল্যবান দ্রব্য বিকিকিনি হয়। "জেসমিন", 'ক্যাসেট' এবং 'ইন্টিমেট' ইত্যাদি সেন্টের শিশি বোতল দেখে বুলবুল তার সামনে দাঁড়াল। অগত্যা বিবি মজকুরার

www.pathagar.com

পাশে আমাকেও দাঁড়াতে হল। একটি শিশি হাতে নিয়ে পরিস্কার চাঁটগার ভাষায় বললাম দাম কত? উত্তরে বুঝলাম এই ছেলেটা চাঁটগার। দরদস্তুর চূড়ান্ত হবার এক পর্যায়ে হঠাৎ দেখি সে তার সকল শিশিগুলি রুমালে ঢুকিয়ে অতি দ্রুত বেগে পিছনে পাহাড়ের দিকে দৌড় মেরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সেন্টের একটি শিশি আমার হাতেই রয়ে গেল। আমি আর বুলবুল দুজনে তাজ্জব বনে গেলাম। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না। তার পাশে দেখি আরেক ভদ্রলোক দাঁড়ানো এবং সেও চাটগাঁর অধিবাসী। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে পুলিশ আসার সংকেত পেয়েছে। তাই সে এভাবে ছুটে পালিয়েছে। কেননা পুলিশের সামনে পড়ে গেলে নিস্তার নেই। তার সমস্ত মালামালতো বাজেয়াপ্ত হবেই, উপরন্তু তাকে শুদ্ধ ধরে থানায় নিয়ে যাবে। সেখান থেকে সোজা বিমানে তুলে দিয়ে স্বদেশ ফেরত পাঠিয়ে দেবে। এই জন্য এরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত। বললাম আমার কি উপায় হবে, আমি যে এই সেন্টের শিশির দাম দিতে পারিনি। আমাদের এরূপ কথোপকতনের মাঝে দেখি সেই ছেলেটি আবার ফিরে এসেছে। এবার সে সবুজ সংকেত পেয়ে গেছে। পুলিশ চলে গেছে আর কোন ভয় নেই। তার সাথে পরিচয় হল, আলাপ হল আমাদের বাসার ঠিকানা জানিয়ে আরো ভালো ভালো কিছু পারফিউম এনে দিতে বললাম।

এভাবে রাস্তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবৎসর এই তরুনদ্বয় ৭০০০ রিয়াল অগ্রিম দিয়ে এই দোকানটি খুলেছে। এখানে কোন দোকানের মাসিক কোন ভাড়া নেই। বার্ষিক ভিত্তিতে এরূপ দোকান পূর্বে লাগানো হয়। এখানে এই আরব দেশে এই জাতীয় দোকান সমূহে পণ্যদ্রব্যের নির্ধারিত কোন দাম নেই। অবশ্য বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে এক দাম দেখেছি। দরদস্তুর করে মালামাল খরিদ করতে হয়।

শাহ্ সাহেব ড্রাইভারকে আরবীতে কি যেন বললেন। মনে হল বকশিশের লোভ দেখিয়ে গাড়ীটিকে ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে নিতে বললেন। আমাদেরকে বললেন নতুন জিনিস দেখাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম গাড়ী চলছে "জের-এ জমিন" অর্থাৎ ভুমিতল হয়ে। উপরে অর্ধবৃত্তাকার ছাদযুক্ত আবদ্ধ এক পথ দিয়ে। বুঝলাম শাহ সাহেব আমাদের কি দেখাতে চাইলেন। মদিনায় রাস্তার চৌমাথায় যেমন আছে ফ্লাইওভার তেমনি কোন কোন স্থানে আছে টানেল বা ভুগর্ভস্থ সুরঙ্গ পথ। যান বাহন চলাচলের সুবিধার জন্য যানজট এবং দুর্ঘটনা এড়াবার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় সুরঙ্গ পথ সমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। রাজপথের আরেক স্থানে ফেরার পথে রাস্তার ধারে একটি মার্কেট দেখিয়ে বললেন-মদিনায় খেজুরের বড় পাইকারী বাজার এইটি। এখানে যে খেজুর শুধু সস্তায় পাওয়া যায় তা নয়, বরং কিছুক্ষণ আগে পথি মধ্যে গাছের আগায় থোকায় থোকায় দেখা কাঁচা পাকা লালচে রং এর খেজুর ও পাওয়া যায়। নামবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু এখন সবাই ক্লান্ত, ওদিকে জোহরের নামাজের সময় সমাগত। তাই যাত্রা বিরতি সম্ভব হল না। তবে পরে এসে এখান থেকে খেজুর কেনার পরামর্শ দিলেন শাহ সাহেব। এই জায়গাটি মদিনায় আমাদের বাসা হতে বেশ কিছুটা দূরে। তাই পরে এখানে এসে খেজুর কেনার পরামর্শ পেয়ে এ প্রসংগে নয়া দিল্লীর এক ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলাম

www.pathagar.com

১৯৭৯ ইং সালে আমি, বুলবুল, আমাদের মেঝ ছেলে রাশেদ ও তার বড় মামা। ড্রাইভারের একটা টেক্সীতে করে কোথায় যাচ্ছিলাম। রাস্তার ধারে একটি ক্যাসেট রেকর্ডারের দোকান দেখে "ভাই সাহেব" ক্যাসেট কিনার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললাম। এক দোকান থেকে বেরিয়ে আরেকটি দোকানে ঢুকব, এই সময়ে ড্রাইভার এসে জানতে চাইল আমি ক্যাসেট কিনতে চাহি কিনা। হাঁ বলায় সে একটা নির্দিষ্ট জায়গার নাম বলে আমাকে জানাল যে ওখানে ভাল ভাল ক্যাসেট সস্তা দামে পাওয়া যায়। বিশ্বাস করে ড্রাইভারকে সেদিকে গাড়ী চালাতে বললাম। ড্রাইভার বলেছিল ঠিকই, সেখানে গিয়ে মোগলে আজমের ক্যাসেট, যা খুঁজতে ছিলাম, পেয়ে গেলাম। দাম ও দুটাকা কম। কিন্তু টেক্সীর মিটারে নজর পড়তে দেখলাম যেটুকুন পথ ঘুরে এসেছি মিটারে আট টাকা বিল উঠে গেছে। অতএব শাহ সাহেবের কথা মত নয় আনা ঘাটপান দিয়ে, ছয় আনা দিয়ে খেজুর কেনার বোকামী আর করিনি।

খেজুর কেনা প্রসংগে হুদা সাহেবের কথামত বাসার গলি হতে সন্মুখে গিয়ে ডান পার্শ্বে আরেকটি গলির শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখি চট্টগ্রামের আরেকজন যুবক এখানে শুকনো ও কাঁচা ফ্রুটের ব্যবসা করছে। তুলনামূলকভাবে এখানে খেজুর বেশ সস্তা পাওয়া গেল, স্বদেশী লোক বলে খাতির করে দাম আরও কম নিল। এখানে এসেই মনে পড়েছিল বিদেশে স্বদেশের কুকুরের কথা। এই দোকানী স্বদেশের লোক হিসাবে অনেক আলাপ করল আমাদের সাথে। এমনকি তার ব্যক্তিগত জীবনের কথাও বাদ পড়ল না। কেমন করে এদেশে এসেছে, দোকান খুলেছে, এসব অনেক কথা। বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা তেমন ভালো নয় বলে অচিরেই দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ইত্যাদি। অবশেষে খেজুরের দাম দিয়ে যখন বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলাম তখন সে আমাদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাছে তেমন কোন দোকান পাট না থাকায় তার কাছে বিক্রির জন্য রক্ষিত ৭/৮টি বেদানা একটি ঠোঙ্গা ভরে দিয়ে দিল আমার হাতে। আমি নিতে দ্বিধাগ্রস্থ হওয়ায় হুদা সাহেব দামের কথা জিজ্ঞেস করলেন। এতে সে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে গেল। দুই হাত একসাথে করে দেশী ভাইদেরকে কোন আপ্যায়ন করতে পারল না বলে খুব দুঃখ করতে লাগল। বেদানা গুলি কাজে এসেছিল মদিনা হতে মক্কার পথে যখন দীর্ঘক্ষণ ধরে বাসে এক ঘেঁয়েমিতে আর গরমে অতীষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। ঐ সময়ে সুমিষ্ট ও রসালো এই বেদানা গুলি গলাধঃকরণ করে বেশ তৃপ্তি পেয়ে ছিলাম।

জান্নাতুল—বাকী

মদিনায় আমাদের অবস্থানের দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। বিদায়ের আগের দিন বাদে আছর আমাদের সকলকে শাহ সাহেব নিয়ে গেলেন জান্নাতুল বাকীতে। ইহাই মদিনার সেই বিখ্যাত কবরস্থান--মসজিদে নববীর পূর্বদিকে ৪০০ গজ দূরে। চারিদিকে নীচের অংশে পাকা দেয়াল ও দেয়ালের উপরের অংশ লোহার রেলিং দ্বারা ঘেরা। রেলিং এর উপর দিয়ে গোরস্থানের অভ্যন্তর ভাগ দেখা যায়। কবরস্থানটি

www.pathagar.com

রাস্তা থেকে বেশ উঁচু। রেলিং এর বাইরে প্রশস্ত বারান্দা বা রাস্তার মত করে পাটাতন তৈরী করে দেয়া হয়েছে। তার কতেক অংশে আবার দাবদাহ হতে দর্শনার্থীদের আত্মরক্ষার জন্য পাকা ছাদ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়েই হজ্ব যাত্রীরা দর্শনাকাঙ্খা তৃপ্ত করে। ভিতরে ঢুকার এজাজত নাই, প্রবেশ পথ বন্ধ। অথচ কয়েক বৎসর আগে ও নাকি হাজীরা এখানে ভিতরে ঢুকেছে। ঘুরে ঘুরে দেখেছে। উপস্থিত হয়েছে প্রসিদ্ধ সাহাবাগনের গোর দ্বারে, জেয়ারত করেছে, সালাম জানিয়েছে। কবরের শীতল মৃত্তিকায় ফেলেছে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু, স্মরণ করেছে বিগত দিনের বিস্মৃত অতীত। মাগফেরাত কামনা করেছে নিজের জন্য, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্য, যারা চলে গেছে তাদের জন্য, যারা জীবন ধারণ করে আছে তাদের তরেও। বর্তমানে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কোথাও কোন কবরের কোনরূপ চিহ্নমাত্র গোচরে আসেনা। অত্যন্ত বিশাল এই কবরস্থানের আয়তন। যে সমস্ত চিহ্ন গুলো ইতিপূর্বে ছিল সেগুলিও বর্তমানে বেদাত ও শিরিকের আশংকায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। বলে না দিলে কোথায় কার কবর বুঝবার কোন উপায় নাই। এইগোরস্থানেই শায়িত আছেন বিশ্ব দুলালী, নবীনন্দিনি, ফাতেমা জননী (রাঃ), উম্মুল মুমিনিন আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ), ইসলামের তৃীয় খলিফা হযরত ওসমানগণি (রাঃ) হুজুরের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) হুজুরের সাহেবজাদা হযরত ইব্রাহিম। এই ইব্রাহিম দেড় বৎসর বয়সে যেদিন মারা যান সেদিন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল। এই সময়ে ইব্রাহিম ছিল হুজুরের একমাত্র পুত্র। তাই হুজুর মনে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। অতএব জনসাধারণ বলাবলি করতে লাগল হযরত (দঃ) এর পুত্র বিয়োগে প্রকৃতি এই বিমর্ষরূপ ধারণ করেছে। সংগে সংগে হুজুর (দঃ) প্রতিবাদ করে বলে দিয়েছিলেন- মানুষের জন্ম মৃত্যুর সাথে প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে সূর্য্যগ্রহণ ও অন্যতম। এখানে আরো শায়িত আছেন নবীজির প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) হুজুরের সাহেবজাদী হযরত রোকাইয়া (রাঃ) হযরত আলীর মাতা, হযরত আবদুর রহমান ইব্নে তাল্হা (রাঃ) হযরত সাদ ইব্নে ওক্কাছ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাছউদ (রাঃ)। হযরত ইমাম মালেক, ইব্নে আনাস (রঃ), সুফী সাধক মহাত্মা জাফর সাদেক, হযরত ইমাম বাকী (রঃ) এবং আরো শায়িত আছেন অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম, আওলিয়া ও বুজুর্গানে দ্বীন। এখন ও মদিনায় কোন হজ্বযাত্রী প্রাণ ত্যাগ করলে এই পবিত্র গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত (দঃ) প্রায়ই শেষ রাত্রে এখানে আসতেন ও দোয়া করতেন। বিদায় হজ্বের পর আরাফাত হতে মদিনায় ফিরে এসে হযরত (দঃ) যখন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর পরপারের ডাক এসে গেছে, তিনি ছুটে এসেছিলেন এখানে, এই জান্নাতুল বাকীতে। ছুটে গিয়েছিলেন ওহুদ প্রান্তরে, ওহুদের শাহীদানের স্মরণে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করেছিলেন-"হে কবরবাসীগণ তোমাদের আত্মার উপর আল্লাহর অনন্ত রহমত বর্ষিত হউক, আমরাও অতি শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হইব"। শাহ সাহেব আমাদেরকে যেখানে নিয়ে দাঁড় করালেন সেটি এই বৃহদায়তন কবরস্থানের ছাদযুক্ত পাটাতনের এককোনা। এখানে কবরস্থানটি একটু নীচু। মনে হল মূল ভূমি থেকে

www.pathagar.com

এই স্থানটি নীচের দিকে কিছু ধ্বসে গেছে। বাহির থেকে লোকজন এই নীচু ভূমিতে প্যাকেটে প্যাকেটে কবুতরের আধার ছুড়ে মারছে। আর ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর সে গুলো টক্‌টক্ করে গিল্‌ছে। দর্শনার্থীরা এখানে কবুতরকে আধার খাওয়ানো পুন্যের কাজ বলে মনে করেন। দেশ থেকে যাত্রার সময় কয়েকজন আমাকেও কবুতরকে আধার খাওয়ানোর জন্য টাকা দিয়েছিল। জেয়ারতের টাকার সংগে সে টাকা আমি শাহ সাহেবকে দিয়ে দিয়াছিলাম। তাঁর মন্তব্য হল এ সময়ে লোক জনের খুব ভীড় থাকে। তাই পায়রাগুলো শান্তিতে আহার করতে পারে না। হজ্ব মওসুমের পরে যখন পায়রাগণের আহারের এরূপ ছড়াছড়ি থাকে না তখন তিনি আহার সরবরাহ করবেন এবং পায়রা কুল শান্তিতে, নির্বিঘ্নে ও আরামে তা ভক্ষণ করবে।

যদিও কোথাও কোন চিহ্ন নেই তবুও শাহসাহেব আমাদেরকে গরাদের বাইরে থেকে একের পর এক অংগুলি সংকেতে দেখাতে লাগলেন–এইখানেই আম্মাজান আয়শা, ঐখানেই খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী, রোকাইয়া, ইব্রাহিম হযরত ওসমান সমাহিত আছেন। এই সব কবরগুলো চিহ্নিত করে দেখালেন আর আমরা ফাতেহা পাঠ করলাম। দুহাত তুলে নবী করিম (সঃ) এর অনুসরণে অশ্রুসিক্ত নয়নে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে অকপট ভাষায় মোনাজাত করলাম। হাঁটতে হাঁটতে একস্থানে কয়েকটি কবরের চিহ্ন দেখলাম। বুঝলাম এঁরা সদ্য মৃত। কিছুদিন পরে এখানে এভাবে এই কবরেরও চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না। তবুও বা'দাল মউত যাঁরা এখানে স্থান লাভ করেন তাঁরা সত্যি সৌভাগ্যবান।

মদিনায়, পরে মক্কা ও মীনাতে ও দেখেছি দিয়াশলাই বিক্রি হয় না। সিগারেট কিনলে বা প্রয়োজনীয় অন্য কোন বস্তু কিনলে দিয়াশলাই এমনিতেই দেয়। আমি দেশ থেকে আমার খোরাকীর পরিমাণ সিগারেট নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই সিগারেট কেনার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু দিয়াশলাই নিইনি। হাশেম চাচাকে একদিন দিয়াশলাই এনে দিতে বললে তিনি জানালেন এখানে দিয়াশলাই বিক্রি হয় না। পরে অবশ্য একটা দিয়াশলাই আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছিল। ভুলু নিয়মিত ভাবে বাসায় আলম সাহেবের কাছে আসা যাওয়া করত। ভুলু ছেলেটা বয়সে তরুণ, দেখতে সুন্দর, ফর্সা অবয়ব, মজবুত গঠন, ব্যবহারে অমায়িক, চটফটে ও তরিৎকর্মা। সে জানতে পেরে এক রিয়াল দিয়ে আমার জন্যে এককালীন ব্যবহার যোগ্য আস্ত একটা লাইটার এনে দিল। দাম দিতে চাইলাম কিছুতেই নিল না। তারপর আর দিয়াশলাইর প্রয়োজন বোধ করিনি।

একদিন মদিনার এই বাসায় বসে সেভ্ করবার জন্য সেফ্‌টি রেজর বের করেছি। ব্রাশ দিয়ে মুখে সাবান লাগাতে যাবো এমন সময় বুলবুল বাধা দিল। বলল হজ্ব করবে, দাড়ী রাখবে না, এটা এক ধরণের আত্মপ্রবঞ্চনা। নিজের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে বেড়ানো। নিজেকে এহেন দ্বিমুখী পরিচয়ে জাহির করার মনোবৃত্তি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। হুদা সাহেব সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ–একদিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করলাম, অন্যদিকে "শয়তান কো ভি নারাজ না করনা"। আলম সাহেব ও সম্মতি দিয়ে বললেন তিনিতো দাড়ি রেখেই দিয়েছেন। মদিনা মনওয়ারাতে বসে মুখে খুর লাগালে হুজুরের প্রতি অবমাননা করা হয় মনে করে মুখে ক্ষুর

www.pathagar.com

আর লাগাতে পারলাম না। তদবধি শ্মশ্রুতে মণ্ডিত হয়ে রইল আমার মুখ মণ্ডল। হুদা সাহেব ও আলম সাহেব ও একই পথ অনুসরণ করলেন। মুখে আর ক্ষুর লাগাননি। কিন্তু পরবর্তীতে হুদা সাহেবকে দেখেছি প্রায় সময় শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়বটিকে আয়নার সম্মুখে রেখে নিবিড়ভাবে দেখছেন। মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন তাঁকে দেখতে কেমন লাগছে। দাড়ির এদিকে কাটবেন, নাকি ওদিকে রাখবেন। এভাবে রাখলে সুন্দর দেখায়, না ওভাবে রাখলে সুন্দর দেখায় ইত্যাদি খুত্‌খুতে প্রশ্ন। একদিন বলেই ফেললাম যে, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে দাড়ি রাখা নয়, বরঞ্চ নবী করিম (সঃ) এর আদর্শের অনুসরণে এ দাড়ি রাখা। তাতে মুখাবয়ব সুশ্রী কি বিশ্রী হল সেটা ধর্তব্য নয়। তিনি আমার সাথে একমত পোষণ করেন। কিন্তু মনের অশ্বস্তি ও খুত্‌খুতে ভাব সম্পূর্ণ রূপে দূর করতে না পারায় বারবার তাঁর বাম হাতে আয়না আর ডান হাতে কাঁচি দেখেছি।

মদিনা হতে বিদায়

ইতিমধ্যে মসজিদে নববীতে আমাদের একাক্রমে চল্লিশ ওয়াক্তের জায়গায় ৪৫ ওয়াক্ত নামাজ হয়ে গেছে। সিরাজ এসে জানতে চাইলো আমরা কবে মদিনা ত্যাগ করছি। অর্থাৎ ঘর ছাড়তে তাগাদা দিল। কেননা আমরা গেলে সেখানে অন্যলোক উঠাবে এবং একই রকম ভাড়া পাবে। এরা সারা বৎসরের আয় সাধারণত এই হজ্ব মৌসুমেই করে থাকে। হজ্ব মৌসুমের পর এসমস্ত ঘরের তেমন কোন প্রয়োজন থাকে না। কালে ভদ্রে কেউ জেয়ারতে এলে দুয়েকটি ঘর ভাড়া হয় বৈকি। এমন ও শুনেছি অনেক সময় যে ঘর আমি তালাবদ্ধ করে দেশে চলে গেছি পরের বৎসর আরেক হাজী সাহেব এসে সে ঘরের তালা খুলেন ও ঝাড় দিয়ে পরিস্কার করেন। তাই এ সমস্ত ঘরের মালিকেরা সারা বৎসরের ভাড়া হজ্বের এই কয়েক মাসেই আদায় করে নিয়ে থাকেন। আলম সাহেবের মতামত জানতে চাইলে তিনি ভালমন্দ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন। আমি আর হুদা সাহেব পরের দিন মদিনা ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করার জন্য আলম সাহেবের পরামর্শ মতে ভুলুকে দায়িত্ব দিলাম। তদনুযায়ী ভুলু আমাদের পাসপোর্ট টিকেট ইত্যাদি ঠিকটাক করে এনে দিল। কিন্তু আলম সাহেবের কোন ব্যবস্থা করল না। বুঝতে পারলাম আলম সাহেব আমাদের সাথে মক্কায় যেতে ও থাকতে আর রাজী নন। পৃথক হয়ে যাবার জন্যে ভুলুর মাধ্যমে এভাবে ব্যবস্থা করেছেন।

পরের দিন বাদে ফজর আমি, বুলবুল, হুদা সাহেব ও মিসেস হুদা চারজন একসাথে রওয়াজা পাকে উপস্থিত হয়ে বিদায়ী জেয়ারত করলাম। বিদায়ী সালাম জানালাম। রওয়াজায়ে পাক তথা মদিনা মনওয়ারা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। বিরহের ব্যাথায়, বিচ্ছেদের বেদনায় মনটা টনটন করে উঠ্‌ল। এই পাক রওয়াজা ছেড়ে কিছুতেই যেতে ইচ্ছে হয়নি। অশ্রুজলে বুক ভেসে যাচ্ছে। সামনের দিকে কদম এগুতে চায়না তবু যেতে হয় বৃহত্তর কর্তব্যের আহবানে। জিয়ারত সমাপনে হাত তুলে দোয়া মাগলাম নিজের জন্য, সন্তানাদির জন্য, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের জন্য, স্বদেশের জন্য, বিশ্ব মুসলমানের জন্য। দোয়া মাগলাম আল্লাহ যেন এই পবিত্র ভূমিতে আবার আসার তওফিক দান করেন। আলবেদা জানিয়ে চোখ

www.pathagar.com

মুহূর্তে, মুহূর্তে ধীর পদচালনায় বেরিয়ে এলাম। মওলানা আবদুল হালিম শাহ সাহেব আমাদের তুলে দিতে বাসার দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত। হাশেম চাচাকে কিছু দিয়ে একখানা টেক্সী করে শাহ সাহেব সহ এসে পৌছলাম বাস ষ্টেশনে। ভুলু এসে আমাদের তুলে দেবার কথা ছিল। কিন্তু এল না। যথাস্থানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে টেক্সী চলে গেল। শাহ সাহেব আমাদের গাড়ীর নম্বর জান্‌তে মোয়াল্লিমের দফতরে গেলেন। ভীড়ের কারণে বেশ সময় লেগেছিল। আমরা লাগেজের উপর বসে রইলাম। নাম্বার নিয়ে যখন আসলেন দেখা গেল আমরা যেখানে বসে আছি আমাদের বাস সেখান থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে। অর্থাৎ টেক্সি বাস থেকে প্রায় দুইশ' গজ দূরে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। কোন কুলি মুঠে নেই এদেশে। তবে চার চাকার ক্ষুদ্রায়তনের মালবাহী কতগুলি ঠেলাগাড়ী পাওয়া যায়। ইয়েমেনী এক লোকের এরূপ একটি ঠেলাগাড়ীতে ১০ রিয়ালের বিনিময়ে বাসের কাছে পৌছে দিতে আমাদের সব মালগুলো তুলে দিলাম। দুর্ভাগ্য এই দু'শ গজ দূরত্বের মধ্যে কোন রাস্তা নাই। বালির মধ্য দিয়ে ঠেলা গাড়ীর ক্ষুদ্র চাকা চল্‌তে ইনকার করে দিল। অনেক ফুসলিয়েও গেঁড়ে যাওয়া চাকা গুলোকে তুলে সচল করতে পারল না ইয়েমেনী ঠেলাওয়ালা। অবশেষে গাড়ী থেকে মালগুলো সে এক রকম ফেলেই দিল। মাথায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাকে বেশী টাকার লোভ দেখালাম। কিন্তু তাতে এরা অভ্যস্ত নয়। রাজী হল না, চলে গেল। এরূপ অবস্থায় ভ্রমণ কালে পীচ ঢালা পথে ব্যবহার উপযোগী হুদা সাহেবের দু চাকার একখানি ট্রলী ছিল। সেটাকেও কত সাধাসাধি করলাম, জোর দেখালাম, ঠেলে দেখলাম, শক্তি ও প্রয়োগ করলাম। কিন্তু বালির উপর দিয়ে সে ও চলতে রাজী হল না। কিছুতেই কথা শুনলনা। তার চাকা ও ঘুরাতে পারালাম না। অগত্যা আমি, হুদা সাহেব ও শাহ্‌সাহেব অবশেষে সকলে ধরাধরি করে মাথায়, কাঁধে করে এনে মালগুলো তুলে দিলাম বাসের পিঠে আর পেটের ভিতর নিজেরা গিয়ে আসন নিলাম। কষ্ট দেয়ার জন্যে মাফ চেয়ে শাহ সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। শাহ সাহেবের কথা ভুলবার নয়। মদিনায় তিনি সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের গাইড ছিলেন। আমাদের অবস্থানকালে তিনি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে আমাদের দেখাশুনা করেছেন, তত্ত্বাবধান করেছেন, সেবাযত্ন করেছেন। আমাদের সকল ইচ্ছা আকাঙ্খার দাম দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই তিনি এসে আমাদের খবরাখবর নিয়েছেন। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। নিজে সাথে থেকে ছোট খাট কেনা কাটায় সংগ দিয়েছেন, সহায়তা দিয়েছেন। বিদায়ের সময় কাঁধে করে মাল বহন করেছেন আমাদের সাথে নিঃসংকোচে।

উদর পূর্ণ করে সকাল ৯টার দিকে বাস যাত্রা শুরু করল মক্কার পথে। কিছুক্ষণের মধ্যেই "বিরে আলীতে" এসে থামল। এস্থানকে আবার "জুলহোলাইফা" ও বলা হয়। গাড়ী থেকে নেমে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ওজু করে এখানের মসজিদে ঢুকলাম। ছোট একটি মসজিদ, তেমন কোন শান শওকত নেই। মদিনা হতে মক্কা যাবার পথে এখানেই এহরাম বাঁধতে হয়। তাই সকল গাড়ী এখানে যাত্রা বিরতি করে।

www.pathagar.com

যথরীতি এহরাম পড়ে নফল নামাজ পড়লাম। এখানেই আমরা সর্ব প্রথম এহরামের দুখণ্ড শ্বেত বস্ত্র পরিধান করলাম। এহরাম পড়ার সাথে সাথে হৃদয় মনে নতুন অনুভূতির সঞ্চার হল। লব্বাইকা বলে আল্লাহর দরবারে হাজীরা দিলাম এবং আল্লাহর ঘরে পৌছবার জন্য মন উতলা হয়ে উঠল। বুলবুল আর মিসেস হুদাকেও এহরামের নিয়মাবলী জানিয়ে দিলাম। শ্বেত শুভ্র দুখণ্ড সূতিবস্ত্র পরিধান করে নিজ সত্ত্বাকে, আমিত্বকে, অহংবোধকে ধুলায় মিটিয়ে দিয়ে তকবীর পাঠ করতে করতে গাড়ীতে ফিরে এলাম। এহ্রাম বাঁধার জন্য নির্দিষ্ট মীকাত বা স্থান হিসাবে ব্যবহার ছাড়া স্থানটির অন্য কোন গুরুত্ব নেই, কোনরূপ বৈশিষ্ট ও পরিলক্ষিত হল না। ছোট্ট একটি মসজিদ, তারই পাশে ওজু করবার জন্য ছোট্ট আর একটি অজুখানা মরুভূমির মধ্যখানে খাঁ খাঁ করছে। বাসে সহযাত্রী হিসাবে পেলাম কয়েকজন ভারতীয়। কেউ বর্দ্ধমান, কেউ মুর্শিদাবাদ, কেউবা কলকাতা, বোম্বে, প্রভৃতি স্থান হতে এসেছেন। সৌজন্য বিনিময় হল। হাবভাবে আচার আচরণে বুঝা গেল আমাদের মত বাংলাদেশীদের প্রতি এরা উদাসীন। যেমন দেখেছি মদিনায় আসামের হাজী সাহেবানদের বেলায়, গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাইলে ও দৃষ্টি এড়ায়। পরে মক্কায় দেখা হয়েছে নয়াদিল্লী, কাশ্মীর ইত্যাদি স্থানের কয়েকজন ভারতীয় হজ্বযাত্রীর সাথে। সকলেরই দেখেছি একই দৃষ্টিভঙ্গি। মনে হল যেন এরা আমাদের মতো বাংগালীদের প্রতি অতিশয় ক্ষুব্দ। আমাদের স্বাধীনতা তাদের বিরাগের প্রধান কারণ। এদের ধারণা পার্শ্ববর্তী বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের খণ্ডিতকরণ, প্রভাব বিস্তার করেছে ভারতীয় মুসলমানদের জীবনযাপনে। তারা মনে করত সে দেশের সরকার তাদের জীবন যাত্রার পদ্বতিতে তাদের ন্যায় সঙ্গত স্বার্থ রক্ষায় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা পেলে আমরা এদেশের মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে সোচ্ছার প্রতিবাদ জানাতাম এবং বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবার শক্তি রাখতাম। তারা মনে করে ভারতীয় শাসকগোষ্টীর প্ররোচনায় এবং চমকপ্রদ প্রবঞ্চনায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতার নামে বৃহৎ মুসলিম শক্তিকে খর্ব করে তাদের অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছি। তাই ভারতীয় মুসলমানদের আমাদের প্রতি এত বিরাগ, এত ক্ষোভ, এত গোস্বা। তারা আমাদের সাথে আলাপ করতেই অনিচ্ছুক। আমাদেরকে এড়িয়ে চলে। তাই তাদেরকে বুঝাতে পারিনি পাঞ্জাবী বাহিনীর আমাদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন, আর নির্যাতনের কথা। বুঝাতে পারিনি তাদের শোষণ আর দুঃশাসনের ইতিহাস। বুঝাতে পারিনি স্বাধীন বাংলাদেশী জাতি পৃথিবীর বুকে আজ মাথা উচু করে সদম্ভে দণ্ডায়মান। বুঝাতে পারিনি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি সত্তা নিয়ে বাঁচবার অধিকার আমাদেরও আছে।

বাস চলছেতো চলছেই। দ্রুত হতে ও দ্রুততর বেগে। জানালা পথে দৃষ্টি মেলে দিলাম দিগন্তের পানে। সূর্যের তীব্র কিরণে মরুভূমির বালুকণা চিকচিক করছে। যতদূর দু'চোখ যায় ধু ধু মরুপ্রান্তর আর পাথর ভরা সুউচ্চ পর্বত রাজি। গাছ নেই, পালা নেই, তৃণ নেই, আশে পাশে কোথা ও নেই কোন লতা পাতা সবুজের লেশ। রৌদ্রতপ্ত রুক্ষ মরুবালি আর শিলাময় পাহাড়ের দেশ এই আরবদেশ।

www.pathagar.com

ভাবলাম আল্লাহ পাক সব দেশে সব জিনিস একসাথে দেন না। একটি সবুজ তরু, একটু সবুজের আচ্ছাদনের জন্য এদেশের মানুষ কত লালায়িত। কত শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে সবুজ উদ্যান সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের দেশে দুটোবীজ মাটিতে পুতে দিলেই সবুজ অরণ্যের সৃষ্টি হয়। অথচ এদেশে আল্লাহ পাক এমন এক নেয়ামত দান করেছেন যার জন্য সারা বিশ্বের মানুষ এদেশে সমবেত হয়, পাগল পরা হয়ে ছুটে আসে এদেশে। জীবনে অন্ততঃ একবার এদেশে আসতে পারলে জনম ধন্য ও স্বার্থক জ্ঞান করে।

যেতে যেতে দেখি মাঝে মাঝে মরুভূমির মধ্যে বালির ঢিবি পাহাড়ের মত উচু, কিন্তু মসৃন। যেন কোন সুদক্ষ কারিগর এগুলো সাজিয়ে গুজিয়ে বসিয়ে রেখেছে। পাহাড়গুলি দেখেছি পাথর দ্বারা আবৃত, কিন্তু বালির ঢিবিগুলিতে সেরূপ কোন পাথর দেখা যায় না। বুঝলাম এটা লু'–জোন অর্থাৎ লু হাওয়ার এলাকা। এই এলাকায় লু'হাওয়া প্রবাহিত হয়। হাওয়ায় মরুভূমির বালি একস্থানে এনে এরূপ পাহাড়ের মত স্তুপ সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের মত দেখালেও এগুলো পাহাড় নয়। অন্যদিকের হাওয়ায় আবার এই বালির ঢিবি বিলীন হয়ে যাবে এবং নতুন জায়গায় নতুন ঢিবি সৃষ্টি হবে। আমাদের দেশের নদীর ভাঙ্গা গড়ার মত মরুভূমির ভাংগা গড়ার এক অপরূপ খেলা! লু'হাওয়া শুরু হলে মরুযাত্রী উটেরা এই সব বালির ঢিবির ভিতরে নাক গুজিয়ে জীবন রক্ষা করে। আবার যেতে যেতে দেখি রাস্তার উভয় দিকে প্রায় একমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে মরুভূমির উপর বড় বড় পাথরের টুক্‌রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রাস্তার দু'ধারে এরূপ পাথরের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেখে পুরনো লোক হিসাবে হুদা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম রাস্তার দুধারের এই পাথরগুলো কি প্রকৃতির নিয়মেই এইভাবে গড়ে আছে নাকি মানুষের পরিশ্রমের ফল। তিনি বললেন নতুন রাস্তা করার সময় পাহাড় কাটার দরুণ এসমস্ত পাথরগুলো এভাবে হয়তো বা পড়ে থাকতে পারে। আমার মন কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করল না। এত দীর্ঘ পথে উভয় দিকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাহাড় কাটা পাথর ছড়িয়ে থাকতে পারে না। বললাম লু'হাওয়া যখন শুরু হয় এই মরুর বালিগুলি এমন ভাবে উড়তে থাকে, যার মধ্য দিয়ে গাড়ী ঘোড়া চলা সম্ভব নয়। হুদা সাহেব বললেন শুধু তাই নয়, রাস্তার উপর বালি জমতে জমতে রাস্তার নাম নিশানা শুদ্ধ লুপ্ত হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারলাম এবং বিস্মিত হলাম যে আমাদের দেশে নদীর ভাঙ্গন রোধ করবার জন্য যেমন নদীর ধারে বড় বড় পাথরের টুকরা বিছিয়ে দেয়া হয়, ঠিক তেমনি রাস্তার ভরট রোধ করবার জন্য এবং যানবাহন চলাচলে অবরোধ পরিহার করার উদ্দেশ্যে সৌদী সরকার কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে রাস্তা নির্মাণ করে তা সংরক্ষণের জন্য দুধারে এ সব পাথরের টুকরা সমূহ বিছিয়ে দিয়েছেন। যাতে মরুভূমির বালি উড়ে এসে চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে।

মদিনা থেকে মক্কা ৪৮০ কিলোমিটারের এই পথ সৌদী সরকার সম্প্রতি নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। আগের পথে অনেক পাহাড় ছিল। পাহাড় বেয়ে যানবাহন চলাচল করতে নিদারুণ অসুবিধা হত। বর্তমানের নতুন পথে কোন

www.pathagar.com

পাহাড়ের বালাই নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই সমতলে অবস্থিত। হিজরতের সময় হযরত (দঃ) মক্কা থেকে মদিনার স্বাভাবিক পথ ধরে না গিয়ে তিনি এক ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছিলেন কোরায়েশদের দৃষ্টি এড়াবার উদ্দেশ্যে। এই নতুন রাস্তা নির্মাণের সময় সৌদি সরকার নাকি অনেক জরিপ চালিয়ে, এমনকি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে অনেক গবেষণা মূলক জরিপ পরিচালনা করে যতটুকু সম্ভব হিজরতের পথকে অনুসরণ করেই এই রাস্তা নির্মাণ করেছেন বলে প্রকাশ। তাই চিহ্নিত করতে পারিনি সে স্থান, যেখানে হযরত (দঃ) এর স্নেহময়ী জননী পুণ্যময়ী আমিনা স্বীয় পুত্র ও একমাত্র দাসী উম্মে আইমানকে নিয়ে মদিনায় পিত্রালয় হতে মক্কায় ফিরে যাবার সময়, অপ্রত্যাশিত রূপে অকস্মাৎ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে, মক্কা–মদিনার মাঝামাঝি পথিমধ্যে যেখানে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। সে এক করুণ দৃশ্য! চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত বালুকাময় মরু প্রান্তর। মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ। জন মানব, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবহীন এহেন অবস্থায় ছয় বৎসরের শিশু হযরত দাসী উম্মে আইমানের সহযোগিতায় স্বীয় মাতাকে কবরস্থ করে মক্কায় ফিরে গিয়েছিলেন। দেখতে পাইনি সেই কবরের কোথায় ও কোন অস্তিত্ব বা চিহ্ন। কেউ দিতে পারেনি সেই কবরের সন্ধান।

ইতিমধ্যে উদর শূন্য হয়ে চোঁ চোঁ করতে শুরু করে দিয়েছে। গাড়ী এসে একখানে থামলে চার জনেই নেমে পড়লাম। ঢুকে পড়লাম প্রকাণ্ড এক সরাইখানায়। পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি করে যাত্রীদের খাবার ও জলখাবার গ্রহণ এবং গাড়ী ও ড্রাইভারের বিশ্রামের জন্য এজাতীয় সরাইখানাগুলো খোলা হয়েছে। সেই রেষ্টুরেন্টটি দেখলাম আরব দেশীয় কায়দায় সাজানো নয়। বরঞ্চ আধুনিক চেয়ার টেবিলে সজ্জিত। হল ঘরটির একপাশে লম্বা টেবিলের উপর ভাত, রুটি, তরিতরকারী ও মাংস প্রভৃতি থরে থরে সাজানো। সামনে একজন লোক দাঁড়ানো। এখানে কোন বয় বেয়ারা নেই। সেল্ফ হেল্প সিষ্টেম। দাম বুঝিয়ে দিয়ে কাউন্টার থেকে ইচ্ছামত খাবার নিজ হাতে নিয়ে টেবিলে এসে বসে খেতে হয়। আমরা খাবার সংগ্রহের জন্য কাউন্টারের দিকে অগ্রসর হলাম, দেখলাম সেখানে আছে 'খবুজ' অর্থাৎ আরব দেশীয় মোটা মোটা রুটি, পোলাও ভাত, দুম্বা ও খাসীর মাংস আস্ত মুরগীর ভূনা রোষ্ট। দামের দিক থেকে মুরগীর রোষ্টই সবচেয়ে সস্তা দেখে আমরা চার জনে চার প্লেট ভাতের সাথে আস্ত একটা গোটা মুরগীর রোষ্ট আর কিছু তরকারী নিয়ে ফেললাম। খাবার জন্য টেবিলের দিকে পা বাড়াতেই দোকানী বলল "ফুলুছ" অর্থাৎ টাকা দাও? ভেবেছিলাম আমাদের দেশের মত খাবার পরে কাউন্টারে এসে টাকা দিয়ে যাবো। কিন্তু সে যো নেই। টাকা দিয়ে খাবার কিনে টেবিলে বসে খেয়ে যখন ইচ্ছে চলে যাও। পরে তারা বাসন প্লেট কুড়িয়ে আনবে। খেতে বসে পাশের টেবিলে দেখলাম আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার আস্ত একটা খবুজ আর কিছু গোশ্ত নিয়ে দুই পা চেয়ারের উপর তুলে দিয়ে বসে আরামচে গলাধঃকরণ করছে। ড্রাইভারকে পাশে উপবিষ্ট দেখে আমরা স্বস্তিতে খাওয়া দাওয়া করলাম। কেননা নিশ্চিন্ত থাকলাম যে

www.pathagar.com

আমাদের না নিয়ে বাস যাচ্ছে না। কখনো কোথাও গাড়ী থেকে নামলে সব সময় সতর্ক থাকতে হয় এবং গাড়ীর নম্বর বিশেষভাবে টুকে রাখতে হয়। অনেক সময় অনেক হাজী সাহেবদের বেলায় এরূপ ঘটেছে – গাড়ী থেকে নেমে হয়তো কোনদিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছেন এসে গাড়ীটি আর চিহ্নিত করতে পারছেনা। কেননা সব কয়টি বাসই একই রকম। তার নম্বর ও আবার আরবীতে। আবার ফিরতে দেরী হলে তাকে রেখেই গাড়ী চলে গেছে। এরূপ অবস্থায় সাংঘাতিক বিপদগ্রস্থ হয় হাজী সাহেব। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের অক্ষরজ্ঞানহীন বৃদ্ধ হাজী সাহেবানরা। নিশ্চিন্ত মনে খাবার শেষ করে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পানির দু'টি বড় বোতল নিয়ে ড্রাইভারের পিছু পিছু পুনরায় গাড়ীর জটরে প্রবেশ করলাম। প্রচণ্ড রোদের মধ্য দিয়ে গাড়ী চলছে। উত্তপ্ত হাওয়ার তাপ এসে লাগছে চোখে মুখে। এরূপ প্রখর রৌদ্রের মধ্য দিয়ে গাড়ী একাক্রমে বেশী দূর চলতে পারে না। অথবা ড্রাইবার চালায় না। তাই ঘন ঘন গাড়ী থামে এবং বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। পরের ষ্টেশনে এসে থামলে হাতের অর্ধেক খালি বোতলটি নিয়ে সরাইখানার ভিতরে ঢুকে ওজু করার উদ্দেশ্যে পানির টেপের দিকে গেলাম। দেখি আমাদেরই কয়েকজন সহযাত্রী সেখানে ওজু করতে চাইলে একজন বেয়ারা বাধা দিচ্ছে। তাই আমি টেপে ওজু না করে ওজুর পানি সংগ্রহ করার জন্য টেপের মুখে হাতের বোতলটি বসিয়ে দিলাম। কিছু পানি তাতে ঢুকলে একজন বেয়ারা এসে হাতে ধাক্কা দিয়ে বোতলটি সরিয়ে দিয়ে নলটি বন্ধ করে দিল। অর্থাৎ এখান থেকে পানি নেয়া যাবে না জানিয়ে দিল। বেয়ারার এহেন আচরণে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলাম। আরবদেশে এক কালে পানির অভাব থাকলে ও সৌদিসরকারের কল্যাণে বর্তমানে যেখানে সেখানে পানির ঢল। পানি নিতে বারণ করায় বোতলের মধ্যে যেটুকু ঢুকে গিয়েছিল সে টুকু ও জায়েজ হবে না ভেবে রাগে দুঃখে ক্ষোভে সকলের সামনে হাতের বোতলটি উপুড় করে পানি গুলি ঢেলে ফেলতে শুরু করে নিজের গোস্বা জাহির করে দিলাম। বেয়ারাটি সহ সকলে আমার দিকে বিস্ময়াবিভূত হয়ে তাকিয়ে রইল। কি যেন বলতে চাচ্ছে, কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছে না। আমি পরিস্কার আমার নিজের ভাষায় বলতে লাগলাম বিনা অনুমতিতে যে পানি নিয়ে ফেলেছি সে পানিতে ওজু করা দুরস্ত হবে না। তাই তোমাদের পানি তোমাদেরকে ফেরৎ দিলাম। পরে তৈয়মুম করেই জোহরের নামাজ পড়েছি। খুব সম্ভবতঃ ঐ সময়ে কোন কারণে ঐ সরাইতে পানির ঘাটতি হয়েছিল। নইলে সারা আরবে আর কোথাও কখনো এহেন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। তদুপরি এই সরাইখানাগুলো সরকার অনুমোদিত। যাত্রীদের বিশ্রাম, খাওয়া দাওয়া ও ওজুর পানি ইত্যাদি সরবরাহের জন্যই পথিমধ্যে মাঝে মাঝে এ জাতীয় সরাইখানা গুলো খোলা হয়েছে। পানির বিশেষ অভাব না থাকলে আমাদেরকে বাধা দেয়ার কথা নয়। অন্যান্য সরাইখানাতে দেখেছি সকলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপচয় করছে, তথাপি কেউ কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেনি।

সূর্যাস্তের অপূর্ব দৃশ্য দেখেছি পতেঙ্গার সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে, কক্সবাজারের বেলাভূমি আর চট্টগ্রামের কাছারী পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে। এবার দেখলাম চলন্ত বাসের ভিতরে বসে মরু বক্ষে সূর্যাস্তের আরেক অপরূপ দৃশ্য। তরুতৃণলতা হীন

www.pathagar.com

সমতল মরুবক্ষের উপর দিয়ে দিগন্তের পানে তাকিয়ে পানি ভরা সাগর আর বালু ভরা মরুভূমির মধ্যে কোন প্রভেদ নজরে আসেনি। দু'টিকেই মনে হয় একই রকম রূপালী সাগর লোনা জলে চিক চিক করছে। সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে যেমন মনে হয় আকাশ সমুদ্রের সাথে মিতালি করছে, মরুভূমির বেলায় ও তাই মনে হয় দিগন্ত রেখার বরাবর নির্মেঘ নীলাকাশ আর মরুসাগর একই সাথে মিশে গেছে। তারই ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে অতলে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে – রক্তলাল গোলাকার এক অগ্নিপিণ্ড, লাল্‌চে আভায় লাল হয়ে গেছে গোটা পশ্চিমাকাশ। সূর্য্য অদৃশ্য হবার পরও সেই লাল আভা মুছে যায়নি অনেকক্ষণ ধরে।

৪৮০ কিলোমিটারের এই পথ একটানা চললে শেষ করতে সময় লাগে পাঁচ ঘন্টা। পঞ্চাশের দশকে পাহাড়ী পথ বেয়ে লক্কর মার্কা বাসে চড়ে এই পথ পাড়ী দিতে সময় লাগতো তিন দিন। তার ও পূর্বে মরুজাহাজ উটে চড়ে মঞ্জিল করে করে পক্ষকাল লেগে যেত এ পথ অতিক্রম করতে। ধন্যবাদ সৌদি সরকারকে। হাজীদের কল্যাণে বিপুল অর্থব্যয়ে সংকোচিত করেছে দীর্ঘ এই যাত্রাপথ। কিন্তু ধন্যবাদ দিতে পারিনি গাড়ীর ড্রাইভারকে, কেননা পাঁচ ঘন্টার পথ থেমে থেমে অতিক্রম করতে সে সময় নিয়েছে মোবল্লগ বার ঘন্টা। সব দোষ ড্রাইভারের একথা বললেও ঠিক হবে না। গাড়ীটি দুয়েক জায়গায় গোস্বা হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে যেত। অনেক সাধাসাধি করলে ও চলতে চাইত না। অবশেষে ড্রাইভার নেমে সামনে গিয়ে নব বধূর মত তার ঘোমটা খুলে হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ সোহাগ করে দিলে তবে সে আবার সচল হয়ে উঠত। বাঙালীরা দেখেছি দেশে যেমন বিদেশে ও একই রকম সন্দিগ্ধমনা। দুয়েক জনের মধ্যে গুঞ্জরণ উঠল ড্রাইভারকে অতিরিক্ত কিছু বকশিস নামক ঘুষ না দিলে গাড়ী পথে পথে এরূপ গোস্বা করতেই থাকবে। আগামী দিনের পূর্বে মক্কায় পৌঁছানো যাবে না। আমাদের দেশের হালচাল দেখে এরূপ ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হলেও সউদী আরবেও এরূপ হতে পারে সেটা কল্পনাতীত। তবুও বিদেশেও বাঙালী ধারণা অপরকে ধার দিয়ে বাঙালীরা সেখানেও বপন করেছে দুর্নীতির বীজ। আরবীরা সাধারণতঃ সরলমনা, একরোখা, মিথ্যা কথা বলতে অনভ্যস্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত। কিন্তু আজকাল শুনি মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবখানেই শুধু বাঙালী বলে নয়, সম্ভবতঃ এই উপ–মহাদেশীয়দের সংমিশ্রণে এসে এরাও হালে জেনে ফেলেছে কিভাবে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে হয়। সে কাহিনী আমরা শুনে থাকি মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এন·ও·সি· সংগ্রহ এবং সেখানে চাকুরী, ব্যবসা, ভূমি সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে। তাই দেখেছি ড্রাইভারকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাবে ভারতীয়রাও সমর্থন দিয়ে ফেলল। লম্বা চিপ চিপে বর্ধমানের এক হাজী সাহেব নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রত্যেক যাত্রী থেকে এক রিয়াল করে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। এভাবে ৪০/৫০ রিয়াল সংগ্রহ করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে তাকে শিখিয়ে দেয়া হল যে, এভাবে পথিমধ্যে অহেতুক বিলম্ব করলে, যাত্রীগণকে নানাভাবে হয়রানি করলে, অতিরিক্ত কিছু পয়সা পাওয়া যায়। সৌদী আরবে এ জাতীয় অতিরিক্ত পয়সা বা ঘুষ

www.pathagar.com

গ্রহণ করা জঘন্যতম অপরাধ এবং কঠোরভাবে দণ্ডনীয়। আমি সংগত ভাবেই আশা রাখতে পারি যে আইনের কড়াকড়ির মধ্যেও ভবিষ্যতে ড্রাইভার তার এই অভিজ্ঞতাটুকু কাজে লাগিয়ে টুপাইস বানিয়ে নেবে। মক্কার সন্নিকটে এসে পথিমধ্যে এক জায়গায় গাড়ী থামল। ইহা একটি পেট্রোল পাম্প। নিকটেই সরকারী দফতর। অদূরে ছোট্ট একটি মসজিদ। তখন সূর্য্য ডুবে গেছে। নামাজ শেষে ড্রাইভার সকলের পাসপোর্ট নিয়ে সরকারী দপ্তরে গেল। সরকারী কর্মচারী পাসপোর্টে সীল দিয়ে আমাদের মোয়াল্লেমর নাম তথা গন্তব্যস্থল অঙ্কিত করে দিল।

-- ঃ ০ ঃ --

www.pathagar.com

মক্কা মোয়াজ্জমা

ড্রাইভারকে ঘুষ দেয়ার বদৌলতে অবশেষে রাত্রি ৯টার দিকে আমরা উচ্চস্বরে তলবীয়া পাঠ করতে করতে সুরক্ষিত শান্তির নগরী, "বালাদিল আমিন," পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলাম। গাড়ীতে বসে দূর থেকেই দেখলাম হেরেম শরীফের সুউচ্চ মিনার। পুলকে মন আপ্লুত হয়ে গেল–আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে এল। গাড়ী চলছে। ড্রাইভার খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের মোয়াল্লিমের সদর দফতর। কেননা এখানে নিয়ম সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত মোয়াল্লিমের অফিসেই যাত্রীদের নামিয়ে দিতে হবে। অন্যত্র নামিয়ে দিলে তারা গন্তব্যস্থল খুঁজে বের করতে পারবে না। তাই ড্রাইভার মোয়াল্লিমের অফিস চিনতে না পেরে দুয়েক জায়গায় খোঁজ নিল। তারপর কে যেন বলে দিল ঐ যে সামনে দোতালার উপর গাড়ী পার্ক করার যে বিরাট দালান আছে তারই পার্শ্বে আমাদের মোয়াল্লিমের অফিস। এবার চিনতে পেরে ড্রাইভার সঠিক জায়গায় গাড়ী থামাল। ইতিপূর্বে কিন্তু ভারতীয়দের নির্ধারিত গন্তব্যে নামিয়ে দিয়েছিল। দেখলাম তার অনতিদূরে স্তম্ভের উপর একটি বিরাট দালান দাঁড়িয়ে আছে। জানলাম সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে এখানে নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে গাড়ী রাখা হয়। গাড়ী থামার সাথে সাথে মোয়াল্লিমের লোক এসে আমাদের মালপত্র নামিয়ে নিল এবং তারা মাথায় করে তা মোয়াল্লিমের দফতরে নিয়ে বাইরে বারান্দায় এক কোণায় স্তুপ করে রাখল। মোয়াল্লিমের যে লোকটি আমাদের অভ্যর্থনা জানাল সে বাঙালী, চাটগাঁর অধিবাসী। মোয়াল্লিম লোক কেমন হুদা সাহেবের প্রশ্নের জবাবে সে জানাল ভালো লোকদের জন্যে ভালো। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোয়াল্লিম দুর্ব্যবহার করেন।

ইতিপূর্বে হজ্বে আসলে মোয়াল্লিম নির্বাচনে হাজীদের স্বাধীনতা ছিল। ফলে যাঁদের খ্যাতি আছে, সেবা যত্ন, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সুনাম আছে অথবা পূর্ব পরিচয় আছে হাজী সাহেবরা স্বাধীন ভাবে সেই মোয়াল্লিমকে নির্বাচন করে তারই তত্বাবধানে হজ্বব্রত পালন করতেন। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ধরে সৌদী সরকার মেহেরবানী করে হাজী সাহেবানদের এই স্বাধীন অধিকারকে সম্পূর্ণ রূপে নস্যাৎ করে দিয়ে কোম্পানী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। এই ব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেকটি দেশের জন্য সরকার কয়েকজন মোয়াল্লেম নিযুক্ত করে তাদের সকলের সমন্বয়ে একেকটি কোম্পানী গঠন করেছেন। মক্কায় প্রবেশকালে পথিমধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ পাসপোর্টে মোহরাঙ্কিত করে বলে দিবেন কোন হাজী কোন মোয়াল্লিমের অধীনে যাবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলে ও হাজী সাহেবকে সেই মোয়াল্লিমের কাছেই যেতে হবে এবং সেই মোয়াল্লেম থেকে ছুটে এসে অন্য মোয়াল্লিমের কাছে যাবার পথ রুদ্ধ। কাজেই মোয়াল্লেমেরা হাজী সাহেবানদেরকে অন্ততঃ বাংলাদেশী হাজীদেরকে ভেড়ার পাল বা কলুর বলদের চেয়ে উন্নততর কোন প্রাণী বলে মনে করেন না। তারা নিজেদের আখের গুছাতে ব্যস্ত। হাজীদের সুযোগ সুবিধা এবং হজ্বের বিভিন্ন আহকাম সুষ্টুভাবে শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিপালনে গাইড্যান্স্ দেয়ার

www.pathagar.com

আদৌ কোন প্রয়োজন অনুভব করেন না। মোয়াল্লিমের প্রধানতম কর্তব্য হল হজ্বের আহকাম পালনে প্রয়োজনীয় গাইড্যান্স দেয়া, থাকার ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা। এই খাতে প্রত্যেকটি হজ্ব যাত্রীর কাছ থেকে সরকারের মাধ্যমে নির্ধারিত ফিস দেশ থেকে যাত্রার পূর্বেই আদায় করে নেয়া হয়েছে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে গাইড্যান্স ষোল আনা অনুপস্থিত। মোয়াল্লেম সেটাকে কর্তব্যের মধ্যে গণ্যই করেন না। থাকার ব্যাপারে মোয়াল্লেম মক্কা নগরীর বিভিন্ন অঞ্চলের কতিপয় গৃহ পূর্বাহ্নে কম হারে ভাড়া করে নিয়ে উচ্চহারে হাজীদের নিকট ভাড়ায় লাগিয়ত করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। তাই কোন হাজী মোয়াল্লেমের গৃহে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে মোয়াল্লেম সাহেব অত্যন্ত নাখোশ হয়ে যান এবং তাকে নানাভাবে হয়রানি করতে শুরু করেন। পারত পক্ষে তাকে ভিন্ন ঘরে থাকবার অনুমতি দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। তাই মোয়াল্লিমের দাপটে মক্কায় হাজীরা সন্ত্রস্থ থাকেন।

গাড়ীর পেট থেকে বের করে এনে আমাদেরকে মোয়াল্লিমের দফতরের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। অফিসের সামনে বাংলায় লেখা বিরাট এক সাইনবোর্ড। এতক্ষণে জানতে পারলাম, আমাদের স্বনামধন্য মোয়াল্লিম সাহেবের নাম সফির উদ্দিন আহমদ। আমরা আসার পূর্বে সম্ভবতঃ আমাদের আগের বাসে আগত জনা পঞ্চাশেক হাজী বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদেরকেও সেখানে দাঁড়াতে বলল। বলা হল সকলকে ওমরার উদ্দেশ্যে হেরেম শরীফে নিয়ে যাওয়া হবে। পরে দেখি চট্টগ্রাম জিলা আইনজীবী সমিতির প্রবীন সদস্য এডভোকেট আহমদ হোসেন সাহেবও তাদের মধ্যে আছেন। কুশল বিনিময়ের পর একই সাথে ওমরার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য তৈরী হলাম। আমরা মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। তখন মানসিক অবস্থা ও সম্পূর্ণ আলাদা। কাবা দর্শনের জন্য দেহমন উদগ্রীব। তাই কোনরকম বিশ্রাম বা খাওয়া দাওয়া ছাড়াই পায়ে হেঁটে দলবেঁধে রওয়ানা দিলাম–মোয়াল্লেমের জনৈক বাঙালী কর্মচারীর নেতৃত্বে। উচ্চস্বরে লব্বায়েকা পড়তে পড়তে মাইল খানেক পথ হেঁটে হেরেম শরীফের 'বাবে আবদুল আজীজ' ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হলে মোয়াল্লিমের কর্মচারী বললেন, এখানে সকলের পাদুকা রাখুন। যাবার সময় যদি ফিরে পান তো ভাগ্য ভাল নচেৎ খালি পায়ে চলে যাবেন। আশা করেছিলাম মোয়াল্লিমের এই কর্মচারী আমাদেরকে ওমরাহর আহ্কাম পালনে আমাদের সাথে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করবেন। কারণ শতকরা ৯৫ জন হাজীই তো নতুন। কিভাবে তাওয়াফ করতে হয়, কোথা হতে শুরু করে কোথায় শেষ, কোথায় মোকামে ইব্রাহিম আর কোথায় বা জমজম কুপ, আর কিভাবে সাফা মারওয়ায় সায়ী করতে হয় এগুলো কিছুই জানেন না। এইক্ষেত্রে গাইডের সহায়তা অত্যন্ত অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাদুকা রাখতে বলার পর হতে মোয়াল্লিমের কর্মচারীর টিকিটি ও আর দেখিনি। কিভাবে ঢুকতে হয়, কি দোয়া পড়তে হয়, এ সম্পর্কে তাই নিজ নিজ জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকেই বাধ্য হয়ে কাজে লাগাতে হল। নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করে, অশ্রুসজল নয়নে, "আল্লাহ তোমার দরবারে হাজির, তোমার কোন শরীক নেই" বলতে বলতে হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে সম্পূর্ণ খানায়ে কাবা – বায়তুল্লাহ শরীফ নজরের মধ্যে এসে গেল।

www.pathagar.com

এতদিনের বহু আকাংখিত ইস্পীত আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হতে পারার দরুণ মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা আমার মত অভাজনের পক্ষে সম্ভব নয়। তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলুম আল্লাহর সেই ঘরের দিকে, যা আগা গোড়া কালো রংয়ের গিলাপ দ্বারা আবৃত। মূল কাবাগৃহ হাজীদের দর্শনের জন্য গিলাপের নিম্নাঞ্চল উপরের দিকে ভাজ করে কোণায় রসি দিয়ে উপরের দিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফলে কাবা গৃহের মূল দেওয়াল নিম্নের দিকে হাজীরা স্পর্শ করতে পারেন, স্পর্শ করতে পারে 'রুকনে ইয়েমেনী' এবং চুমু দিতে পারেন হাজরে আস্ওয়াদ বা কালো পাথরে। ৩৬ ফুট দীর্ঘ, ৩০ ফুট প্রস্থ এবং ৫০ ফুট উচ্চ পাথর দিয়ে তৈরী আল্লাহর এই ঘর দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের কেবলা বা উপাসনার কেন্দ্র বিন্দু। কোন সন্দেহ নাই, যে ব্যক্তি একবার এখানে পদার্পন করতে পেরেছেন সে সৌভাগ্যবান। এই কাবাকে কেবলা করে দুনিয়ার মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। সেই কাবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে খালি চক্ষে সেই কাবা নিরীক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করলাম। আল্লাহর কাছে বার বার শোকরিয়া আদায় করলাম – করুণা করে তিনি আমার মত পাপীকেও সে সুযোগ দান করেছেন বলে।

কাবার চারিদিকের উন্মুক্ত চত্বরে চক্রাকারে বিভিন্ন মুসলিম দেশের হাজীরা সংঘবদ্ধ ভাবে তাওয়াফ করছেন। তাদের একজন নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দোয়া পাঠ করছেন, তারই মুখে মুখে তার অনুসারীরা সে দোয়া উচ্চারণ করে যাচ্ছে। আমরাও ভেবেছিলাম দলবদ্ধ ভাবে তাওয়াফ শুরু করব। কিন্তু আমাদের অন্যান্য সাথীরা কে কোথায় কোনদিকে অন্যান্যদের সাথে মিশে গেছে দেখতেই পাইনি। অনেক খোঁজা খুঁজির পর আমি, হুদা সাহেব আর আমাদের দুই মিসেস ছাড়া আর কাউকে এক স্থানে দেখতে পেলাম না। অতএব আমার বইপড়া নগণ্য জ্ঞান আর হুদা সাহেবের পূর্বের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বল করে তাওয়াফ আরম্ভ করলাম। হুদা সাহেব কাবাগৃহের চারিদিকে গোলাকার উন্মুক্ত চত্বরের দক্ষিণ পূর্বকোণে হাজরে আসওয়াদের সোজাসুজি মেঝেতে দেওয়া কালো দাগ এবং তদবরাবর মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের বাহির দিকে দেয়ালে লম্বা লম্বি ভাবে সবুজ নিয়ন বাতি দেখিয়ে বললেন, এই কালো দাগ থেকেই তাওয়াফ শুরু করতে হবে। চক্রাকারে চারিদিকে ঘুরে আবার এই কোণায় এসে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিয়ে, হাতে স্পর্শ করে অথবা ইশারায় চুমু দিয়ে তাওয়াফ শেষ করতে হবে। এইরূপে সাতচক্র ঘুরলে এক তাওয়াফ শেষ হয়। ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে উভয়ে উভয়ের মিসেসকে নিজ নিজ বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে তাওয়াফ শুরু করলাম। তওয়াফ কালে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের রুকনে ইয়ামেনীকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করতে পারলে ও ভীড়ের জন্য দক্ষিণ পূর্বকোণে স্থিত হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হওয়াও ছিল অসম্ভব ব্যপার, চুমু দেওয়াত দূরের কথা। তদুপরি মেয়ে ছেলে নিয়ে সে দিকে অগ্রসর হওয়া ছিল দুঃসাধ্য। তাই ইঙ্গিতেই প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরে চুমু দিলাম। এইভাবে সাত চক্কর শেষে মোকামে ইব্রাহিমের পেছনে একটি ফাঁকা

www.pathagar.com

জায়গায় নফল নামাজ আদায় শেষে হুদা সাহেব নিয়ে গেলেন জমজম এর ধারে। নারী পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক প্রবেশ দ্বার রয়েছে এখানে। বুলবুল আর মিসেস হুদা নারীদের পথ দিয়ে আর আমরা দুজন পুরুষের পথ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে গিয়ে জমজম দ্বারে উপনীত হলাম। মূল জম জম কুয়া বর্তমানে কাঁচের দেয়াল দ্বারা ঘেরা। কাঁচের দেয়ালের বাহির থেকে দেখা যায় ছোট্ট এই কুয়াটির পাড়। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ পথ রুদ্ধ। আগের মত কূপ থেকে কষ্ট করে বাল্‌তি দ্বারা তুলে এখন হাজীদের পানি পান করতে হয় না। সৌদী সরকারের বদান্যতায় বিপুল সংখ্যক টেপের মাধ্যমে হাজীরা ইচ্ছেমত পরম তৃপ্তিতে এই পবিত্র পানি পান করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে চলে গেলাম সাফা মারওয়ায় সায়ীর উদ্দেশ্যে। সেখানে সায়ী শেষ করে হেরেম শরীফের বাইরে এসে চার জনের এক জনেরও সেণ্ডেলগুলি আর খুঁজে পেলাম না। অগত্যা নগ্ন পদে সারা পথ হেঁটে ফিরে এলাম মুয়াল্লিমের দফতরে। তখন রাত প্রায় একটা। ছোট্ট আকারের একটি দফতর। বাইরের দিকে স্বচ্ছ কাঁচের দেয়াল ও দরজা। মেঝেতে নগণ্য ধরণের একটি কার্পেট। দু'পাশে পুরুগদী আঁটা বেঞ্চি। একধারে একটি হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল তার অপর পাশে একটি চেয়ারে শ্মশ্রুমণ্ডিত খর্বাকৃতির যেই ভদ্রলোক উপবিষ্ট তিনিই নাকি মোয়াল্লিম সাহেব। সর্ব প্রথম দেখলাম তাঁকে। হাতে ইয়া লম্বা সেই হুক্কার নল, মাঝে মাঝে টানছেন আর ধূঁয়া উদ্‌গীরণ করছেন। জানতে পারলাম তিনি বাঙালী, বরিশালের অধিবাসী। কিন্তু ভান করেন যেন আরব স্থানের একজন খাস বাসিন্দা। খাটো আকৃতির, কঠোর প্রকৃতির, কর্কশভাষী লোকটিকে দেখেই মনে মনে প্রমাদ গুণছিলাম, অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! ভিতরে ঢুকতেই বললেন জুতা খুলে আসুন। বুঝলাম মেঝেতে বিছানো তার নগণ্য কার্পেট নামক বস্তুটিকে ধূলাহতে বাঁচাবার জন্যেই এই অবাঞ্চিত নির্দেশ।

হেরেম শরীফে যাবার সময় পরিচিত একজন বাঙালী ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে তার মাধ্যমে হুদা সাহেব স্বীয় কন্যা জামাতা জাহাঙ্গীরের নিকট সংবাদ দিয়েছিলেন। ফিরে এসে মোয়াল্লিমের দফতরে জাহাঙ্গীরকে পেলাম আরো কয়েকজন সংগীসহ। রাত বেশী হয়ে যাওয়াতে মোয়াল্লিমের ঘরে যাওয়ার জন্য খুব বেশী পীড়াপিড়ী না করে আপাততঃ জামাতার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে অনুমতি দিয়ে দিলেন। জাহাঙ্গীর এবং তার সংগীরা আমাদের আসবাবপত্র গুলো মাথায় ও কাঁধে করে মিসফালায় একটি ছোট্ট তেতালা দালানের দোতালার কক্ষে এনে রাখল। আমরা সেখানে বিছানা পাতলাম। কক্ষটি চারজনের জন্য বেশ বড়। কক্ষ সংলগ্ন পাকঘর। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি জেনে জাহাঙ্গীরের ছোট ভাই আলমগীর পাকের ব্যবস্থা করতে লাগল। জাহাঙ্গীর একখানা কাঁচি নিয়ে প্রথমে তার শ্বাশুড়ীর চুলের কিয়দংশ কেটে এবং তিনি বুলবুলের চুলের কিয়দংশ কেটে দিলে তারা দুজন এহরাম হতে মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর দাড়ি কাটার সেফটি রেজর দিয়ে জাহাঙ্গীর প্রথমে হুদা সাহেবের পরে আমার মাথা মুণ্ডন করে দিলে আমরা ও এহরাম খুলে ফেললাম। অতঃপর গোসল করে ঘরে এসে চার জনে খাওয়া দাওয়া করে যখন উঠলাম তখন রাত প্রায় তিনটা।

www.pathagar.com

পরের দিন সকাল ১০টার দিকে চূড়ান্ত ব্যবস্থার জন্য আমি আর হুদা সাহেব মোয়াল্লিমের দফতরে গেলাম। জামাতার বাসায় থাকতে দিতে মোয়াল্লিম নারাজ। বললেন, আপনাদের জন্য আপনাদের পছন্দনীয় আমি ভালো ভালো ঘর রেখেছি। যে কোন একটি পছন্দ করে নিন। হুদা সাহেবই মোয়াল্লিমের সাথে আলাপ করছিলেন। আমি কথা বলার চেষ্টা করলে তিনি আমাকে হস্ত উত্তোলন করে স্তব্দ করে দিলেন। হুদা সাহেব আত্মীয়ের বাসায় থাকতে জোর দিলে, মোয়াল্লিম সেই বাসার বাসযোগ্যতা তদন্তের জন্য প্রতিনিধি মারফৎ পরিদর্শনের প্রস্তাব করলেন। হুদা সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হলে দুজনে বেরিয়ে আসতে আসতে আমি মন্তব্য করলাম মোয়াল্লিম বেটা "ইজ এ হার্ডনাট"। অতঃপর জাহাঙ্গীরকে নিয়ে বাংলাদেশ হজ্ব মিশনে গেলাম। প্রধান সড়ক থেকে একটু ভিতরে, ছোট তিন তলা একটি দালান, ছাদের উপরে বাংলাদেশের রক্ত লাল সূর্য খচিত পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে আর সগৌরবে বাংলাদেশের অস্তীত্ব ঘোষণা করছে। দালানটির নীচের তলায় একটি কক্ষে নামমাত্র একটি ডিসপেনসারী, একজন ডাক্তার, দুচার জন রোগীকে নিয়ে কোন রকমে বসতে পারেন। দোতলায় অনুরূপ একটি কক্ষে হজ্ব অফিস। তেতালায় একটি কক্ষে বাংলাদেশ বিমানের একজন কারণিক। ছোট একটি টেবিল নিয়ে বসে আছেন, সাথে একজন দপ্তরী। এহেন ক্ষুদ্রাকৃতির একটি অখ্যাত দালানে নাম মাত্র কর্মকর্তা ও চিকিৎসক নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকার মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রতি বৎসর হজ্বযাত্রীদের তত্ত্বাবধান করেন, হজ্ব মৌসুমে। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় হজ্ব অফিসে গেলাম। ছোট একটি কক্ষে আরো ছোট একটি টেবিল সামনে রেখে বসে আছেন সৌম্য কান্তি, শান্ত চেহারার এক ভদ্র লোক। নাম কর্নেল রহমান। টেবিলের চারিদিকে দুচারজন হাজী তাকে ঘিরে রেখেছে। টেলিফোনে কি জানি আলাপ করছিলেন তিনি। আমি আর হুদা সাহেব কোন রকমে একপাশে বসার জায়গা করে নিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর অন্যান্য হাজী সাহেবানরা চলে গেলে হুদা সাহেবকে পরিচয় করিয়ে দিলাম, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য এবং সুপ্রীম কোর্ট এর হাই কোর্ট ডিভিশন, চট্টগ্রাম শাখার আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসাবে। হুদা সাহেবও চট্টগ্রাম জিলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর সাথে আলোচনা করলাম। জামাতার বাসায় অবস্থান করার আমাদের ইচ্ছার প্রতি মোয়াল্লিমের বিরোধীতার কথা জানালাম। ভদ্রলোক ধৈর্যসহকারে আমাদের বক্তব্য শুনলেন এবং 'হয়ে যাবে' বলে আশ্বাস দিয়ে আমাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু পরে জানতে পেরেছি মোয়াল্লিমের উপর হজ্ব মিশনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, প্রভাব ও নেই। মোয়াল্লিমেরা হজ্ব মিশনের অনুরূপ হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে মোটেই রাজী নন। তারা মনে করেন মেষের পালের মত ইচ্ছেমত হাজীদের নাকে দড়ি দিয়ে টানা হেঁচরা করতে তাদের অধিকার একচ্ছত্র। তাই হজ্ব মিশনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে আমাদেরকে জামাতার বাসায় অবস্থান করার অনুমতি দিলেন না। মোয়াল্লেমকে হুদা সাহেব বাংলাদেশ সরকারের প্রচার পত্র দেখিয়ে বললেন যে, ইচ্ছেমত ঘরে থাকবার অধিকার আমাদের আছে। মোয়াল্লিম তাচ্ছিল্য সহকারে জবাব দিলেন আইন দেশের আদালতে দেখাবেন, এখানে

www.pathagar.com

নয়। ফলে দুজনের মধ্যে খুব উষ্ণ বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। অবশেষে বাসায় এসে যখন হতাশ হয়ে মোয়াল্লিমের খোঁয়াড়ে ঢুকতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলাম, জাহাংগীর বলল তার বন্ধু কায়সার একটা ব্যবস্থা করেছে। আমাদের মোয়াল্লিমের খোঁয়াড়ে যেতে হবে না। পরে জানতে পেরেছি মোয়াল্লিমকে কিছু নজরানা দিয়েই তারা এব্যবস্থা করেছে। বুঝলাম যেখানে বাঙালী সেখানেই দুর্নীতি, ধীরে ধীরে তা এদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মোয়াল্লিমের দফতর হতে এসে হুদা সাহেব একদিন বললেন, তোমার আলম সাহেবকে দেখলাম মোয়াল্লিমের অফিসে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। বুঝলাম তিনি আমাদের থেকে পৃথক ব্যবস্থায় থাকবার সংকল্পে এই ছিদ্দত পোহাচ্ছেন। তার নিজের লোকের অপেক্ষায় এই দুর্ভোগ। মিসেস আলম পার্শ্ববর্তী একটি দালানের তেতালায় একটি কক্ষে অন্যান্যদের সাথে একাকী অবস্থান করছেন জেনে দৌড়ে তাকে দেখতে, সম্ভব হলে নিয়ে আসতে গেলাম, কিন্তু পাইনি। পরের দিন হুদা সাহেব বলেছিলেন তোমার আলম সাহেবকে মোয়াল্লিমের দফতরে আর দেখছি না। তবে মালপত্রগুলো অযত্নে বারান্দায় পড়ে আছে। দুদিন পর হুদা সাহেবের সাথে যখন আমিও দফতরে যাই তখন আলম সাহেব বা তার মালামাল না দেখে বুঝতে পারলাম অনেক দুর্ভোগ পোহানোর পর তিনি বোধ হয় ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। পরে দেখা হলে আলম সাহেব বলেছিলেন তিনি নাক্কাসায় তার কন্যা জামাতার বোনের বাসায় উঠেছেন। সেখানে থাকা ও খাওয়ায় অত্যন্ত আরামে আছেন। তবে স্থানটি দূরে হওয়ায় প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে হেরেম শরীফে আসতে পারছেন না।

আমাদের বাসাটা মোয়াল্লিমের দফতর আর হেরেম শরীফের মাঝামাঝি মিছফলা কাঁচা বাজারের সন্নিকটে। হেরেম শরীফ হতে অর্দ্ধ মাইলের মত দূরে। কিন্তু আমাদের বাসার সন্নিকটে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে সম্প্রতি এক সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছে। ঐ সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়ে কোয়ার্টার মাইলের খুব বেশী হবে না। সুড়ঙ্গ পথটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং বেশ প্রশস্থ। মাথার উপর অর্দ্ধবৃত্তাকার ছাদ, তার নীচে মধ্যখানে গাড়ী চলাচলের জন্য প্রশস্থ পথ, দু'পাশে প্রশস্থ ফুটপাথ বা পায়ে হাঁটার রাস্তা। তার অনেকাংশ আবার রেলিং দিয়ে ঘেরা। মূল মিসফলা সড়ক ধরে যেতে হলে সূর্য কিরণের তীব্রতার ও গরমের প্রচণ্ডতায় বেসামাল হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই সুড়ঙ্গপথে চলাচল আরামদায়ক ও শান্তিময়। ভীড় নেই বলে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়। এই সুড়ঙ্গের মধ্যস্থানে এক পাশে নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক দু'টি টয়লেট ও অজুখানা আছে। সেখান থেকে 'ফারেখ' হয়ে আরও স্বচ্ছন্দে হেরমে গমন করা যায়। বাসার সম্মুখ থেকে মিসফলা রোডটি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে সামান্য একটু ব্যবধানে সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথ। এই পথে ঢুকে বের হবার পথটি হেরেম শরীফের বা'বে আবদুল আজিজ ফটকের ঠিক সম্মুখে। বর্তমান সৌদী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মালিক (বাদশা) আবদুল আজিজ ইব্নে সউদ এর নামানুসারে এই ফটকের নামকরণ। এটি হেরেম শরীফের

www.pathagar.com

অন্যতম প্রশস্ত প্রধান প্রবেশ পথ। অন্যান্য ফটকগুলিতে একটি মাত্র দরজা; কিন্তু এই ফটকে তিনটি শাহী দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। এই ফটকের সম্মুখে রাস্তার মধ্যখানে আইল্যান্ডে একটি উঁচু স্তম্ভের মাথায় প্রকান্ড এক ঘড়ি। চারদিকে চারটি ডায়াল, বিভিন্ন রকম সময় নির্দেশ করছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্যদেশে স্থানীয় সময় হিসেব করা হয় ঠিক মধ্যরাত্রে অর্থাৎ রাত্রি ১২টায় শূন্য ঘন্টা ধরে, আর মধ্যরাত্রির পর হতেই পরবর্তী দিন শুরু হয় এবং তদনুযায়ী তারিখ গণনা করা হয়। কিন্তু সউদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশে স্থানীয় সময় হিসেব করা হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথেই শূন্য ঘন্টা ধরে এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে পরবর্তী দিবস গণনা করা হয়। সূর্য ডুবে যখন এশা'র নামাজের সময় হয় তখন এখানের ঘড়িতে বাজে দেড়টা। তদনুযায়ী ফজরের আজান হবে দশটা বা সাড়ে দশটায়। এ'শার নামাজের সময় এই ঘড়ির একটি ডায়েলে কাঁটা দেড়টার ঘরে দেখে বুঝা গেল এই ডায়েল আরব দেশের স্থানীয় সময়ের সংকেত দিচ্ছে। এই সময় অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আরেকটি ডায়ালে দেখলাম সন্ধ্যা ৭টায় মগরীব, ৮টায় এশা, সাড়ে ৩টায় তাহাজ্জদের আজান দেয়া হয়। এটার সাথে মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশের সময়ের সাথে মিল। আমাদের হাতের ঘড়ির কাঁটা সেই ভাবে ঘুরিয়ে আমরা সময় ঠিক করে নিয়ে তদনুযায়ী সময় অনুসরণ করেছি। অনারব অন্যান্য এশিয়ান দেশ সমূহের হাজী সাহেবেরা ও কমবেশী এই ডায়ালের সময় সংকেত অনুসরণ করে থাকেন। আরেকটি ডায়েলে গ্রীনিচ টাইম। তারপরের ডায়ালটি আফ্রিকান দেশের সময় সংকেত দিচ্ছে। আফ্রিকার হাজী সাহেবরা সেই ডায়ালের সময় সংকেত অনুসরণ করেন। অর্থাৎ একটি ঘড়ি একই সাথে চার রকমের সময় সংকেত দিচ্ছে। ঘড়ির স্তম্ভের একই সারিতে অনতিদূরে আর একটি খাটো স্তম্ভের উপর দু'দিকে দো'পাতা মেলে স্থির ভাবে রক্ষিত বিরাট এক ধাতব পদার্থের কোরাণ শরীফ। দুদিকের পাতার উপর কোরাণের আয়াত বড় বড় অক্ষরে খোদিত। তারই উপরে স্তম্ভের মাথায় একটি বৃহৎ আকারের দাড়ি পাল্লা ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনেছি সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দন্ড এই ধাতব নির্মিত উন্মুক্ত কোরাণের সম্মুখে মানদন্ডের নীচে জুমার নামাজের পর কার্যকর করা হয়।

আমরা যে বাসায় উঠলাম বাসাটি বেশ ফাঁকা। দোতলায় আমাদের কক্ষটি ছাড়া অন্যান্য কক্ষগুলি খালি। অনুরূপ ভাবে তেতলার একটি কক্ষে জাহাঙ্গীরের চাচা, ফটিকছড়ির হালে চন্দনপুরার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, আবদুল হাদী মাষ্টার এবং রেয়াজুদ্দিন বাজারের নাদেরুজ্জমান সওদাগর সস্ত্রীক আমাদের আগে থেকেই অবস্থান করে আসছেন। এই তলার অন্যান্য কক্ষগুলিও খালি। জাহাঙ্গীর ও তার কয়েকজন বন্ধু মিলে এই ঘরটি হজ্ব মওসুমে হাজীদের নিকট লাগিয়ত করে মুনাফার উদ্দেশ্যে মূল মালিক থেকে নিয়ে রেখেছিল। জাহাঙ্গীর তার ভাই আলমগীরকে নিয়ে ছাদের উপরে তেরপাল টাঙিয়ে অবস্থান করছিল। উদ্দেশ্য নীচের সবকটি কক্ষ হাজীদের কাছে ভাড়া দেয়া। কক্ষগুলি খালি পেয়ে আমরা বেশ

www.pathagar.com

আরামে বাস করতে লাগলাম। ব্যবসায়ে কিন্তু জাহাংগীরদের লোকসান হবে ভেবে দুঃখবোধ হল। তবে হজ্বের কয়েকদিন আগে দেখলাম সবকটি কক্ষে হাজী এসে ভরে গেছে। আমাদের পাশের কক্ষে দেখলাম বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত চিত্রতারকা রাজ্জাক এসে উঠেছেন। আরেকটি কক্ষে পি,জি,হাসপাতালের জনৈক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সস্ত্রীক – নামটা এমুহূর্তে মনে পড়ছে না। উপরে আরেকটি কক্ষে কয়েকজন মিশরীয় হাজী এসে উঠেছেন। এরকম অবস্থায় আমরা উপরে তিন তলায় আবদুল হাদী মাষ্টারদের কক্ষে চলে গেলাম। নীচের কক্ষটি ভাড়া দিবার জন্য জাহাঙ্গীরদেরকে ছেড়ে দিলাম। মীনা যাবার আগ পর্যন্ত এই কক্ষটিকে পর্দ্দা দিয়ে দু'ভাগ করে আমি হুদা সাহেব, আবদুল হাদী মাষ্টার ও নাদেরুজ্জমান সওদাগর আমরা ৪ জন ও ৪ জনের স্ত্রী মোট ৮জন একসাথে ছিলাম। মীনা থেকে ফিরে আসার পর অন্যান্য হাজীরা চলে গেলে কক্ষ খালি হয়ে যাওয়ায় আবার ভিন্ন রুমে চলে গেলাম। চিত্র তারকা রাজ্জাককে দেখেছি অত্যন্ত সদালাপী ও মিশুক। তিনি নিজে থেকেই সালাম করে আলাপ জমাতে আগ্রহী। জানতে পারলাম এটি তাঁর তৃতীয় দফা হজ্বে আগমন। সস্ত্রীক কেন এলেন না জিজ্ঞেস করাতে বললেন মেয়ে নাকি কলেজে পড়ে। তার দেখা শুনার প্রয়োজন, তদুপরি স্ত্রীর বয়স ভারী হয়নি বলে এখন আসতে চায় না। বাংলাদেশ হজ্ব মিশনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ দেখেছি। মিনাতে হজ মিশনের গাড়ীতে তাঁকে চলাফেরা করতেও দেখেছি। মিশরীয় হাজীগণকে দেখেছি তাঁরা ও অত্যন্ত সদালাপী। দেখা মাত্রই সালাম করেন, কুশল জিজ্ঞাসা করেন। আলাপ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে ভাষার কারণে এদের সাথে জমিয়ে আলাপ করা সম্ভব হয়নি। যাক জাহাঙ্গীরদের দু'পয়সা আয় হবে ভেবে স্বস্তিবোধ করলাম। জাহাঙ্গীর সুশিক্ষিত এক যুবক। এম, এ, পাশ করেছে। কথা বলে কম, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, কাজে তরিৎকর্মা। চাচা চাচী ও শ্বশুর শাশুরীর খেদমতে নিবেদিত প্রাণ। ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর উইনিয়নের ফতেপুর গ্রামের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আবদুল লতিপ মাষ্টারের ছেলে। তার পিতা বিস্তর ভূ সম্পত্তির অধিকারী একজন সামন্ত প্রভু। আজীবন সৎ জীবনযাপন করেছেন বলে দেশে তাঁর খ্যাতি আছে। ভূ–সম্পত্তির আয় ব্যতীত অন্য কোন আয়ের উৎস না থাকায় সম্ভবতঃ পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াবার লক্ষ্যে তৎপুত্র জাহাংগীর সুদূর আরবদেশে পাড়ি জমিয়েছে এবং একই উদ্দেশ্যে তাকে অনুসরণ করেছে তদ অনুজ আলমগীর। একদিন দুজনকে বলেছিলাম জাহাংগীর আর আলমগীর অর্থ এক। জাহান ফার্সী আর আলম আরবী শব্দ এই যা পার্থক্য। সুতরাং এদুটি দুজনের নাম হতে পারেনা। জাহাঙ্গীর জবাবে বলেছিল "আমাদের আরও একভাই অওরঙ্গজেব আছে"। ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তোমরা মোগল বংশের সার্থক উত্তর পুরুষ – এখান থেকে ফিরে গিয়ে দিল্লীতে আস্তানা গাড়বে। মক্কায় এসে কাঁচা বাজারের ভার পড়ল আমার উপর। মাঝে মাঝে হুদা সাহেব শুদ্ধ দুজনেই যেতাম। এখানে সকল রকম তরিতরকারী যথা বেগুন, টকবেগুন, সীম, আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ময় ধন্যাপাতা, পুদিনা পাতা, লাউ, শসা, সব তরতাজা পাওয়া যায়। প্রতি কিলো মানে কেজি ৪ থেকে ৫ রিয়াল দাম। মাছের দোকানে দেখেছি হরেকরকম সামুদ্রিক মাছ, ময় ক্ষুদ্রাকৃতির চিংড়ী। তবে মিঠা পানির সাদা মাছ চোখে পড়েনি। মদিনার তিক্ত

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতার দরুণ মাছের দোকানের ধারে ও আর যাইনি। গোশতের দোকানে খাশী, দুম্বা, গরু, উট ইত্যাদি সবজাতীয় গোশত পাওয়া যায়। দাম ১৬ রিয়াল থেকে ২৪ রিয়াল। কিন্তু সব চেয়ে সস্তা পাওয়া যায় মুরগী। পাঁচ পোয়া থেকে দেড় সের ওজনের একটি জীবন্ত মুরগীর দাম পাঁচ রিয়াল। জবেহ করে মেশিনে ছিলে পরিস্কার করে দিলে আরো এক রিয়াল, কিন্তু হাতে ছিলে পরিস্কার করে দিলে ২ রিয়াল দিতে হয়। তাই আমরা প্রায় সময় মুরগীই খেয়েছি বেশী, সাথে তরিতরকারী ত আছেই। ফার্মের এই মুরগী গুলি বেশ চর্বিদার ও মাংসলো, খেতে ও সুস্বাদু। ফলের মধ্যে আপেল, আঙ্গুর, কলা, আনার, বেদানা, মোসাম্বী, তী–ন জায়তুন ও আনজীর এবং অন্যান্য দেশী বিদেশী ফল ইত্যাদি প্রচুর পাওয়া যায়। আমি আপেল আর হুদা সাহেব মুসাম্বী পছন্দ করতেন বেশী। বুলবুলের পছন্দ ছিল আঙ্গুর। ৪থেকে ৫ রিয়ালের মধ্যে আপেল, মোসাম্বী ও ৮ থেকে ১০ রিয়াল কিলো দামে আঙ্গুর বেচা কেনা হয়। এই ফলগুলো বিদেশ থেকে আমদানীকৃত। কলার গায়ে গোলাকার রঙীন, সুন্দর, ছোট ছাপানো ট্রেড মার্কের ছবি লাগানো দেখে হুদা সাহেবকে দেখিয়ে বললাম দেখুন এই কলা এসেছে সুদূর গুয়াতেমালা থেকে। মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালা থেকে কলা আমদানী করা হয়েছে, একথা হুদা সাহেব বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কলার গাত্রে আটা দিয়ে লাগানো ছবিতে নামাংকন দেখে একিন করলেন।

কৃষিক্ষেত্রে সৌদি আরব বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমানে মৌলিক খাদ্য চাহিদার অনেক গুলোতে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। এই সেদিন ও আরব উপদ্বীপ ছিল একটি অনুর্বর, ধূসর, বালুকাময় মরুভূমি। কৃষিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইতিপূর্বে মরূদ্যান ও উপত্যাকায় স্বল্প সংখ্যক লোক বিচ্ছিন্ন ভাবে সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করত। বৃষ্টি ও ভূগর্ভ থেকে প্রাচীন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনের উপর এই চাষাবাদ নির্ভরশীল ছিল। ফলে সৌদী আরব খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণ রূপে পরদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকারী প্রচেষ্টায় কৃষিকে আধুনিকায়ন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। পানির লবণ বিমুক্ত করণের প্লান্ট বসানো হয়েছে। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। চাষীদেরকে সুদমুক্ত ঋণ ও ভর্তূকী এবং আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে সৌদী আরব খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। ১৯৭৫ সনে যেখানে চাহিদার তুলনায় অতি নগণ্য পরিমাণ গম উৎপাদন হতো, (৩০০০ টনের ও কম) সেখানে ১৯৮৬ সালে ২০ লাখ টন গম উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৮৬ ইং সনে সউদী সরকার বাংলাদেশকে দশ হাজার ম্যাট্রিক টন গম খয়রাতি সাহায্য ও প্রদান করেছেন। ১৯৮৫ সনে রেকর্ড পরিমাণ গম উৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সৌদী আরবকে পুরস্কৃত করেছে। আবার কৃষকদের উৎসাহ দানের জন্য সরকার উচ্চ মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে এসব গম খরিদ করে বিদেশে রপ্তানী করে। বর্তমানে সৌদী আরবে ব্যাপকহারে গম, খেজুর, সব্জি, ফল ও দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপাদিত হয়। ১৯৭৫ সালে খেজুরের মোট উৎপাদন ছিল ২ লাখ টন। ১৯৮৫ সালে

www.pathagar.com

তা ৫ লাখ টনে গিয়ে পৌছায়। ফলে প্রতিবেশী দেশ সমূহে সৌদী আরব বর্তমানে খেজুর রপ্তানী করে এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বিপুল পরিমাণ খেজুর দান ও করে। সব্জি ও তাজাফল কিছু কিছু আমদানী করলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে।

কাঁচা বাজারে কেবলমাত্র মুরগী সস্তা দেখেছি তা নয়, মুরগীর ডিম দেখেছি আর ও সস্তা, এক রিয়ালে ৪টি। অথচ এই এক দশক আগে ও এখানে ডিম ও মুরগীর ঘাটতি ছিল। দাম ও ছিল চড়া। রাতের শেষভাগে দেখেছি ফার্ম থেকে গাড়ী ভর্তি করে এনে এই বাজারে মুরগী আর মুরগীর ডিম সরবরাহ দিয়ে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পউলট্রি ফার্মে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ ডিম ও মুরগী উৎপাদিত হয়ে থাকে। দই খাওয়া এদেশে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আরবীতে দইকে লবান বলে। এদেশের ডেইরী ফার্মে উৎপাদিত এই লবান অত্যন্ত সুস্বাদু। হুদা সাহেব এই লবানের স্বাদ পেয়ে যেখানে যান হন্যে হয়ে শুধু লবানের খোঁজ করতেন। টিনজাত দুধ ও দুগ্ধজাত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে সৌদী আরব বর্তমানে স্বনির্ভর বলে বলা হয়েছে। মাংস উৎপাদনের বেলায় ও প্রচুর অগ্রগতি দেখা যায়। মৎস্য আহরণের জন্য সরকারী উদ্যোগে মৎস্য কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নিজস্ব বাহনের মাধ্যমে এই কোম্পানী সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ করে বাজারে সরবরাহ করে। শুনা যায় জর্দান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সৌদী আরব মৎস্য রপ্তানী ও করে। সে যাক কিছুদিন আগে ও যেদেশ খাদ্যদ্রব্যে সম্পূর্ণ রূপে পরনির্ভরশীল ছিল, সেই মরুময় দেশের কৃষিক্ষেত্রে, ডেইরী, পউলট্রি ইত্যাদিতে এই অগ্রগতি সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

হজ্বের নির্দ্দিষ্ট তারিখের প্রায় ১০/১২ দিন পূর্বে আমরা মক্কায় পৌছি। সুতরাং মীনাযাত্রার নির্ধারিত তারিখের প্রতীক্ষায় হেরেম শরীফে নিয়মিত নামাজ আদায় ছাড়া এ সময়ে মক্কায় আমাদের অন্য কোন কাজ ছিল না। একদিন বেলা ১০/১১ টার সময় আমি বাসায় বসে আছি হুদা সাহেব বাহির থেকে এসে বললেন "সোবহান তুমি আজকে একটা মারাত্মক জিনিষ মিচ করেছো"। ঐদিন সকালে প্রথানুযায়ী কাবাগৃহের গোসল দেয়া হয়। হুদা সাহেব সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন। সকাল নয়টায় কাবার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করা হয়। ঢুকতে না পারলে ও কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তিনি অভ্যন্তর ভাগ স্বচক্ষে দেখেছেন। কাবার গিলাপ বদলিয়ে দেয়া হয়। অকপটে স্বীকার করে বললাম, আপনি সত্যিই সৌভাগ্যবান। দুর্ভাগ্য আমার একার নয়, বাকী ৩ জনেরও। এহেন দুর্লভ মুহূর্তে আমরা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারিনি বলে দুঃখের অবধি রইল না। ব্যাপারটা আগে থেকে জানা ছিলনা। জানা থাকলে কোন অবস্থাতেই এহেন দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। মুস্কিল হল যে এখানে সংবাদ পত্রের কোন হদীস দেখিনি। তাই কোথায় কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে জানবার বা আগে বাগে এত্তেলা পাবার কোন সুযোগ পাইনি। পরে জেদ্দায় রসীদ সাহেবের বাসায় সউদী আরবের শীর্ষ স্থানীয় ইংরেজী দৈনিক সউদী গেজেট দেখেছি ও পড়েছি। কিন্তু গোটা সফরকালে মক্কা ও মদিনায় কোথায় ও কারো হাতে, কোন দোকানে বা কোন হকারের কাছে কোন রূপ সংবাদ পত্র দেখিনি।

www.pathagar.com

তাই মনে হয় এখানে সরকারী তত্ত্বাবধানে সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও প্রচার সংখ্যা নগণ্য। হুদা সাহেব ও যে জেনে শুনে গিয়েছিলেন তা নয়। এমনিতেই তাওয়াফ করা, কাজা নামাজ পড়া এবং হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার সুযোগ নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে ঘটনা চক্রে এহেন পবিত্রতম দৃশ্য অবলোকন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কাবা গৃহের অভ্যন্তর শাবান ও জিলহজ্ব মাসে বৎসরে দু'বার সুবাসিত গোলাপ পানি দ্বারা আনুষ্ঠানিকতা সহকারে ধৌত করা হয়। এই ধৌত অনুষ্ঠানকে 'কাবার গোসল' বলা হয়। খাদেমে হারামাইনে শরীফাইন অর্থাৎ মদিনার মসজিদে নববী এবং মক্কায় পবিত্র মসজিদে হারাম শরীফের সেবক আল-মালিক আল-মোয়াজ্জম বাদ্‌শাহ্ ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজ এই পবিত্র অনুষ্ঠানে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এ বৎসর তিনি আসতে না পারায় মক্কার গর্ভণর যুবরাজ মাজেদ বিন আবদুল আজিজ একাজ সমাধা করেন। এ সময়ে মুসলিম দেশের রাষ্টদূত ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কূটনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ ও উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে উপস্থিত থাকতে না পেরে মনে মনে সত্যি দুঃখিত হয়েছি এবং যথেষ্ট আফসোস করেছি।

কাবার গিলাফ

জোহরের নামাজের সময় প্রবেশ করে দেখি ইতিপূর্বেকার মলিন হয়ে যাওয়া গিলাফটির পরিবর্তে নতুন একটি উজ্জ্বল কালো রঙের গিলাফ কাবাগৃহকে আচ্ছাদন করে প্রখর রৌদ্রকিরণে চিক্‌চিক্ করছে। উপরিভাগে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষুদিত কোরানের বাণী ঝলমল করছে। হেরেম শরীফে প্রবেশ করে কাবার দিকে তাকালে এই গিলাফ সর্বপ্রথম নজরে পড়ে। বিস্ময়কর এই গিলাফের প্রভাব। এই গিলাফ দেখামাত্রই হজ্বযাত্রীদের মনে ভয়, ভক্তি ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয়। এই গিলাফ 'কিশ্‌ওয়া' নামে পরিচিত। এই কিশওয়ার রয়েছে ঝৌলুসপূর্ণ সুদীর্ঘ ইতিহাস। সর্বপ্রথম কখন থেকে কাবাকে গিলাফ দ্বারা আচ্ছাদন করার রেওয়াজ প্রচলন হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ পাক ইব্রাহিম (আঃ) কে কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কিশওয়া নির্মাণের নির্দেশ ছিল না। হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং তৎপর কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলে থাকেন সর্বপ্রথম হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং তৎপর হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পূর্ব পুরুষ আদনান বিন-আদ এই কিশওয়া নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তার স্বপক্ষে তেমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে ইয়ামেনের বাদশাহ তুব্বাই হিমাইর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সর্বপ্রথম শুকনো খেজুর পাতাদিয়ে কিশওয়া তৈরী করে কাবাগৃহ আচ্ছাদিত করেন। ইহাই সর্বপ্রথম গিলাফ বলে ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। কোন কোন রেওয়াতে এমন ও দেখা যায় যে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বিদায় হজ্বের সময় পবিত্র কাবাকে বর্তমান পন্থায় রেশমী কাপড়ে সর্বপ্রথম গিলাফ পরিধান করান। অতঃপর হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) কিয়াত কাপড়ের গিলাফ নির্মাণ করাইয়া পরিধান করান। দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ত্রয়োদশ হিজরীতে যে কিশওয়া নির্মাণ করান উহাকে ইয়ামেনী কিশওয়া নামে অভিহিত করা হয়। গাবাতি নামক এক প্রকার শক্ত কাপড়ে এই

www.pathagar.com

কিশওয়া তৈরী হত এবং পরবর্তী হজ্বের সময় হাজীদের মধ্যে টুকরা টুকরা করে পুরানো কিশওয়াটি বিলি করে দেয়া হত। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) এর আমলে বৎসরে দুবার কাবাগৃহের কিশ্ওয়া পাল্টানো হত। একবার ঈদুল আজহার দিন, দ্বিতীয় বার রমজান মাসে শবে কদরের দিন। খলিফা মুয়াবিয়া ও হযরত ওসমানকে অনুসরণ করে বৎসরে দুবার কাবাগৃহের কিশওয়া পাল্টাতেন। একদা কিশওয়া পরিবর্তন না করা রীতি হয়ে গিয়েছিল। নতুন কিশওয়াখানা পুরানোটির উপর বিছিয়ে দেয়া হতো। একটির উপর একটি বছর বছর বিছিয়ে দেয়া কিশওয়া সমূহ কাবাগৃহের উপর এমন স্তুপ হয়ে গেল যাতে কাবাগৃহের কাঠামো নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিল। হিজরী ১৬০ সনে আব্বাসীয় খলিফা আল-মাহ্দী হজ্ব করতে আসলে এই দৃশ্য তাঁর নজরে পড়ে। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ জারী করলেন যে, কেবল একটি মাত্র কিশওয়া দিয়ে পবিত্র কাবাগৃহ আচ্ছাদন করতে হবে। তদবধি যুগ যুগ ধরে এ নিয়মই চলে আসছে।

যুগে যুগে এই কিশওয়ার রঙের ও পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে খলিফা আল-মামুন লাল রঙের কিশওয়া দিয়ে বায়তুল্লা শরীফকে আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি তা বছরে তিন বার পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। হিজরী ষষ্ট শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্রুসেড বীর গাজী সালাউদ্দিন কিশওয়ার রং সবুজে পরিবর্তন করেন। আব্বাসীয় খলিফা আল-নাসির ইহার রং বদল করে কালো করার নির্দেশ দেন। সেই হতে আজ অবধি কালো রংই চলে আসছে।

বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আজীজ ইব্নে আবদুর রহমান আল-সউদ ১৯৩২ ইং সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর আধুনিক সৌদী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। তৎপর হতে উভয় হেরেম শরীফের নানাবিধ উন্নয়নে এবং হাজীদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, যা হাজীদের খালি চোখে নজরে পড়ে। ইতিপূর্বে ইসলামের প্রথম যুগ হতে রাজা, বাদশা, খলিফা, দানশীল মুসলিম ও ধনী ব্যক্তিদের চাঁদার দ্বারা মসজিদুল হারাম ও তার চতুর্দিকের উন্নয়ন কাজ চলত। হিজরী ৭৪৩ সনে মিশরের সুলতান আল-মালিক আল-সালেহ ইস্মাইল গালাউন কিশওয়া ও কাবা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর দেশে তিনটি গ্রামের কৃষি আয়কে ওয়াকফ করে দেন। তুরস্কের সুলতান সোলায়মান সাতখানা গ্রামের আয় ওয়াক্ফ্ করে দেন।

ইতিপূর্বে যুগ যুগ ধরে মিশরই ছিল কিশওয়ার সরবরাহকারী। কমপক্ষে ১৫টি উটের পিঠে করে গিলাফের বিভিন্ন অংশ মক্কায় আনায়ন করা হত। আবার ঐ উটগুলি অশ্বারোহী প্রহরী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত পরিবারের সদস্যগণ কিশওয়াবাহী উটের বহরের সাথে আসার দায়িত্ব পেতো। ইহাতে তা'রা নিজেদেরকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত ও সম্মানিত মনে করত। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝিতে মিশর ও সৌদী আরবের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ সৃষ্টি হলে সৌদী আরব মিশর হতে কিশওয়া আমদানী বন্ধ করে দেয় এবং নিজেদের উদ্যোগে কিশওয়া প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে মক্কায় এক কারখানা স্থাপন করেন। ভারতবর্ষ হতে

www.pathagar.com

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষকারিগর আনায়ন করে কিশওয়া প্রস্তুত করে কাবাগৃহ আচ্ছাদন করতে লাগলেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মতানৈক্য দূরীভূত হলে মিশর পুনরায় গিলাফ পাঠাতে শুরু করে। কিছুদিন পর এই গিলাফ আবার রাজনীতির শিকার হলে ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে পাকিস্তান হতে একখানা কিশওয়া সরবরাহ করা হয়। ঐ গিলাফ সরবরাহ করতে পেরে তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করেন এবং ফলাও করে সারা দেশে তা প্রচার করেন। বিভিন্ন সিনেমা হলে নিয়মিত শো'র পূর্বে ঐ গিলাফের প্রদর্শনী দেখিয়ে দেশের ধর্মভীরু জনগণের ভাবাবেগে খুতখুতি দিয়ে জনপ্রিয়তা হাসিলের চেষ্টা করেন। কিন্তু আয়ুব শাহীর দুর্ভাগ্য, আরব দেশের তীর্যক রোদের তীব্র তেজ সহ্য করতে না পেরে গিলাফের রং কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্যাকাশে হয়ে গেলে সমগ্র আরব জজিরায় পাকিস্তানের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। এখনো মনে পড়ে যেদিন এ খবর পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেদিন লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী বৎসরে ভারতের সরবরাহকৃত গিলাফটি ও একই ভাগ্য বরণ করলে বাদশাহ ইবনে সউদ মক্কার কারখানায় দক্ষ কারিগর এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পুনঃ উৎপাদন শুরু করার নির্দেশ দেন। তদবধি মক্কায় নির্মিত কারখানায় প্রস্তুত গিলাফই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মক্কার এই কারখানায় ১৯৬২ সন হতে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ানো হয়। বর্তমানে এই কারখানায় ২৪০ জন দক্ষ কারিগর ও কারু শিল্পী আছেন। সৌদিরা সাধারণত কর্মবিমুখ হলে ও এই কারখানার শ্রমিকেরা প্রায় সকলেই সৌদি। তাদের সাথে আরো আছেন হস্তলিপি বিদ্যা বিশারদ। এই কারখানায় বিশেষ উন্নত ধরনের জায়নামাজ ও নির্মাণ করা হয়। এগুলি সাধারণতঃ রাজকীয় মসজিদে ব্যবহার করা হয়। শুকুরের লোম ব্যবহার এড়ানোর জন্য অপ্রক্রিয়াজাত জন্তুর লোম আমদানী করা হয়। মক্কার এই কারখানায় বৎসরে একটি মাত্র গিলাফ বা কিশওয়া তৈরী করা যায়। এই গিলাফ তৈরীতে এক কোটি ৭০ লাখ রিয়াল অর্থাৎ বাংলাদেশী প্রায় ১৫ পনর কোটি টাকা ব্যয় হয়। সম্পূর্ণ সাদা খাটি রেশম দিয়ে ৪৭ খণ্ডে পৃথক পৃথক ভাবে কিশওয়াখানা তৈরী হয়। প্রত্যেক টুকরা দৈর্ঘ্যে ৪৬ ফুট, প্রস্থে ৩ ফুট ২ ইঞ্চি। পরে উৎকৃষ্টমানের কালো রং ও রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ইহা রঞ্জিত করা হয়। ফলে ইহা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও মসৃন হয়। উপরের দিকে সোনালী রঙের যে ফিতাখানা দেখা যায় ইহা লম্বায় ৪৫ গজ প্রস্থে ৩ ফুট ২ ইঞ্চি এবং ১৬ ভাগে বিভক্ত। অত্যন্ত সুনিপুণ সূচি কর্মদ্বারা ইহাতে সু'রা এখলাস এবং ফিতার নীচে চতুর্দিকে বেষ্টিত পবিত্র কোরান মজীদের ১৬টি আয়াত লিপিবদ্ধ আছে। কালো রেশমের উপর স্বর্ণ ও রূপার সুতা দ্বারা ঐ আয়াত গুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সোনা ও রূপা ব্যবহারের অনুপাত ১ঃ৪। স্বর্ণ ও রৌপ্য বিভাজিত এই সব আরবী অক্ষরগুলো সূচীকর্মের মাধ্যমে হস্তদ্বারা নির্মিত এবং এগুলি শেষ করতে কমপক্ষে এক বৎসর লেগে যায়। সুনিপুণ সূচিকর্মের মাধ্যমে হস্তনির্মিত এই কিশওয়া ইসলামী শিল্পকলার ও কারুশিল্পের একটি অনন্য নির্দশন। এই কিশওয়ার অনুকরণে ঢাকার বায়তুল মোকারম মসজিদের বহির্ভাগ রচিত হয়।

www.pathagar.com

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী আলসাহ্‌বী গোষ্টীর সর্দার হলেন পবিত্র কাবা ঘরের রক্ষক এবং তাঁরই কাছে কাবাগৃহের চাবি সংরক্ষিত থাকে। প্রতি বৎসর হজ্জের কিছু দিন পূর্বে প্রথা অনুযায়ী ধর্মীয় মন্ত্রী কাবার রক্ষকের নিকট কিশওয়াখানা হস্তান্তর করেন এবং গোসল দেওয়ার পর নতুন কিশওয়াটি পরিধান করে দেয়া হয়। এই গিলাফ পরিধান করানো কোন ধর্মীয় বিধান নহে। কাবার সম্মানের জন্য এই বহিরাবরণ পরিধান করানো হয়। সুতরাং কাবার প্রতিটি ধূলিকনার মত এই গিলাফ বা কিশওয়া খানি ও বিশ্ব মুসলিমের নিকট অতি পূতঃ পবিত্র।

শুনা যায় ইতিপূর্বে খাদেমগণ গিলাফের টুকরা বিক্রি করে দু'পয়সা রোজগার করতেন। হাজীরা শ্রদ্ধাভরে সেই টুকরা দেশে এনে নানাভাবে তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। সৌদী সরকার ইহাকে ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী মনে করে ও শিরিক সৃষ্টির আশংকায় গিলাফের টুকরা বিক্রি বন্ধ করে দেন। কাবা ঘরের অভ্যন্তরে ও অনুরূপ একখানা রেশমী বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত বলে শুনেছি এবং ইহা ভিতরের দিকের ছাদকে সম্পূর্ণ রূপে ঢেকে রাখে। কিন্তু সেটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

কাবা শরীফ

কালো রেশমী গিলাফ বা কিশওয়া পরিহিত সুউচ্চ চতুষ্কোণ এই গৃহটিকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইহার এক নাম খানায়ে কাবা, আর এক নাম বায়তুল্লাহ। আবার কোরানে মজীদে ইহাকে 'মসজিদুল হারাম' বলে ও উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী কা'বা শব্দের মা'আদ্দা বা মূল হচ্ছে কা'আবুল অর্থাৎ উঁচু হওয়া, এবং তকীবুল শব্দের অর্থ হচ্ছে চারিকোণ বিশিষ্ট হওয়া। এই গৃহ বেশ উঁচু ও চারিকোণ বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে কা'বা নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই গৃহ পৃথিবীতে সৃষ্ট সর্ব প্রথম বা আদি গৃহ বলে ও ইহাকে কা'বা নামে অভিহিত করা হয়। হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের পর এবাদতের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। তদনুযায়ী ৪র্থ আসমানে ফেরেশতাদের এবাদতগাহ, বায়তুল মা'মুরের নক্‌শা অনুযায়ী পৃথিবীর এই আদি গৃহ নির্মিত হয়। প্রথম নির্মাণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। কাহারো কাহারো মতে আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতাগণ এই গৃহ নির্মাণ করেন। অন্য রেওয়ায়েত মতে হযরত আদম (আঃ) এর পুত্র হযরত শীস (আঃ) এই ঘর তৈয়ার করেন। ভিন্ন মতে ফেরেশতাগণ বায়তুল মামুরের অনুকরণে কাবা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করলে, হযরত আদম (আঃ) পুত্রগণকে নিয়ে সর্বপ্রথম কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। তবে এই বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকগণ একমত যে কাবা শরীফ বায়তুল মামুরের অনুকরণে হযরত আদম (আঃ) এর এবাদতের জন্য তাঁরই জমানায় নির্মিত হয় এবং ইহাই ভূ-পৃষ্টে সর্ব প্রথম নির্মিত গৃহ বলে পবিত্র কোরানের আয়াত দ্বারা সাবেত আছে। সুরা আল ইমরানে আল্লাহ পাক বলেন- "নিশ্চয়ই মানবকুলের এবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা মক্কাতেই অবস্থিত। উহা সৌভাগ্যযুক্ত ও জগত সমূহের পথ প্রদর্শক"।

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট কোন ঘরে বা স্থানে অবস্থান করেন না। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্বদা বিরাজিত। আল্লাহর এবাদতের জন্য আল্লাহর নির্দেশে তৈরী বলে ইহাকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়। তাই এই গৃহই সমগ্র মুসলিম জাতির কেবলা এবং এবাদতের কেন্দ্র বিন্দু। এই গৃহকে আবার মসজিদুল হারাম বলে ও উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এখানে এই হেরেম শরীফের সীমার মধ্যে সকল প্রকার রক্তপাত, ঝগড়া, বিবাদ, খুন খারাবী, জীবজন্তু শিকার করা এমন কি তৃণতরুলতা ইত্যাদি ছেড়া ও নিষেধ। সকল প্রকার অন্যায় ও গর্হিত কাজ এই হেরেম শরীফের সীমার মধ্যে করা হারাম। এখানে যে প্রবেশ করে তাকে সকল প্রকার নিরাপত্তা দান করা হয়েছে।

বর্তমানে আমরা কাবাগৃহের যে রূপ দেখছি আদিকাল হতে কিন্তু এরূপ ছিল না। যুগে যুগে রূপান্তর এবং সংস্কার সাধনের পর কা'বা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

এই কাবাগৃহের উপর যুগে যুগে অনেক আক্রমণ, অত্যাচার, ঝড়, ঝঞ্জাও বয়ে গেছে। অনেক প্লাবনের পানি গড়িয়ে গেছে এই কাবার উপর দিয়ে। এসব সহ্য করে সকল নিপীড়ন বক্ষে ধারণ করে আল্লাহর গৃহ এখনো অক্ষুন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সকল মহীমা, মর্যাদা, গৌরব এবং ইতিহাস নিয়ে। আদম (আঃ) নির্মিত কাবাগৃহ হযরত নূহ (আঃ) এর জমানায় অনুষ্ঠিত মহা প্লাবনে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবে মাটির অভ্যন্তরে তার ভিত্তি অক্ষুন্ন থেকে যায় এবং কালক্রমে তা মাটি চাপা পড়ে যায়। আজ হতে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৎপুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) এর সহযোগিতায় আল্লাহর হুকুম প্রাপ্ত হয়ে হযরত আদম (আঃ) এর নির্মিত ভিত্তির উপরে কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণ করেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পাথরের উপর পাথর স্থাপন করে কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। পাথরগুলি পরস্পর জোড়া লাগাবার জন্য কোনরূপ মসল্লা বা চুনসূরকী ব্যবহার করেন নাই। তিনি পাথরের কোনরূপ সাইজ করেন নি। যেভাবে পাথর কুড়িয়ে পেয়েছেন সেভাবেই একটির উপর একটি বসিয়ে দিয়ে মূল ইমারত নির্মাণ করেন। হযরত ইব্রাহিমের নির্মিত কাবাগৃহের কোন ছাদ ছিল না। তিনি কাবাগৃহে দুটি দরজা রাখেন এবং দরজা গুলি ছিল খোলা, কপাট বিহীন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) একখানা ক্ষুদ্রাকৃতির অলৌকিক পাথরের উপর দাঁড়িয়ে এই কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এই পাথরটি হযরত ইব্রাহিমের মোজেজার একটি সমুজ্জল নিদর্শন। কাবা নির্মাণ কালে হযরত ইব্রাহিমকে নিয়ে প্রয়োজন বোধে এই পাথর আপনা আপনি উপরে নীচে উঠানামা করত। এই পাথরটির নাম 'মোকামে ইব্রাহিম'। পাথরটি এখনো হেরেম শরীফের চত্বরে সুরক্ষিত আছে। কাবাগৃহ নির্মাণ শেষ হলে হযরত ইব্রাহিম এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বেশ উঁচুতে উঠে সমগ্র জীব জন্তু ও মানব কুলকে বায়তুল্লাহ্য় হজ্বের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। যারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর হজ্বের এই ডাকের জবাবে "লব্বা ইকা" বলে জবাব দিয়েছিলেন তাদেরই অদৃষ্টে হজ্ব নসীব হয় বলে বর্ণিত আছে এবং যে যতবার সাড়া দিয়েছিলেন সে ততবার হজ্ব করেন বলে ও কথিত আছে।

www.pathagar.com

আরব দেশ মরুরদেশ। বৃষ্টিপাত তেমন হয়না বললে ও চলে। কিন্তু মাঝে মধ্যে একটু অতি বৃষ্টি হলেই সমগ্র মক্কা নগরী প্লাবিত হয়ে যেত। হযরত ইব্রাহিমের নির্মাণের পর বারবার এই কাবাগৃহ প্লাবনের শিকার হয় এবং নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আরবের দুরহাম ও আমলেকা গোত্র পরবর্তীকালে পর পর কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন এবং কালক্রমে তারা সেখানে মূর্তিপূজা আরম্ভ করে। ফলে হযরত ইব্রাহিমের নির্মিত পূতঃ পবিত্র এই কাবাগৃহ মূর্তি উপাসকদের দেবালয়ে পরিণত হয়। অতঃপর বনুখোজা গোত্র, আমলেকা গোত্রকে বিতারণ করে মক্কা ও কাবার শাসনভার গ্রহণ করে। তারা প্লাবনের হাত থেকে কাবাগৃহকে রক্ষার জন্য কাবা ও হাতীমের চারিদিকে কতেক গৃহ নির্মাণ করেন। কাবার চারিদিকে একটি বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণ করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীতে কোরাইশদের কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণের সময় পর্যন্ত বেষ্টনী দেয়াল অটুট ছিল। এই বেষ্টনী দেয়াল এবং কাবাগৃহের মধ্যবর্তী স্থানে সকলে তাওয়াফ করতেন।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর উর্দ্ধতন পূর্বপুরুষ কুশাই ইবনে কিলাব কোরাইশ দলপতি ছিলেন এবং মক্কা ও কাবাগৃহের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। তিনি আনুমানিক খৃষ্টীয় ৪৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে কাবাগৃহকে ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুনভাবে শক্ত ও মজবুত করে নির্মাণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম গাছের তক্তা ও বীম ব্যবহার করে কাবা গৃহের ছাদ নির্মাণ করেন। তিনি যে গাছের বীম ও তক্তার ছাদের প্রবর্তন করেন পরবর্তীকালে এমনকি আজ পর্যন্ত সেই বীম ও তক্তার ছাদ অক্ষুন্ন আছে। কখনো কখনো কাঠের পরিবর্তন হলেও এবং পরবর্তীতে ছাদ উত্তর দিকে সামান্য ঢালু করে পানি গড়িয়ে যাবার জন্য পয়নালা স্থাপন করা হলেও ছাদের মূল ধরন কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

কথিত আছে যে হযরত নবী করিম (দঃ) এর জন্মের পর জনৈক কোরাইশ মহিলা কয়লার আগুনে কাবাগৃহে ধূঁয়া দিবার সময় অসাবধানতা বশতঃ আগুনের শিখা কাবার গিলাফে লেগে যায়। ফলে গিলাফের আগুনে ছাদের তক্তাগুলি পুড়ে যায় এবং আগুনের তাপে দেয়ালের পাথর গুলি মুরমুরে হয়ে পড়ে। তৎপর এক বিরাট বন্যার পানিতে ডুবে যায়। ফলে দেয়ালে বিরাট আকারের ফাটল ধরে এবং কাবাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যাবার উপক্রম হয়। সুতরাং কোরায়শগণ কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সময়ে বাকুম রুমি নামক জনৈক গ্রীক নাবিকের একখানা জাহাজ সমুদ্রে ঝঞ্জায় বিধ্বস্ত হয়ে ভাসতে ভাসতে জেদ্দার উপকূলে আসে। কোরাইশ দলপতি আলী ইবনে মুগিরা এই সংবাদ পেয়ে জেদ্দায় গমন করেন এবং জাহাজের তক্তাগুলি ক্রয় করে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বাকুম রুমিকে ও মক্কায় নিয়ে আসেন। এই বাকুম রুমি একজন সুদক্ষ সূতার মিস্ত্রি ও ছিলেন।

এইভাবে কোরায়েশগণ সকল গোত্র মিলেমিশে কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ কাজের সময় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বয়স অল্প ছিল। তিনি স্বয়ং কাঁধে পাথর বহন করে এই নির্মাণকার্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্মাণ কাজের শেষের দিকে হযরত (দঃ) নিজ হস্তে কাবার দক্ষিণ পূর্ব কোণে হাজরে

www.pathagar.com

আসওয়াদ বা কালো পাথরটি সংস্থাপন করে কোরায়েশদের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা দমন করেন। আল্লাহর কি অপূর্ব মহীমা সকলের অজান্তে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর নবী পবিত্র কালো পাথরটি সংস্থাপন করেন। এই সময়ে কোরায়েশগণ কাবা গৃহের অভ্যন্তরে যাতে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে কাবার দরজা সমতল হতে সাড়ে ছয় ফুট উঁচু করেন। দরজায় কপাট লাগিয়ে তালা দেবার বন্দোবস্ত করলেন। যাতে করে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে কাবা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে এবং নীচের অংশটি দেয়াল দ্বারা ঘিরে মাটি ভরাট করে দেন। এই সময়ে কোরায়েশগণ কাবার দেয়ালের দুটি পাথরের মধবর্তী স্থানে নরম মাটির মসল্লা ব্যবহার করে দেয়ালের পাথর গাঁথুনি করেন। ফলে দেয়ালটি বেশ শক্ত ও মজবুত হয়।

হাতিম

কাবাগৃহের উত্তর দিকে অর্ধ ডিম্বাকার দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত উন্মুক্ত স্থানটিকে 'হাতিম' বলা হয়। এই অংশটি হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত মূল কাবাগৃহের অংশ। পুনঃ নির্মাণের সময় কোরায়েশগণ এই অংশটিকে মূল গৃহ থেকে বাদ দিয়ে অর্ধডিম্বাকার দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত করে রাখেন। কথিত আছে হালাল অর্থের অভাবে কোরায়েশগণ এই অংশটিকে নির্মাণ পরিকল্পনা থেকে বাদ দেন।

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার সেনাপতি মুসলিম ইবনে আকাবা মদিনায় লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে মক্কা দখলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হলে হোসাইন ইবনে নোমায়েরের উপর মক্কা অভিযানের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। নোমায়ের মক্কার সন্নিকটে এসে পাহাড়ের উপর শিবির স্থাপন করেন এবং তদানীন্তন কালে ব্যবহৃত একপ্রকার কামান দ্বারা কাবাগৃহের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। এই কামানকে মিনজানিক বলা হত। কিন্তু এসময় মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর। তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে তিন মাস ধরে তিনি মক্কা অবরোধ করে রাখেন। অতঃপর ইয়াজিদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দামেস্কে প্রত্যাবর্তনের পথে সেনাপতি নোমায়ের বন্দী ও নিহত হন। হিজরী ৬৪ সনে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নোমায়েরের নিক্ষিপ্ত পাথরে কাবাগৃহের গিলাফে আগুন ধরে যায়। ইহাতে কাবার গিলাফ ও দেয়াল সম্পূর্ণ রূপে ভষ্মীভূত হয়ে যায় এবং ছাদের তক্তাগুলি ও জ্বলে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের উহা পুনরায় নির্মাণ করেন। তবে হযরত আয়শা (রাঃ) হ'তে একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করিম (সঃ) বলেন, "তোমার কওম যদি মুসলমান না হইত এবং তাহাদের মধ্যে যদি কুফরীর আলামত না থাকিত তাহা হইলে আমি কাবাগৃহকে হাতিমের অংশ ভিতরে রাখিয়া উহাতে ২টি দরজা রাখিতাম, একটি প্রবেশের জন্য অপরটি বাহির হইবার জন্য"। হযরত আদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণের সময় এই হাদীসের উপর নির্ভর করে শুধু যে দুটি দরজা দিয়েছিলেন তা নয় হাতিমকে ও কাবার অন্তর্ভূক্ত করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের এই নির্মাণ কালে হজ্ব যাত্রীদের তাওয়াফ কার্যে যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেজন্যে কাবার চারিদিকে

www.pathagar.com

পর্দা টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কথিত আছে হাতিমের এই অংশ নির্মাণ কালে দেয়ালের ভিত্তি স্থাপনের জন্য মাটি খনন করা হলে দেখা গেল পূর্বের দেয়ালের পাথরগুলো পরস্পর আঙ্গুল খিলানের মত জোড়া লাগানো ছিল। এই পাথরগুলো নাড়া দিলে সমগ্র কাবার ভিত্তি প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। জোর পূর্বক পাথরগুলো উঠাবার চেষ্টা করলে সমগ্র মক্কা ভূমিতে প্রকম্পন আরম্ভ হয়েছিল। অতএব হযরত আঃ বিন জুবাইর পূর্বের ভিত্তির উপরই দেয়ালের কাজ করে হাতিমকে কাবাগৃহের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। অতঃপর এই কাবাগৃহ পুনরায় আক্রান্ত হয় হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের হাতে। তার মিনজানিক দ্বারা নিক্ষিপ্ত পাথর কাবা গৃহে লেগে কাবার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাতে বন্দী ও শহীদ হন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা আবুদল মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশে কাবা পুনঃ নির্মাণকালে হাতিমকে বাদ দিয়ে পুর্ববৎ কোরাইশদের বরাবরে করলেন এবং পশ্চিম দিকের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। আব্বাসীয় খলিফা হারুনর রশিদ তাঁর খেলাফত কালে কা'বাকে পুনঃ নির্মাণ করে ইবনে জুবাইরের বরাবর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে হযরত ইমাম মালিক (রঃ) বায়তুল্লাহ্‌কে রাজা বাদশাহর খেলার বস্তু না বানাবার জন্য কঠোর ভাবে নিষেধ করলে খলিফা হারুনর রশিদ বিরত হন। ৭৪ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্মাণ কাজের পর বিভিন্ন সময়ের সংস্কার কার্যাদি ছাড়া কাবার মূল কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই থেকে হাতিম মূল কা'বাগৃহের বাইরেই রয়ে গেল এবং এখনো আছে। এই হাতিম কিন্তু মূল কাবার অংশ। হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) একবার রসুলে করিম (দঃ) কে হাতিম কাবার অংশ কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি হাঁ বলে জবাব দেন। হাতিমকে কাবার অভ্যন্তরে নেয়া হয় নাই কেন প্রশ্ন করলে হুজুরে করিম (দঃ) উত্তরে জানান যে, কোরাইশগণ অর্থের অভাবে হাতিমকে বাদ দিয়েই কাবা পুনঃ নির্মাণ করেন। অতএব স্পষ্টতঃ প্রমাণিত যে হাতিম কাবার অংশ। সুতরাং হাতিমের বাইরেই তাওয়াফ করতে হয় এবং সকল হাজী সাহেবানরা তাই করেন। হাতিমের অভ্যন্তরে নারী পুরুষ নির্বিশেষে হাজীরা অত্যন্ত ভীড় করেন। কেননা হাতিম হারাম শরীফের মধ্যে দোয়া কবুলের অন্যতম পবিত্র স্থান। তাই নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক হাজী হাতিমে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করার চেষ্টা করেন এবং নিবিষ্ট মনে আল্লাহর দরবারে মনের আকুল ফরিয়াদ, পেশ করেন। তাই হাতিমের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের ২টি প্রবেশ পথে পুলিশ প্রহরারত থেকে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নারী পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

এই হাতিমের আরেক নাম হল 'হিজরে ইসমাইল'। এখানে হযরত ইমমাইল (আঃ) এর আবাস গৃহ ছিল বলে এই স্থানকে হিজরে ইসমাইলও বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন হযরত ইসমাইল (আঃ) ইহাকে মূল কাবাঘরের বারান্দা বা হাতিনা হিসাবে ব্যবহার করতেন বলে ইহাকে হাতিম বলা হয়। পবিত্র মক্কা ভূমিতে অনেক আম্বিয়া কেরামের কবর আছে। অনেক নবী তাহাদের নিজ নিজ কওম কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে মক্কায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন হযরত নূহ, হযরত লুত, হযরত ছালেহ ও হযরত শোয়াইব (আঃ)।

www.pathagar.com

এঁরা সকলেই এখানে ইন্তেকাল করেন। জমজম ও হাতিমের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁ'দের কবর অবস্থিত। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে হাজরে আসওয়াদ, মোকামে ইব্রাহিম ও জমজম কুয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অন্তত পক্ষে ৯০ জন পয়গম্বরের কবর স্থিত আছে। নবীগণ যেখানে শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করেন সেখানেই তাঁদের দাফন করা রেওয়াজ। এই সকল নবীগণ এই খানেই প্রাণ ত্যাগ করে ছিলেন বলে তাঁদেরকে এখানেই দাফন করা হয়। যেমন রসুল করিম (দঃ) তাঁর নিজ গৃহে হযরত আয়শা সিদ্দিকার (রাঃ) কক্ষে যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। হযরত ইসমাইল (আঃ), তাঁর অবিবাহিতা কন্যাগণ ও মাতা বিবি হাজেরার কবর ও এই হাতিমেই অবস্থিত। তবে এই সমস্ত কবর সমূহের বর্তমানে কোন চিহ্নমাত্র নেই। সমগ্র চত্বরে একই সমতলে একই নকশায় মর্ম্মর পাথর বিছানো। তারই উপর দিয়ে হেঁটে সকল হাজীগণ তওয়াফ করে থাকেন।

মীজাব

এই হাতিমের দিকে অর্থাৎ কা'বা শরীফের উত্তর দিকের দেয়ালের উপরে একটু পূর্ব দিকে মীজাব বা পয়ঃনালা অবস্থিত। এই পয়ঃনালা দিয়ে কাবার ছাদ হতে বৃষ্টির পানি হাতিমে পতিত হয়। এই মীজাবটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ ফুট এবং প্রস্থে ৫ ইঞ্চি উচ্চতায় ৪ ইঞ্চি। দেয়ালের অভ্যন্তরে প্রায় ২০ ইঞ্চি ঢুকিয়ে দিয়ে প্রোথিত করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি যাতে কাবাগৃহ বা তার ছাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে এবং যাতে সহজে বাইরে চলে যেতে পারে সে জন্যে এই পয়ঃনালা স্থাপন করা হয়। যেহেতু মক্কায় বৃষ্টিপাত খুব বেশী হয় না এবং কদাচিৎ হলে সেই বৃষ্টির পানি কাবার ছাদ বেয়ে এই পয়ঃনালা দিয়ে হাতিমে পতিত হয়, তাই হাজী সাহেবানরা এই পানিকে আল্লাহর করুণার দান হিসাবে অত্যন্ত পবিত্র মনে করেন। অনেক হাজীরা বৃষ্টির সময়ে বিভিন্ন পাত্রে করে এই পানি ভরে নেন, শ্রদ্ধাভরে পান করেন এবং নিজ নিজ দেশে নিয়ে যান। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন খলিফা, রাজা বাদশাহ এই পয়ঃনালার বিভিন্নভাবে সংস্কার সাধন করেছেন। অবশেষে বর্তমান সৌদি সরকার ভিতরে রূপার ফ্রেম দ্বারা এবং উপরে খাটি স্বর্ণের পাত দ্বারা এই পয়নালাটি নতুন ভাবে প্রস্তুত করেন। নালাটির উপরাংশ ঢাকনাহীন শক্ত পাথর দ্বারা দেয়ালে আটকানো আছে। এই মীজাবের উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন সন তারিখ লিখা আছে। এই তারিখগুলো বিভিন্ন সময়ের সংস্কারের স্বাক্ষী বহন করে। শেষপ্রান্তে লিখা আছে "বিছমিল্লাহ শরীফ"। তার নীচে খোদিত আছে "ইয়া আল্লাহ"। বাম দিকে সুলতান আহমদ খানের নামের নীচে 'আল-বায়তুল-হারাম' শব্দটি লিপিবদ্ধ আছে।

এই কাবা গৃহের প্রত্যেকটি কোণকে রোকন বলা হয়। দক্ষিণ পূর্ব কোণে হাজরে আসওয়াদ অবস্থিত। তাই ইহাকে রোকনে অসওয়াদ বলা হয় এবং এই কোণ থেকেই তওয়াফ শুরু হয় এবং কাবার চারদিক প্রদক্ষিণ করে এখানে এসেই শেষ হয়। উত্তর পূর্ব কোণকে বলা হয় রোকনে ইরাকী, কেননা এই কোণটি ইরাকের দিক নির্দেশ করে। উত্তর পশ্চিম কোণটি ইয়েমেনের দিকে বলে ইহাকে রোকনে ইয়েমেনী বলা হয়।

www.pathagar.com

কাবার স্বর্ণ কপাট

পবিত্র এই কাবাগৃহের ইতিহাস অতি সুদীর্ঘ। এর প্রতিটি পাথর, প্রতিটি বালুকণা, প্রতিটি দ্রব্য অত্যন্ত পূতঃ ও পবিত্র। এই গৃহের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে মিশে আছে সুদীর্ঘ এক ইতিহাস। পূর্ব দক্ষিণ কোণের দেয়ালে হাজরে আসওয়াদ হতে চার হাত উত্তর দিকে কাবাগৃহের দরজা অবস্থিত। এই দরজাটি ভূমি সমতল হতে সাড়ে ছয় ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এই দরজার কপাট খাঁটি স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত। চৌকাটে অর্ধবৃত্তাকার দুটি লোহার রড আছে। এই দরজা বর্তমানে বৎসরে দুইবার মাত্র খোলা হয়। হিজরী ৬৪ সনে বর্তমান দরজার সোজাসুজী বিপরীতে পশ্চিমের দেয়ালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নির্মিত দরজাটি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বন্ধ করে দিলে বর্তমানে কাবার এই কপাট বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বাদশা ও খলিফা সংস্কার করেন। সর্বপ্রথম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর কাবা গৃহ পুনঃ নির্মাণ শেষে কাঠের ফ্রেমের উপর স্বর্ণের পাত লাগিয়ে দেন। তৎপর ৭৫ হিজরীতে খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান কাবা গৃহের দরজার কপাট স্বর্ণের দ্বারা মুড়ে দেন। তৎপর খলিফা আলী ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তৎপর খলিফা হারুণর রশিদ তৎপর আববাসীয় খলিফা মোক্তাজিম বিল্লাহ তৎপর মুফতাছিদ্‌রে আলাইল্লাহ, তৎপর মিশরের অধিপতি মালিক নাসির, অতঃপর ইয়েমেনের অধিপতি মালিক মুজাফফর, মিশরের মালিক আশরাফ, তৎপর তুর্কী সুলতান চতুর্থ মুরাদ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ নানাযুগে নানাভাবে কাবার দরজায় স্বর্ণের পাত মুড়ে দেন। সর্বশেষে বর্তমান সৌদি রাজবংশের দ্বিতীয় বাদশাহ ফয়সাল ইবনে আবদুল আজীজ হিজরী ১৩৭৭ সনে কাবা গৃহের স্বর্ণের কপাট খুলে উহা খাটি স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করে পুনঃস্থাপন করেন এবং নীচের চৌকাটের নীচে শ্বেত পাথর সংযোজন করেন। কাবাকে গোসল দেয়ার সময় বিমানের মত দরজার সাথে সিঁড়ি সংযোজন করে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হয়। তাওয়াফ কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বলে অন্য সময় এই সিঁড়ি সরিয়ে ফেলা হয়।

এই দরজার সন্মুখেই মাত্র কয়েক হাত দূরে নামাজের সময় ইমাম সাহেব কাবাকে পশ্চিম দিকে রেখে একই সমতলে দাঁড়িয়ে ইমামতি করেন। ইমামের পেছনে থাকেন মোকাব্বের। দুজনের কণ্ঠই মাইকে শোনা যায়। ইমাম সাহেবের কণ্ঠ ক্ষীণ ধরনের। মোকাব্বেবের আওয়াজটি কিন্তু বেশ বলিষ্ট।

ইতিপূর্বে হানিফী, মালেকী, হাম্বলী ও সাফী এই চার মজহাবের ইমামের জন্য চারটি মসল্লার ব্যবস্থা ছিল। সৌদী সরকার ঐ প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে এক ইমামের পেছনে নামাজের ব্যবস্থা করেন। ইমাম সাহেব কোন মজহাবভূক্ত নহেন। তিনি একজন সৌদী, আহলে হাদীস।

হাজরে আসওয়াদ

কাবাগৃহের দক্ষিণ পূর্ব কোণে সব সময় অত্যাধিক ভীড় পরিলক্ষিত হয়। কারণ এখানেই সন্নিবেশিত করা আছে হাজরে আসওয়াদ বা কালোপাথর।

www.pathagar.com

প্রত্যেক তীর্থ যাত্রীই এই পাথরে অন্ততঃ একটি বার চুমু দেয়ার জন্য উদগ্রীব ও উৎকণ্ঠিত থাকেন। ফলে এখানে সর্বদা দারুণ ভীড় লেগে থাকে। এই ভীড় ঠেলে বয়স্ক ও দুর্বল হাজীদের পক্ষে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা বা চুমু দে'য়া অসম্ভব ব্যাপার। আমি নিজে একবার এই ভীড়ের মধ্যে পড়ে সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ছিলাম। এর ফলে আমার জামা ছিড়ে যায় এবং ডান বাহুর এক জায়গায় ঘষা লেগে রক্তপাত হতে থাকে। বিফল মনোরথ হয়ে বেরিয়ে এসে সংগীদের সামনে উপস্থিত হলে তারা করুণা দেখিয়ে হাসতে লাগল। এই ভীড়ের মধ্যে এভাবে জখম হওয়া অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। প্রায় প্রতিদিন এইরূপ অনেক হজ্ব যাত্রী এই ভীড়ে পড়ে নানা ভাবে আহত হয়। তাই সৌদী সরকার কাবার চারিদিকে উন্মুক্ত চত্বরে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। চার চাকার বেশ বড় ধরণের একটি ট্রলী। তার তিন স্তরে তিনটি ট্রেতে বিভিন্ন প্রকার ঔষুধ, যন্ত্রপাতি ও ব্যান্ডেজ দ্রব্য সামগ্রী মওজুদ রাখা হয়। আমার মত আহত ব্যক্তিরা অথবা অত্যাধিক রোদে বা অন্য কোথাও ভীড়ের চাপে বা অন্য কোন কারণে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সাথে সাথে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দানের জন্য এগিয়ে আসে। রোগীর অবস্থা বুঝে প্রয়োজন বোধে অধিকতর চিকিৎসার জন্যে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। স্বামী রণে আহত হয়েছে। সংগীরা বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করছে। বুলবুলের অহংবোধে বোধ হয় এটা সহ্য হচ্ছিল না। তাই সে সাহস করে আমাকে বাহুতে ধরে হন হন করে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে নিয়ে আসে। চিকিৎসকদেরকে কিছু বলার প্রয়োজন হয়নি। বলবার মত আরবী ভাষা ও জানা ছিল না। তাদের সামনে আমার আহত বাহুটি তুলে ধরতেই তারা সাথে সাথে বিনা বাক্য ব্যয়ে ডেটল জাতীয় ঔষধ লাগিয়ে দিল। ভাগ্যিস প্রাথমিক চিকিৎসাতেই কাজ সেরে গিয়েছিল। বেশী কিছু হলে ধরে বেঁধে সোজা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখত। ইতিপূর্বে আরেকবার হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে গিয়ে পাথরটির একেবারে সন্মুখে পৌছে গিয়েছিলাম। চুমু দিতে যাবো ঠিক সে মুহূর্তে ভীড়ের ঠেলায় স্থান চ্যুত হয়ে কয়েক হাত উত্তর দিকে চলে গেলাম। প্রথম মুহূর্তে সেটা টের পাইনি। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন হাজরে আসওয়াদেই চুমু দিচ্ছি। পরে সম্বিত ফিরে এলে বুঝতে পেলাম আমি হাজরে আসওয়াদের সন্মুখে নেই, বরঞ্চ মুলতাজিমে পৌছে গেছি। কাবার দরজা এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী এই স্থানটিকে মুলতাজীম বলা হয় এবং ইহা ও দোয়া কবুলের একটি অন্যতম বিশিষ্ট স্থান। বুঝতে পেরে সেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ করলাম, অশ্রুসিক্ত নয়নে ঢেলে দিলাম মনের সকল আকুলতা।

ইতিপূর্বে হুদা সাহেব, নাদেরুজ্জমান সওদাগর, মিসেস হুদা, মিসেস হাদী, মিসেস নাদেরুজ্জমান তারা সকলেই এই অসম্ভব কার্য সম্ভব করে ফেলেছিলেন অর্থাৎ ভীড় ঠেলে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে ফেলেছেন। বাকী থাকলাম আমি, আমার গোবেচারী স্ত্রী বুলবুল আর হাদী সাহেব। অতঃপর আমি আর হাদী সাহেব যৌথভাবে বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। অবশেষে হাদী

www.pathagar.com

সাহেব সফল হয়ে গেলেন। চুমু দিয়ে ফিরে আসলেন। আমি কিন্তু পারলাম না। নানাদিক থেকে নানাভাবে জাহাংগীরদের সাহায্য নিয়ে ও আমি সফলকাম হলাম না। তারপর হতে বুলবুলকে দিয়ে চেষ্টা করাতে লাগলাম। প্রায় সময় দেখা যায় মূলতাজীমের দিকে মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। এভাবে এস্থানে কিছু মেয়ে লোক জমে গেলে পুলিশ এসে তাদের সহায়তা করে এবং কোন পুরুষ যেন সেদিকে যেতে না পারে সে জন্য কর্ডন সৃষ্টি করে রাখে। শেষ বারের মত আমি মওলানা জাহাংগীরকে সামনে দিয়ে বুলবুলকে মধ্যখানে রেখে বুলবুলের পেছনে আমি দাঁড়িয়ে সেদিকে অগ্রসর করার চেষ্টা করি। অল্পক্ষণের মধ্যে দেখি বুলবুল নারীদের সারির মধ্যে পৌছে গেছে। আমি সেদিকে অগ্রসর হতে চাইলে পুলিশ আমাকে বাধা দিল। আমি বললাম ওখানে যে আমার বিবি মজকুরা। পুলিশ আমার কথা শুনল, কিন্তু বুঝলনা। তবে মেয়েদের দিকে আমাকে আর অগ্রসর হতে দিল না। এইভাবে পুলিশের সহায়তায় নারীদের সারির মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত বুলবুল ও শরীর পাতন করে মন্ত্রের সাধন করে আসল। হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে গভীর এক তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বেরিয়ে আসল। মনে হল যেন ওয়াটার লু জয় করে এল। এভাবে দলের ৭ জনেই হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে ফেললেন। বাকী থাকলাম শুধু বেচারা আমি। কিছুতেই কালো পাথরে আমার চুমু দেয়া হল না। এমনকি আমাদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। তবু ও বারবার চেষ্টা করে ও ব্যর্থ হলাম। পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ জানালাম–"হে আল্লাহ, আমি কি হাজরে আসওয়াদে চুম্বন না করেই মক্কা মোয়াজ্জমা হতে ফিরে যাবো? তুমি দয়া করে আমাকে সে সুযোগ করে দাও।" আল্লাহর অসীম দয়া। তিনি আমার দোয়া কবুল করলেন। আমরা যেদিন দেশের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করব সে রাত্রে তাওয়াফে জেয়ারতের জন্য এশার পূর্বে হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম। উন্মুক্ত চত্বরে দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় বুলবুল ও মিসেস হুদাকে বসিয়ে বললাম আমি শেষ চেষ্টায় চললাম। আমি না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে। এই জেয়ারতই আমাদের শেষ জেয়ারত। আজ যদি না হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। এই একটি মাত্র আহ্কাম ব্যতিত হজ্বের আর কোন আহকাম বাকী নেই। তাই কায়মনোবাক্যে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম এবং হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু এগুতে পারছিনা। হঠাৎ দেখি হাজরে আসওয়াদের সন্মুখে ৭/৮ ফুট দূরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এই সময়ে এ'শার নামাজের আজান শুরু হল। তাওয়াফ বন্ধ হয়ে গেছে। নামাজের জন্য সকলেই কাতারবন্দী হয়ে বসে গেছে। এ সময়ে কাবা চত্বরে কারো দাঁড়িয়ে থাকার রেওয়াজ নেই। আমার ডান পাশে বাম পাশে সকলে তাই অনুরূপ ভাবে বসে গেছে। সন্মুখে খালি–কেউ নেই। অবস্থা বুঝতে পেরে আমি ও সেই কাতারে বসে গেলাম। এখন আমার সন্মুখে হাজরে আসওয়াদ পাঁচ সাত ফুটের ব্যবধানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি আর হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানটি সম্পূর্ণ ফাঁকা, কোন লোকজন নেই। নয়ন ভরে দেখে নিলাম সাধনার ধন হাজরে আসওয়াদ। আমার সন্মুখে কয়েকজন পুলিশ

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে ও ইতস্ততঃ পায়চারী করে শৃংখলা রক্ষা করছে। এই সময়ে ফাঁকা পেয়ে দুয়েক জন ভদ্র মহিলাকে উপস্থিত পুলিশদের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে চুমু দিতে দেখলাম। এক বৃদ্ধলোক ছোট্ট একটি কিশোরকে সাথে নিয়ে কিশোরটির উছিলায় চুমু দিবার অনুমতি পেল। আমি এমতাবস্থায় উঠে অনুমতি নিয়ে চুমু দেবার চেষ্টা করলে পাশের বাঙালী ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন আপনি চুমু দিতে গেলে অনুমতি পাবেন না। পক্ষান্তরে জায়গাটি ও হারাবেন। আপনি দুদিকেই মার খাবেন। অতএব বসে থেকে অপেক্ষা করুন। তার কথাটা যুক্তিসংগত মনে করে আর স্থানচ্যুত হলাম না। এই সময়ে একজন পুলিশ আমার সন্মুখে এসে দাঁড়ালেন। আমি উঠে তাকে কিছু বলার চেষ্টা করলে তিনি আমাকে উঠতে দিলেন না। আমি বসা অবস্থায় তাকে ভাংগা ভাংগা আরবী উর্দু মিশিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে আজকে আমার আখেরী এওম অর্থাৎ শেষ দিন। এ পর্যন্ত হাজরে আসওয়াদে বার বার চেষ্টা করেও আমি চুমু দিতে পারিনি। আজকে ও না পারলে আমার আর চুমু দেয়াই হবে না। তিনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। জবাবে বললেন এখন নয়, নামাজের পর জানাজা হবে, জানাজার পর আপনি চুমু দেবেন। তাঁর কথা মেনে নিলাম, বললাম, 'আন্তা মদদুন' অর্থাৎ আপনি সাহায্য করবেন। আন্তা ও মদদ শব্দ দুটি আরবী বিধায় তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে আমি কি চাইছি। ইত্যবসরে ইমাম সাহেব এসে গেছেন, মসল্লা পেতে দেয়া হয়েছে। মাইক ফিট করা হয়েছে, মোকাব্বের পেছনে দাঁড়িয়ে গেছেন। এ'শার নামাজের পর পরই দেখলাম লাশবাহি খাট এসে গেছে।

বুঝলাম এখন জানাজা হবে। জানাজার ঘোষণা ও দেয়া হয়ে গেছে। সুতরাং এ'শার নামাজ শেষ হলে ও সকলেই কাতারে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ততঃ সম্মুখের সারি গুলো ভাঙতে দেয়া হচ্ছেনা। নিয়ত করে জানাজায় দাঁড়িয়ে গেলাম। ইমাম সাহেব যেই মাত্র আচ্ছালামু আলাইকুম বলে ডান দিকে মুখ ফিরালেন, সাথে সাথেই আমি হাজরে আসওয়াদের দিকে অলিম্পিক বেগে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি আমি দ্বিতীয় স্থানে পড়ে গেছি। আমার আগে আরেকজন সেখানে মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তিনি মাথা বের করবার সাথে সাথেই আমি মুখ ঢুকিয়ে দিলাম। খুশী মনে ইচ্ছামত বেশ কয়েকটি চুমু দিলাম, ডান হাত ঢুকিয়ে দিয়ে স্পর্শ করলাম, মনের সমস্ত আবেগ দিয়ে অনুভব করলাম। অতঃপর ফিরে আসতে গিয়ে দেখি আমার পিছনে পূর্বের মত সেই ভীড় জমে গেছে। সেই ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে খুব বেগ পেতে হয়েছে। ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে বেশ কিছু পিছনে গিয়ে ফাঁকা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানালাম। মনের সমস্ত আবেগ ভরে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে শুকরিয়া আদায় করলাম। অতঃপর বুলবুলদের কাছে ফিরে এসে যখন হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার কথা বললাম তারা এই অল্প সময়ে অক্ষত অবস্থায় আমি চুমু দিয়ে ফিরে এসেছি শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হল। আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললাম যে, আল্লাহ পাক তাঁর অসীম দয়ায় আমাকে এরূপে অত্যন্ত সহজভাবে কালো পাথরে কাঙকিত চুমু দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তখন তারা খুশী হল।

www.pathagar.com

এই হাজরে আসওয়াদ কিন্তু কাবার অংশ নয়। পাপ মার্জনার অভিপ্রায়ে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার এই ভীড়ের মধ্যে অনেকেই আবার পৌত্তলিকতার গন্ধ ও শুঁকেছেন। তাই আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) একদিন কাবা তাওয়াফ কালে হাজরে আসওয়াদের সন্মুখে দাঁড়িয়ে চুম্বনের পূর্বে বলেছিলেন "আল্লাহর কসম। আমি জানি তুমি কেবলমাত্র একটি পাথর এবং মানুষের কোন কল্যাণ বা ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা তোমার নাই। আল্লাহর নবী রসুল করিম (দঃ) কে যদি তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনোই তোমাকে চুমু দিতাম না"। সুতরাং একথা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, হাজরে আসওয়াদের নিজস্ব কোন শক্তি বা সামর্থ নেই এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার অর্থ হাজরে আসওয়াদের কাছে কিছু চাওয়া বা আরাধনা করা নহে। হাজরে আসওয়াদ কোনরূপেই উপাস্য নহে। অন্ধকার যুগে আরবেরা অনেক দেবদেবীর পূজা করলেও হাজরে আসওয়াদ ও কাবা গৃহকে কোনদিন মাবুদ বলে পূজা করেনি। হাজরে আসওয়াদ বেহেশতের একটি পাথর। হযরত আদম (আঃ) এর নির্মীত কাবায় হাজরে আসওয়াদের উল্লেখ দেখা যায় না। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কাবা নির্মাণ করতে করতে দক্ষিণ পূর্ব কোণে এসে পৌছলে স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে বললেন, "এই কোণে স্থাপন করার জন্য একখানা পাথর এনে দাও, যাতে করে ভবিষ্যৎ মানব সমাজ এই স্থান থেকে তাওয়াফ শুরু করার জন্য ইহাকে চিহ্ন হিসাবে ধরে নিতে পারে"। পিতার আদেশে হযরত ইসমাইল পাথরের খোঁজে বের হলে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আবু কোবাইশ পাহাড় হতে এই পাথরটি এনে হাজির করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নুহ (আঃ) এর মহা প্লাবনের সময় কাবাগৃহ ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহ তা'লা এই পাথরটিকে আবু কোবাইশ পর্বতে পুথে রেখেছিলেন। আল্লাহ তা'লা ঐ পর্বতকে আদেশ দিয়েছিলেন, "আমার খলিলকে আমার কাবা গৃহ নির্মাণ করতে দেখলে এই পাথর তাকে বের করে দিও" এবং পিতার আদেশে ইসমাইল পাথর আনতে গেলে আবু কোববইশ চিৎকার করে বলেছিল, "হে ইব্রাহিম, আপনার জন্য আমার নিকট একটি আমানত গচ্ছিত আছে উহা গ্রহণ করুন"। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তখন হাজরে আসওয়াদকে আবু কোবাইশ পর্বত হতে নিয়ে এসে বর্তমান স্থানে স্থাপন করেন। তদবধি এযাবৎকাল হাজরে আসওয়াদের রোকন হতেই তাওয়াফ কাজ শুরু হয়। /এই জবলে আবু কোবাইশের সাথে ও জড়িত আছে অনেক স্মৃতি, অনেক ইতিহাস। এই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর গুরুত্ব পূর্ণ মোজেজা প্রদর্শন করেছিলেন। কাফেরদের মোকাবেলায় হযরত নবী করিম (দঃ) এই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় আঙ্গুলি সংকেতে চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করেছিলেন। তার ও পূর্বে কাবাগৃহ পুন নির্মাণের পর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এখান হতেই প্রথম বারের মত দুনিয়ার তদানীন্তন কালীন এবং অনাগত সকল মানুষকে প্রথম বারের মত হজ্বের ডাক দিয়েছিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) এর মসজিদ-মসজিদে বেলাল, এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই পাহাড়েই স্বর্গীয় পাথর হাজরে আসওয়াদকে আমানত রাখা হয়েছিল। হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) হজ্বে আসলে এই

www.pathagar.com

পাহাড় স্থিত মসজিদে বেলালে অবস্থান করতেন। পবিত্র এই স্বর্গীয় কালো পাথরটির দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি প্রস্থ ৭ ইঞ্চি এবং দেয়ালের অভ্যন্তরে প্রোথিত আছে প্রায় এক হাত। ভূমি হতে সাড়ে ৪ ফুট উঁচুতে কাবা গৃহের দক্ষিণ পূর্ব কোণে দেয়ালের বর্হিদিকে রূপার ফ্রেমে করে দেয়ালের সংগে শক্ত করে স্থাপন করা হয়েছে।

কাবার মত এই হাজরে আসওয়াদের উপর দিয়ে ও গিয়েছে অনেক ঝড় ঝাপটা, ঘাত সংঘাত। জুরহাম গোত্র মক্কা হতে পালিয়ে যাবার সময় হাজরে আসওয়াদকে জমজম কুপে নিক্ষেপ করে যায়। পরবর্তীকালে কুসাই ইবনে কিলাব পাথরটি উদ্ধার করে পূর্বস্থানে পুনঃস্থাপন করেন। হযরত ইবনে জুবাইয়েরের সময় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মিন জানিক হতে নিক্ষিপ্ত পাথরে আগুন লেগে যায়। ফলে পাথরটি খন্ড খন্ড হয়ে যায়। তাই হযরত ইবনে জুবাইর পাথরের টুকরা গুলোকে একটি রূপার ফ্রেমে আবদ্ধ করে, মোমের সাহায্যে পুনরায় সংযোজন করে, যথাস্থানে স্থাপন করেন। হিজরী ৩১৭ সনে ফরমতি গোত্রের একজন লোক একটি হাতুরী দ্বারা এই পাথরকে আঘাত করে দেয়াল হতে বেব করে ফেলে এবং গোত্রের অপরাপর লোকজনের সহায়তায় পাথরটি তাদের দেশে নিয়ে যায়। সম্বর ইবনে হাসন কারমাতী ৩৩৯ হিজরীতে পাথরটি উদ্ধার করে আবার যথাস্থানে স্থাপন করেন। এই কারমতিগণ একবার হজ্ব মৌসুমে হজ্ব করার ভান করে বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে। হাজার হাজার লোক নিহত হয়, লালে লাল হয়ে যায় কাবাগৃহের চত্বর, মক্কার রাজপথ। তারা কাবাগৃহের দরজা ভেংগে গৃহাভ্যন্তরের যাবতীয় স্বর্ণ রৌপ্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ও হাজরে আসওয়াদ লুট করে তাদের দেশ বাহরাইনে নিয়ে যায় এবং একটি মসজিদে স্থাপন করে ঐ মসজিদকে কাবা বানাবার চেষ্টা করে। তারা লোকজনকে তাদের দেশে হজ্ব করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল। পরে বিফল মনোরথ হয়ে পাথরটি ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

ঈমান, আকিদা, এবং শাসক গোষ্টীর অনুসৃত নীতির কারণে ও কাবা বারবার আক্রান্ত হয়েছে। এই সেদিন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির ১লা মহররম মক্কায় ওতায়বা গোত্র আকীদার ভিন্নতার দরুণ কাবা আক্রমণ করে বসে। অবশেষে পরাজিত ও বন্দী হয় এবং বিচারে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হয়। বারবার আক্রান্ত হলে ও কাবা আল্লাহর ঘর এবং আল্লাই তার রক্ষক। তার প্রমাণ বাদশাহ আবরাহার কাবা ধ্বংসের চেষ্টার ঘটনায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। হিজরী ৩৬৩ সনে তুরস্কের একজন বাগী এক ফাঁকে কুড়াল দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে আঘাত করে। পরে লোকজন তাকে ধরে হত্যা করে। হিজরী ৪১৩ সনে মিশরের একজন বিদ্রোহী খন্তা দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে আঘাত করে। ফলে পাথরটি বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আঘাত করার সময় সে বলছিল–"আর কতদিন এই পাথরকে পূজা করা হবে? হজরত আলী ও মুহম্মদ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আমি আজ এই ঘরকে ভেঙ্গে দেখতে ইচ্ছা করি"। অবশেষে একজন দুঃসাহসী যুবক তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করে। হিজরী ৯৯০ সনে জনৈক অনারব লোহার অস্ত্র দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে আঘাত করে। পরে ধরা পরে এবং মক্কার আমীরের আদেশে তার

www.pathagar.com

শিরচ্ছেদ করা হয়। হিজরী ১৩৫১ সনে জনৈক ফারসী কৌশলে পাথরটির একটি টুকরা উঠিয়ে ফেলে এবং গীলাফের একটি টুকরা ও চুরি করে ফেলে। পরে তাকে বন্দী করে দন্ডিত করা হয়।

হিজরী ৬৪ সনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রূপার ফ্রেমে স্থাপন করার পর হিজরী ১৮৯ সনে খলিফা হারুণর রশীদ ঐ ফ্রেমটি বদলে নতুন ফ্রেমে স্থাপন করেন। ৩৪০ হিজরীতে কাবার খাদেম বীরম খোজা পুনরায় নতুন ফ্রেম লাগান। তৎপর ৫৮০ হিজরীতে মক্কার আমীর দাউদ ইবনে ইসা, অতঃপর ১০৯৭ হিজরীতে শেখুল হারাম, এবং ১৩৭১ হিজরীতে সুলতান রশীদ খান পুনঃ রূপার বন্ধনটি বদলান। মধ্যখানে হিজরী ১২৬৮ সনে সুলতান আবদুল মজিদ খান ইহাকে খাটি সোনার ফ্রেমে আবদ্ধ করে তাতে কোরানের আয়াত লিখে স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে সুলতান আজীজ খান স্বর্ণের ফ্রেম খুলে পূর্বের মত রুপার ফ্রেম স্থাপন করেন। হাজরে আসওয়াদ শেষ বারের মত স্থাপন করেন বাদশাহ আবদুল আজীজ ইবনে সউদ। তিনি পাথরের ছোট ছোট টুকরাগুলি মোমও গ্ল দ্বারা সংযোজন করে রূপার ফ্রেমে আবদ্ধ করে নিজ হাতে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করেন। বর্তমানে ইহা ঐ অবস্থায় আছে। মুফতী মওলানা আবদুর রহমান সাহেব আমাকে বলে দিয়েছিলেন ভালো করে নজর করলে দেখতে পাবে হাজরে আসওয়াদ ৭ টুকরায় বিভক্ত। আবার আল্লামা তাহের কুর্দি বলেন, ইহা ৮ টুকরায় বিভক্ত। তবে বর্তমানে মোম ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা এটিকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে টুকরার বিভক্তি রেখা সহজে নজরে পড়ে না।

অত্যন্ত বিস্মিত হই হাজরে আসওয়াদের সামনে অহোরাত্রি অত্যন্ত ভীড় লক্ষ্য করে। এই ভীড় আজকের দিনে নতুন সৃষ্ট নয় বরং যুগ যুগ ধরে চলে আসছে ভীড়ের এই প্রচণ্ডতা। এই ভীড়ের মধ্যে অনেকেরই হতাহত হবার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, যিনি সন্মুখ দিকে এগিয়ে গিয়ে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন তিনি আবার ঠিক একই পথে পিছনে ফিরে আসেন। এই ফেরার পথে সন্মুখে অগ্রসর মান লোকদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সন্মুখের দিকে যারা বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছেন ফিরতি লোকের ধাক্কায় তিনি আবার অনেক দূর পিছিয়ে যান। এই রকম মুখোমুখি সংঘর্ষে শক্তিশালী কেউ বিশেষত আফ্রিকার কেউ দাঁড়িয়ে গেলে অবস্থা তখন গুরুতর পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যায়। আমার মনে হয় এই ভীড় এড়ানো বা ভীড় এড়িয়ে সকল হাজীকে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার ব্যবস্থা করাটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে। কাবার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এ ব্যাপারে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বর্তমান সরকার হাজীদের আরাম আয়াস ও কল্যাণের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করে অনেক অকল্পনীয় উন্নয়নমূলক কার্যাদি করেছেন। কিন্তু এই হাজরে আসওয়াদের সন্মুখে কিভাবে ভীড় এড়ানো যায় সে সম্পর্কে আদৌ কোন চিন্তা ভাবনা করেন নাই। আমি মনে করি হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার জন্যে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করে এক মুখী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে পারলে ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়ে যাবে। যেমন চুমু দিতে যারা আসবে তারা সব

www.pathagar.com

সময় চুম্বন শেষ করে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ এক দিকে প্রবেশ করে অন্য দিকে বেরিয়ে যাবে। একই পথে ফেরৎ আসবে না। হাজরে আসওয়াদের সামনে পুলিশ প্রহরায় নিয়োজিত থেকে এক লাইনে চুম্বন কার্য নিয়ন্ত্রণ করা খুব দুরুহ ব্যাপার নহে। পুলিশের পক্ষে ভীড় সামাল দেয়া কঠিন মনে হলে সেখানে ক্ষুদ্রাকৃতির রেলিং স্থাপন করা যেতে পারে। এভাবে যারা এগিয়ে আসবে তারা চুমু দিয়ে পেছনে বা ডাইনে বামে না গিয়ে সোজা অপর দিকে চলে যাবে। এরূপ অথবা সুবিধাজনক অন্য কোন রুপ ব্যবস্থা করতে পারলে হাজীরা একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে অনায়াসে প্রত্যেক দর্শনার্থী এই পাথরে চুমু দিতে পারবেন বলে আমি দৃঢ় ধারণা পোষণ করি। সৌদি সরকার বিষয়টির সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখলে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম উপকৃত হবে। ওভারব্রীজ, ফ্রাই ওভার, আন্ডার গ্রাউন্ড সুরুঙ্গ প্রভৃতি নির্মাণ করে ও কোনরূপ কুলকিনারা করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

বায়তুল্লাহ শরীফের প্রাচীরের গোড়ায় পা লাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে হাজরে আসওয়াদ সরাসরি বুকে লাগবে না। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়। কেননা কাবার দেয়াল নীচের দিকে এবং উপরের দিকে সমান নয়। বৃষ্টির পানি যেন কাবার দেয়ালে লেগে দেয়ালের কোন ক্ষতি করতে না পারে সে জন্যে নিম্নের অংশে দেয়ালের বর্হিদ্বারে চার দিকে কিছু অতিরিক্ত পাথর সংযোজন করে আমাদের দেশের মাটির গৃহের চারিদিকের রোয়াকের মত করে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কাবার অন্যদিকের দেয়ালের সাথে যখনি মুখ বা বুক লাগাবার চেষ্টা করেছি, যেহেতু দেয়াল নীচের দিকে পুরু, তাই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে। এই রোয়াক ও কিন্তু আবার আগাগোড়া সমান নয়। ভূমি থেকে উপরের দিকে তির্যকভাবে উঠেছে। ফলে রোয়াকের উপরের দিকে সরু নিম্নের দিকে পুরু। এই রোয়াকের চার কোণায় ৪টি লোহার রিং ভূমির সাথে প্রোথিত আছে। পূর্বে কাবা প্রাচীরের পাথরের ফাঁকগুলি দেখা যেত এবং প্রাচীর মসৃণ ছিল না। বর্তমান সৌদী সরকার কাবা সংস্কারের সময় চুন সুড়কির মসলা দ্বারা দেয়ালের ফাঁক গুলি এঁটে দেন। ফলে প্রাচীরের গাঁথুনি বেশ মজবুত হয় এবং মসৃণ ও সুন্দর দেখা যায়।

মোকামে ইব্রাহিম

এই হাজরে আসওয়াদের আনুমানিক ৪ ফুট উত্তরে কাবাগৃহের দরজা। এই দরজা হতে আনুমানিক ৩০ ফুট পূর্বে 'মোকামে ইব্রাহিম' অবস্থিত। স্বাভাবিক সময়ে কাবাগৃহ এবং মোকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী এই স্থান দিয়ে তাওয়াফ করা হয়। তাওয়াফ শেষে পূর্বদিকে গিয়ে যতটুকু সম্ভব মোকামে ইব্রাহিমের সন্নিকটে থেকে হাজীগণ রেওয়াজ অনুযায়ী নফল নামাজ আদায় করেন। কিন্তু যখন তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যায় তখন পূর্ব দিকে মোকামে ইব্রাহিমকে ডিঙিয়ে ও তাওয়াফ করতে দেখা যায়। এই সময়ে মোকামে ইব্রাহিমে শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় করা অত্যন্ত দুষ্কর। মোকামে ইব্রাহিমে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছি, তাওয়াফকারীরা সেদিকে কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে সামনে দিয়া চলে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

সেজদায় গেলে মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তাই প্রায় সময় এখানে দেখা যায় কেউ নামাজে দন্ডায়মান হলে তার এক বা একাধিক সাথী তাকে ঘিরে রেখেছে। তাওয়াফ কারীরা এদিকে যেতে চাইলে হাত প্রসারিত করে "সালাত" "সালাত" বলে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে দিচ্ছে। তা নইলে ভীড়ের সময় নামাজ পড়া খুবই ক্লেশকর। অনেক সময় এখানে ভীড়ের ধাক্কায় ধ্যানচ্যুত হয়ে পড়তে হয়।

মোকামে ইব্রাহিম, হাজরে আসওয়াদের মত জান্নাত হতে অবতীর্ণ আর একটি পূতঃ পবিত্র অলৌকিক পাষাণ। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে হাজরে আসওয়াদ ও মোকামে ইব্রাহিম এ দুটি বেহেশতের অংশ। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মোজেজার অন্যতম শ্রেষ্ট নিদর্শন এই মোকামে ইব্রাহিম। এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) যখন কাবাগৃহ নির্মাণ করছিলেন তখন প্রয়োজনে এই প্রস্তর খন্ড আপনা আপনি উপরে নীচে উঠানামা করত। কাবাগৃহ নির্মাণ শেষে তিনি এই পাথর কাবার দরজার সাথে সন্নিবেশিত করে রেখে দিয়েছিলেন। এই পাথরে দাঁড়িয়ে তিনি মানব সমাজকে হজ্বের আহ্বান জানিয়েছিলেন। হাজরে আসওয়াদের মত মোকামে ইব্রাহিম ও কাবা গৃহের অংশ নহে। ইসলাম পূর্ব যুগে এই মোকামে ইব্রাহিম কাবার ভিতরে রক্ষিত থাকত। তবে মধ্যে মধ্যে দর্শনার্থীদের দেখার সুবিধার জন্য কাবার বাইরে দরজার নিকট রাখা হত। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইহাকে কাবার ছাদের উপর সিন্দুকে পুড়ে রাখা হত। হজ্বের সময় সিন্দুকটি নামিয়ে দর্শনার্থীদের দর্শনের জন্য বাইরে রাখা হত। হযরত নবী করিম (দঃ) এর যুগে তিনি তাহা কাবার দরজার নিকট রেখেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সময়ে ও পাথরটি সেখানে ছিল। হিজরী ১৭ সনে মক্কায় একবার অতি বৃষ্টির ফলে বিরাট এক বন্যা হয়। বন্যার পানিতে পাথরটি ভেসে গিয়ে মিছফলার নিম্ন ভূমিতে চলে যায়। সেখান থেকে পাথরটি উদ্ধার করে কাবার দেয়ালের নিকটে রাখা হয়। আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) এই সংবাদ পেয়ে মক্কায় আসেন এবং তদানীন্তন কালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাথে সলা পরামর্শক্রমে বর্তমান স্থানে উহা স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন খলিফা পাথরটিকে কেউ সোনা দিয়ে, কেউ রুপা দিয়ে মোড়ান এবং তদুপরি গম্বুজ বিশিষ্ট ছোট্ট একটি ইমারত নির্মাণ করেন। বাদশাহ আবদুল আজীজ ইবনে সউদ নামাজ ও তাওয়াফের সুবিধার জন্য ইমারতটি ভেংগে ফেলে তদস্থলে একটি পিতলের পিঞ্জর স্থাপন করেন। পাথরটি একটি সিন্দুকে পুরে পিঞ্জরের ভিতর স্থাপন করেন। সিন্দুকটির একদিকে বিছমিল্লাহ শরীফ অপর দিকে কোরানের একটি আয়াত লিখা আছে। এই পিঞ্জরটি ১৩৮৭ হিজরী সনে ফ্রান্সে নির্মিত। ইহার উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন ফুট এবং পরিধি প্রায় ছয় ফুট। এই পিঞ্জরের অভ্যন্তরে সিন্দুকের ভেতর পিতলের একটি তক্তপোষ, তদুপরি একটি মর্ম্মর পাথরের উপরে মোকামে ইব্রাহিম রক্ষিত আছে। পাথরটির উচ্চতা প্রায় ৪ ইঞ্চি। এই পাথরের উপরি ভাগে লম্বা ডিম্বাকৃতির দুটি মানুষের পায়ের চিহ্ন আছে। দুটি চিহ্নের মধ্যখানে প্রায় ১ ইঞ্চির মত ফাঁক। এই চিহ্নগুলো পাথরের ভিতরের দিকে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ঢুকেছে। সন্মুখের দিকে আংগুলের কোন চিহ্ন

www.pathagar.com

বিদ্যমান নাই। যুগ যুগ ধরে মানুষের স্পর্শের কারণে আংগুলের চিহ্ন গুলি মুছে গেছে বলে মনে হয়। এই পদ চিহ্নটি প্রায় ১১ ইঞ্চি লম্বা। ইহাতে মনে হয় হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দেহের গঠন প্রায় বর্তমান যুগের মানুষের মতই ছিল। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর মোজেজায় পাথরখানা নরম হয়ে গেলে তাতে তাঁর পদচিহ্ন অংকিত হয়ে যায়। যুগে যুগে এই পাথরকে মানবকুল সন্মান করলে ও কোনদিন, এমনকি প্রাক ইসলামী যুগেও এই পাথরকে পূজা কিংবা মাবুদ বলে সাবস্থ করেনি। এই পিঞ্জরের পাশে একাধারে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে পাথরটি দেখতে দেয়া হয় না। কারণ একজন বেশীক্ষণ ধরে একইস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলে বাকীরা দেখার সুযোগ পাবে না, তাই পুলিশ বেশীক্ষণ না দাঁড়াতে তাগাদা দেয়। এমতাবস্থায় বার বার ঘুরে এসে পিঞ্জরের কাছে গিয়ে পাথরটি দেখি। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ চার হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও তাঁর এই পদচিহ্ন বুকে ধারণ করে এই পাথরটি এখনো তাঁর মোজেজার এক উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ ভাস্বর হয়ে আছে। এই পূতঃ পবিত্র মোকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান বানাবার জন্য পবিত্র কোরানে তাগিদ আছে। এই স্থানের গুরুত্ব ওহী বাণী দ্বারা প্রমাণিত। তাই হাজী সাহেবানরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এখানে নামাজ আদায় করে আকুল হৃদয়ে, ব্যাকুল চিত্তে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে পরম তৃপ্তি লাভ করেন। তাই এই মোকামে ইব্রাহিম কেবলমাত্র একটি পাথর বা স্থানের নাম নয়--সারা দুনিয়ার মুসলিম জাতির অন্তরে প্রেরণা ও শিহরণ জাগানোর এক অফুরন্ত উৎসস্থল।

জমজম

তাওয়াফ শেষে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে মোকামে ইব্রাহিমে নামাজ আদায় করার পরবর্তী কাজ হল জমজম কূপের নিকট গিয়ে ইচ্ছামত তৃপ্তি সহকারে জমজম এর পানি পান করা। মোকামে ইব্রাহিমের দক্ষিণ পূর্বদিকে হাজরে আসওয়াদ হতে প্রায় ৫৫ ফুট দূরে মসজিদুল হারামের উন্মুক্ত চত্বরের ভূমির নিম্নাঞ্চলে সাফা ও মারওয়া পর্বতের পাদদেশে এই কূপটি অবস্থিত। উপরের অংশে ছাদ নির্মাণ করে তাওয়াফের স্থান বর্ধিত করা হয়েছে। সিড়ি বেয়ে বেশ কয়েক ধাপ নীচে গিয়ে এই কূপে যেতে হয়। সিড়িটি মধ্যখানে একটি প্রাচীর দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি নারী ও অপরটি পুরুষের জন্য। সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখি দাঁড়িয়ে টেপ হতে পানি নেয়া যায় এতটুকু পরিমাণ উঁচু পাকা দেওয়াল নির্মাণ করে তার দুধারে দুটি নালা নির্মাণ করা হয়েছে এবং দেয়ালটির দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে ১৫/২০টি করে টেপ বা কলের নল স্থাপন করা হয়েছে। এইরূপ কলের মুখ দিয়ে একসাথে প্রায় ৫০/৬০ জন লোক দাঁড়িয়ে একই সাথে পানি পান করতে পারে। আমরা বাংলাদেশের হাজীরা ইচ্ছামত পানি পান করেছি। মুখে, মাথায়, বুকে মেখেছি। কিন্তু কোন অবস্থাতেই জমজমের পবিত্র পানি দিয়ে পা ধূতে পারিনি। কিন্তু অন্যান্য দেশের হাজী বিশেষতঃ আফ্রিকার হাজীদেরকে দেখেছি তারা বিনা দ্বিধায় জমজমের পানি দিয়ে অজু করে পা ধূয়ে নিচ্ছেন এবং অন্যান্য ভাবে পানি অপচয় করছেন। কেউ জমজমের পানি দিয়ে পা না ধুতে বললে

www.pathagar.com

ও তারা ভ্রুক্ষেপ করে না। কূপের এই স্থানটি শীতল। পানি আরো শীতল। একেবারে হীম শীতল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। প্রচন্ড দাবদাহে এতক্ষণ দগ্ধ হয়ে এখানে এসে ইচ্ছেমত তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে বরফ শীতল পানি পান করে তাপিত প্রাণ শীতল হল এবং মহাপ্রভু আল্লাহর দরবারে সপ্রশংস হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জানালাম। অতঃপর সামনের দিকে এগিয়ে মূল কূপের নিকট উপস্থিত হলাম। এইকূপটি পুরু কাঁচ দ্বারা ঘেরা, তাই কূপের পাড়ে যাওয়া যায় না। কাঁচের বাইর থেকেই দেখতে হয়। দেখলাম কূপের পাড়ে একটি টেবিলকে সামনে রেখে একটি চেয়ারের উপর একজন লোক উপবিষ্ট। মনে হল তিনি পাহারাদার। ছোট্ট গোলাকার একটি কূপ। চারিদিকে গোলাকার পাকা পাড়। কূপটির ব্যাস ৫ ফুট। মুখের পরিধি সাড়ে ১৬ ফুট। গভীরতা প্রায় ৯০ ফুট। হযরত আদম (আঃ) এর সময় এই কূপ ছিল না। নূহ (আঃ) এর যুগে ও এই কূপ অনুপস্থিত ছিল। ইব্রাহীম খলিলুল্লাহর যুগে হযরত ইসমাইলের (আঃ) মোজে জা বা অলৌকিক কীর্তি হিসাবে এই কূপের উৎপত্তি।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বর্তমান দক্ষিণ ইরাকের উ'র (মেসোপেটোমিয়ার বাবেল) শহরে আজ হতে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানে নমরুদের প্রাসাদ এবং ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। কথিত আছে ইরাক অঞ্চলে একলাখ ২৪ হাজারের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পর্যটক বা তীর্থযাত্রীরা ইরাক এসে উ'র শহরে নমরুদের প্রাসাদ, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, কারবালায় হযরত ইমাম হোসেনের মাজার, মসুলে ইউনুস নবীর মাজার, নজফে হযরত আলীর মাজার, বাগদাদে হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানীর মাজার প্রভৃতি জেয়ারত বা পরিদর্শন করেন। কুফার সেই মসজিদে, যেখানে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন, সেই মসজিদে যাত্রীদের সব সময় অত্যন্ত ভীড় পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রাকালে পথিমধ্যে রাজদরবারে স্বয়ম্ভর সভায় রাজ কন্যা সা'রা অপ্রত্যাশিত ভাবে হযরত ইব্রাহিমকে মাল্যদান করে পতিত্বে বরণ করেন। বিবাহের পর সা'রাকে নিয়ে মিশর এলে মিশরের রাজা তদকন্যা হাজেরাকে সা'রার সেবার জন্য তাঁর সেবাদাসী হিসাবে প্রদান করেন। কিন্তু সা'রার কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ায় তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে হাজেরার সাথে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর বিবাহ দেন। অতঃপর বিবি হাজেরার গর্ভে ইসমাইলের জন্ম হলে বিবি সা'রা হিংসা বিদ্বেষে ফেটে পড়েন এবং শিশু পুত্র সহ বিবি হাজেরাকে নির্বাসন দিবার জন্য ইব্রাহিম (আঃ) কে বাধ্য করেন। ঐশী ইঙ্গিত পেয়ে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ শিশু পুত্র ইসমাইল এবং তৎ মাতা বিবি হাজেরাকে জনমানবহীন এই গিরিকুন্তলে সাফা মারওয়ার পাদদেশে নির্বাসন দিয়ে যান। সাথে দেয়া পানি নিঃশেষ হয়ে গেলে পানির পিপাসায় শিশুপুত্র যখন ছটফট করছিল মা হাজেরার হৃদয় বেকরার হয়ে যায়। পানির সন্ধানে লোকজনের খোঁজে তিনি যখন বেহুইন হয়ে সাফা মারওয়ায় ছুটাছুটি করছিলেন আল্লাহর নির্দেশে শিশুপুত্র ইসমাইলের চরণাঘাতে কঠিন প্রস্তর ভেদ করে স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানির এক নির্ঝরনী বেরিয়ে আসে। বিবি হাজেরা পুত্রের নিকটে আসা মাত্রই

www.pathagar.com

এই দৃশ্যদেখে পানির উৎসের চারিদিকে এক বালির বাঁধ দিয়ে বললেন 'জমজম' অর্থাৎ থেমে যাও। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহর নবী করিম (দঃ) বলেছেন যে, বিবি হাজেরা যদি বালির বাঁধ দিয়ে জমজমের পানিকে আবদ্ধ করে না রাখতেন তা হলে এই পানিতে গোটা দুনিয়া সয়লাব হয়ে যেত। এই সেই জমজম কূপ, বিশ্ব মুসলিমের জীবনামৃত, আবে কাওসার।

পরে কিন্তু সারার গর্ভে ও একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম ইসহাক। কাবা নির্মিত হবার পর সা'রা শিশুপুত্র ইসহাককে নিয়ে মক্কায় এসে কাবায় হজ্ব করে যান। কাবা নির্মাণের পূর্বেই বিবি হাজেরার মৃত্যু হয় এবং হাতিমের সন্নিকটে কবরস্থ করা হয়। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দুই স্ত্রীর গর্ভজাত এই দুই পুত্র হযরত ইসমাইল ও হযরত ইসহাক। তাঁরা ও নবী ছিলেন। হযরত ইসহাকের বংশ পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মুসা (আঃ)। তাঁরই উন্মত বর্তমান বিশ্বের ইহুদী সম্প্রদায় এবং হযরত ইসমাইলের বংশে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মুহম্মদ (দঃ)। আল্লাহ পাক তাঁরই মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং তাঁর পর এযাবৎকাল আর কোন নবী জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেয়ামত পর্যন্ত করবেন ও না।

কাঁচের বাইরে থেকে দেখলাম ইসমাইলের স্মৃতি বিজড়িত পূতঃ পবিত্র এই জমজম কূপ। একদিন ছিল যখন চর্মনির্মিত মশক নিয়ে এর চারিদিকে ভীড় জমাতো অসংখ্য ভেস্তী। দড়িতে বালতি বেঁধে কূপ হতে পানি তুলে হাজী সাহেবানরা পান করতেন আর দেশে নিয়ে যেতেন। ভেস্তীরা মশক ভর্তি করে "মুইয়া" "মুইয়া" শব্দে গোটা মসজিদুল হারাম মুখরিত করে রাখত। পয়সার বিনিময়ে হাজী সাহেবানরা তাদের কাছ থেকে পানি পান করত। আবার কেউ কেউ পুন্য লাভের আশায় আবার অনেকে পরলোকগত মাতা পিতা ও অন্যান্য মুরব্বী গণের রুহে ইছালে সওয়াব প্রেরণের উদ্দেশ্যে মশক ভর্তি সমুদয় পানি একত্রে ক্রয় করে উপস্থিত সকল হাজীদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতেন। সেদিন আর নেই। আজ সেই মশক ও নেই। সেই ভেস্তী ও নেই। নেই সেই পুন্য হাসিলের প্রবণতা। মসজিদুল হারামের উন্মুক্ত চত্বরে এমনকি বাহিরের চারিদিকে ও ডানে বাঁয়ে একটু হাত বাড়ালেই কলের মুখে এবং মসজিদের অভ্যন্তরে ড্রামভর্তি বরফ শীতল জমজমের পানি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কাবার মত জমজম কূপের ও রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। কাবার ইতিহাসের সাথে জমজমের ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কালক্রমে বাদশাহ জোরহাম কাবাগৃহের শাসন ভার প্রাপ্ত হলে তিনি জমজমের কৃতিত্ব লাভ করেন। পরবর্তীকালে বনিখোজা গোত্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বাদশাহ জোরহাম সগোত্রীয় লোকজন নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন। এই সময়ে জোরহাম গোত্রের লোকেরা জমজম কূপের ভিতর নানারূপ আবর্জনা, মাটি ইত্যাদি ফেলে কূপটিকে নষ্ট করে দেয়। পরবর্তীকালে বন্যার পানিতে ডুবে গেলে কূপটির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

www.pathagar.com

দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হবার পর কোরাইশ বংশ কাবাগৃহের শাসনভার লাভ করেন। হজ্বের সময় হজ্বযাত্রীদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব অর্পিত ছিল হযরত (দঃ) এর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের উপর। হযরত (দঃ) যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন সে বৎসর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি আবরাহা বাদশাহ কাবা ধ্বংস করতে এসে আল্লাহর হুকুমে সকল সৈন্য সমেত আবাবিল পক্ষীর পাথর নিক্ষেপে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া, অপরটি হাজীদের পানি সরবরাহের নিমিত্তে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আবদুল মোত্তালিবের জমজম কূপ পুনঃ খনন। কূপের উৎস প্রাপ্ত হয়ে আবদুল মোত্তালিব মানত অনুযায়ী স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পিতা) কে বলি দিতে উদ্যত হন। পরে কোরাইশগণ নিষেধ করলে সকলের পরামর্শ অনুযায়ী ২০টি উট উৎসর্গ করে মানত পূর্ণ করলে হযরত (দঃ) এর পিতা আবদুল্লাহর জীবন রক্ষা পায়। এ দুটি ঘটনায় আরবদের মধ্যে আবদুল মোত্তালিবের প্রভাব প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিলো। এ সময়ে মক্কার শাসন, কাবার তত্ত্বাবধান, হজ্বের সময় হাজীদের খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি সরবরাহ ইত্যাদির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল কোরাইশদের উপর এবং ইহা তাদের জীবিকার্জনের প্রধানতম উৎস ছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং কাবার কতৃত্ব হারিয়ে ফেলার আশংকায় ইসলামের আবির্ভাবের সময় কোরাইশগণ ইহার ঘোর বিরোধীতা করেছিলেন।

ইতিহাস বলে জমজম কূপের ভিতর তিনটি উৎস বা ঝর্ণা আছে। এই ঝর্ণা থেকে দ্রুত বেগে পানি উৎসারিত হচ্ছে। এই উৎস তিনটির একটি হচ্ছে হাজরে আসওয়াদ বা কাবার তলদেশ। অপরটি হচ্ছে আবু কোবাইশ ও ছাফা পাহাড় বরাবর। তৃতীয় উৎস মুখ হচ্ছে মারওয়া পাহাড়ের তলদেশ। একদা কূপে পতিত জনৈক নিগ্রো দাসীর জীবন রক্ষার্থে কূপের পানি নিষ্কাশন করা হলে এই ৩টি উৎসই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। বর্তমান সৌদি সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৩৯৯ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের ১৭ থেকে ২৫ তারিখ এক সপ্তাহ কাল ধরে জমজম কূপ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এই পরিচ্ছন্নতা কমিটির সভাপতি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ইয়াহিয়া কোসা। তাঁরই উপস্থিতিতে যে দুজন ডুবুরী জমজম কূপের ভিতরে নামেন তারা আবু কোবাইশ বা সাফা পাহাড় এবং হাজরে আসওয়াদ বা কাবা শরীফ বরাবরে দুটি উৎস হতেই অতিবেগে পানি উৎসারিত হতে দেখেন। অপর উৎসটি তাঁরা দেখতে পাননি। খুব সম্ভবতঃ অপর উৎসটি আরো গভীরে চলে গেছে। অথবা অন্য কোন রূপে ভরাট হয়ে গেছে। ৪০ ফুট নীচে ডুবুরীগণ পানির উৎসের শেষ সীমারেখা দেখতে পান। তার নীচে ২০ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় কূপের চতুর্দিক থেকে অতি দ্রুতবেগে পানি উপরের দিকে উতলে উঠছে। তার নীচে ৫২ ফুট দীর্ঘ এবং সাড়ে ২৫ ফুট প্রস্থ একটি পাথর আছে। ঐ পাথরে গোলাকার একটি গর্ত আছে। গর্তটির নীচের দিকের মুখ বন্ধ। উৎস থেকে উপরের দিকে উৎসারিত পানি এই গর্তে এসে জমা হয়। এটাকে ডুবুরীরা জমজমের পানির সংরক্ষণাগার বলে অভিহিত করেন। এই গর্তটি লাল রঙের। তার মধ্যখানে আরবী অক্ষরে, 'বি-ইজনিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে শব্দটি লেখা আছে।

www.pathagar.com

ডুবুরীরা জমজম থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত আবর্জনা উৎরে ফেলেন। তার পরিমাণও ১০০ বড় বস্তার সমান হবে। এই আবর্জনার মধ্যে পুরাতন মুদ্রা, থালা, বাসন, পেয়ালা ও নানাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এগুলো হাজী সাহেবানরা যুগ যুগ ধরে বরকত হাসিলের নিয়তে এই কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। বর্তমানে এগুলো মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে একটি যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

জমজম পরিচ্ছন্নতা অভিযানকালে তার ভিতরের দৃশ্যমান বস্তুসমূহ চিত্রায়িত করে রাখা হয়েছে। তবে উৎস মুখ দিয়ে উৎসারিত পানি অত্যন্ত দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসার ফলে সেখানে একটা ধোঁয়াটে অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে ছবি তুলতে ডুবুরীরা যথেষ্ট বেগ পায়। তাই বিশেষ লাইটের ব্যবস্থা করে জমজমের ভিতরের ছবি তোলা হয়। এই ছবিগুলি ও যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

এই জমজম কূপের পানি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও বরকতময় পানি। হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর বাল্যকালে তাঁর 'সক্ষে সদর' বা বক্ষবিদারণ কালে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এই জমজমের পানি দিয়ে হযরত (দঃ) এর কলব ধৌত করেছিলেন। আম্বিয়া, আউলিয়া ও বুজুর্গানগণ এই কূপের পানি পান করে তৃপ্ত হন। হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) এই জমজমের পানি বোতলে ভরে মদিনায় নিয়ে যেতেন। রসুলে করিম (দঃ) ও তাই করতেন বলে বর্ণিত আছে। সম্ভবত তাঁরই অনুকরণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হাজী সাহেবানরা বিভিন্ন রকমের পাত্রে ভরে নিজ নিজ দেশে এই পবিত্র আবে জম জম নিয়ে যান। পাত্রে ভরার সুবিধার জন্য বর্তমান সরকার হারাম শরীফের বাহিরে নল বা পাইপ লাইনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন সাইজের পাত্রে ভরে অতি আগ্রহ সহকারে হাজী সাহেবরা এইখান থেকে পানি ভরে নিজ নিজ দেশে বয়ে নিয়ে যান।

রসুল করিম (সঃ) জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতেন এবং পানি পান করে দোয়া পাঠ করতেন। হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) হতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুজুর করিম (দঃ) এরশাদ করেন যে, "জমজম পবিত্র, এই পানি শুধু পানীয় নয় বরং খাদ্যের অংশ এবং ইহা পুষ্টিকর"। আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "এই পানিতে রোগ নিরাময় হয়।" আরেকটি হাদীসে আছে হুজুর করিম (দঃ) বলেছেন "আমি এই পানি পান করিতেছি। এই পানি যে যেই নিয়তে পান করিবে তাহার সেই নিয়ত পুরা হইবে।" অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ জমজমের পানির গুণাগুণ রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁদের মতে হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের সমর্থন পাওয়া যায়। জমজমের পানি ক্ষুদার খাদ্য, পিপাসার পানীয় এবং রোগের ঔষধ। জমজমের পানি আজ অবধি কোন রূপে কলুষিত হয়নি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেক সুক্ষ্ম অনুসন্ধানে ও জমজমের পানিতে কোনরূপ জীবাণু বা মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর কোন বস্তু বা ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া যায়নি। এই পানিতে আছে ক্যালসিয়াম, খনিজ পদার্থ এবং আরো নানাবিধ উপাদান, যাহা আল্লাহ পাক খাস নেয়ামত হিসাবে মানব জাতিকে দান করেছেন। জমজমের পূতঃ পবিত্র পানি তৃপ্তিভরে আকণ্ঠ পান করে হৃদয় ভরে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাই আল্লাহ পাকের দরবারে।

www.pathagar.com

ছাফা মারওয়া

অতঃপর জমজম কূপ হতে বেরিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে মসজিদুল হারামের ইমারতের ভিতর দিয়ে "বাবুস্‌সাফা" দিয়ে বেরিয়ে এসে উপস্থিত হলাম সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী সা'ঈর স্থানে। এই স্থানটি মসজিদুল হারামের বহির্দ্বারের সাথে সংলগ্ন। বহিঃদরজাটি সাফা পাহাড়ের দিকে ও সন্নিকটে বলে ইহার নাম বাবুস্ সাফা। সেখান থেকে ডান দিকে কিছু দূর অগ্রসর হলে পাওয়া যায় সাফা পাহাড়। এই সাফা পাহাড় হতে উত্তর পূর্ব দিকে কোণাকোণি মসজিদুল হারামের সীমানা পেরিয়ে আরো কিছুদূরে অবস্থিত মারওয়া পাহাড়। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথটি কোণাকোণি দক্ষিণ পূর্ব কোণ থেকে উত্তর পূর্ব দিকে চলে গেছে। দু'ধারে দুটি মার্বেল বিছানো প্রশস্ত পথ। একটি পথ দিয়ে সাফা হতে মারওয়ায় যেতে হয়। অপরটি দিয়ে মারওয়া হতে সাফায় আসতে হয়। এই দুই পথের মধ্যখানে দু'দিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা আরেকটি দ্বিধাবিভক্ত দ্বিমুখী অপ্রশস্ত পথ। এই পথে পংগু, দুর্বল ও রোগগ্রস্থ হাজীগণ চাকাযুক্ত চেয়ারে বসে সাফা মারওয়ায় সাঈ করেন। এখানে এরূপ বিস্তর হুইল চেয়ার ও চেয়ার ঠেলে নিবার লোক পাওয়া যায়। পয়সার বিনিময়ে এই লোকেরা মাজুর হাজী সাহেবকে চাকাযুক্ত চেয়ারে বসিয়ে পিছন দিক থেকে ঠেলে দৌড়ে সাঈ করাইয়া থাকেন। যেমন কাবা তাওয়াফকালে দোলনায় বসিয়ে কাঁধে করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করা হয়। সাফার এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈ অর্থাৎ ছুটাছুটি বা দৌড়াদৌড়ি করার ঐ পথটি বর্তমানে সমতল। উভয় পাহাড়ের গ্রীবাদেশ সংযুক্ত করে এই সমতল পথ তৈরী করা হয়েছে। এই সমতল পথের দক্ষিণ প্রান্তে এসে দেখতে পেলাম সাফা পাহাড়ের শীর্ষ দেশ। সমতল স্থান হতে সাফা পাহাড়ের শৃঙদেশ ১৫/২০ ফুটের বেশী উঁচু হবে না। উত্তর দিকে অপর প্রান্তে মারওয়া পাহাড়ের উচ্চতা ও একই রূপ। পাহাড়ের চিহ্ন হিসাবে এইটুকু স্থান উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। পাহাড়ের এই শীর্ষ দেশ দুইটিতে বড় বড় কঠিন পাথর খন্ড শক্তভাবে লেগে আছে। সেই পাথরের উপর পা রেখে উঠে গেলাম সাফা শৃঙে। কাবার দিকে মুখ ফিরালাম, দেখলাম কাবা অনেক নীচে। নিয়ম অনুযায়ী নিয়ত ও দোয়া পাঠান্তে মারওয়া পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলাম। অনুমানিক ৭৫ ফুটের মত অগ্রসর হয়ে দেখলাম উপরের দেয়ালে আনুমানিক ৬০ ফুটের মত স্থান দুদিকে সবুজ টিওব লাইট দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এই স্থানটিকে বলা হয় "মিলাইনে আখযারাইন"। এই স্থানটাই প্রকৃতপক্ষে সাফা ও মারওয়ার পাদদেশের মধ্যবর্তী সমতল উপত্যাকা। বিবি হাজেরা দুই পাহাড়ে ছুটাছুটি করার সময় এখান থেকে শিশুপুত্র ইসমাইলকে দেখা যাচ্ছিল না বলে দ্রুত পদচারণা করেছিলেন। তাই এইস্থানটিকে সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এই ৬০ ফুট পরিমাণ স্থানে হাজী সাহেবানরাও বিবি হাজেরার অনুকরণে দ্রুত বেগে পদচারণা করে থাকেন। তবে এইপ্রথা মহিলা হাজীদের বেলায় প্রযোজ্য না হওয়ায় এই স্থানে আমার বেগে দৌড়ানোর কারণে বুলবুল পেছনে পড়ে গেল। চিহ্নিত স্থান অতিক্রম করে পদাচারনার বেগ কমিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই দেখি বুলবুল খুব বেশী দূরে নয়। সেও যথাসাধ্য আমাকে অনুসরণ করে চলছে। এই স্থানটা

www.pathagar.com

বাদ দিলে বাকী সব স্থানে হাতের মুঠোর মধ্যে তাকে জড়িয়ে রাখি–জনতার ভীড়ে হারিয়ে যাবার আশংকায়। এভাবে মারওয়া পাহাড়ের গোড়ায় এসে পৌছলে পাথর বেয়ে শৃঙে আরোহণ করলাম। বুলবুলকে নিয়ে দুজনে পর্বত শৃঙে পাশাপাশি দু'টি উপল খন্ডের উপর কিছুক্ষণের জন্য আসন গ্রহণ করলাম। স্বাভাবিক ভাবেই এ সময়ে মনের পর্দায় ভেসে উঠল–সাথে দেয়া আহার্য, পানীয় নিঃশেষ হয়ে গেলে শিশু পুত্র ইসমাইল পানির জন্য কাতরাতে কাতরাতে অস্থির হয়ে পড়লে স্নেহময়ী জননী পানির অন্বেষায় এই দুই পাহাড়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে, অস্থির ভাবে, পাগলিনীর মত দৌড়াদোড়ি শুরু করেন। পুত্রের জীবন রক্ষার্থে মহিয়ষী এই নারীর এই দুই পাহাড়ের শৃঙদেশে ছুটাছুটি আল্লাহর কাছে এতই পছন্দনীয় হয়ে যায় যে, এই ছুটাছুটি আল্লাহ পাক আজ পর্যন্ত জারী রেখে দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। শিশু পুত্রের জীবন রক্ষার্থে আল্লাহর দরবারে মায়ের কাতর ফরিয়াদ কবুল হয়ে যায়। বিবি হাজেরা তাই শিশু পুত্রের কাছে এসে দেখেন ইসমাইলের কচি পায়ের মৃদু আঘাতে কঠিন পাষাণের বুক চিরে স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে। দুনিয়ার সকল অনাগত মানুষের জন্য বিবি হাজেরা তার চারদিকে বাঁধ দিয়ে ঐ ঝর্ণাধারাকে জমজম অর্থাৎ আবদ্ধ করে রাখলেন। কাহিনীটি বুলবুলকে বললে সে তাহা জানে বলে হালকা ভাবে জবাব দিল। জানবারই কথা, দুনিয়ার সকল মুসলমান কমবেশী এই ঘটনার কথা জানে। কিন্তু যখন বললাম বিবি হাজেরা আমাদের মত এইরূপ সমতল পথ ধরে দৌড়াদৌড়ি করেননি। অঙ্গুলি সংকেতে তাকে দূরে অনেক নীচে কাবার তাওয়াফের স্থান দেখিয়ে বললাম সাঈ পথের মধ্যবর্তী সবুজ বাতির নীচে কাবার ভিটি ভূমির একই সমতলে সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী সমতল উপত্যকা। অত নীচের উপত্যকা ভূমি হতে আমরা যে পাহাড়ের শৃঙে বসে আছি বিবি হাজেরা দৌড়ে এই পাহাড়ের উপর উঠেছেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছেন, কোন জন মানব দেখা যায় কিনা, কোথাও পানির সন্ধান মিলে কিনা। না পেয়ে দ্রুত বেগে নেমে গেছেন নীচের দিকে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল উপত্যকা ভূমি অতি দ্রুতবেগে পেরিয়ে অপর পাহাড় বেয়ে তার শীর্ষদেশে উঠে আবার চারিদিকে দৃষ্টি মেলে দেয়। পানির সন্ধান না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে সে পাহাড় থেকে নেমে আবার উঠে আসেন এই পাহাড়ে, যেখানে আমরা বসে আছি। বুলবুলকে বললাম তুমি চাঁটগেঁয়ে মেয়ে, পাহাড়ের দেশের লোক। অন্যরা না বুঝলেও পাহাড়ে উঠতে কত কষ্ট তা তোমার বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। সমতল পথ একবার হেঁটে এসে তুমি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছ এই শিলা খন্ডের উপর। অথচ বিবি হাজেরা এই পাহাড়ের অত নীচের পাদদেশ হতে এত উঁচু পর্যন্ত শীর্ষে উঠানামা করেছিলেন অতি দ্রুত বেগে কেবলমাত্র পুত্র স্নেহে অভিভূত হয়ে। তখন বুলবুল বিবি হাজেরার ছুটাছুটি আর আমাদের সমতল পথে হাঁটার পার্থক্যটা অনুধাবন করতে সক্ষম হল। সে প্রশ্ন করলো আমরা যে পথ দিয়ে সাঈ করছি তার নীচে কি? বললাম এটা হল বর্তমান সৌদী সরকারের অবদান। দুই পাহাড়ের নীচের পাদদেশ হতে উর্দ্ধে শৃঙ শীর্ষে উঁচু নীচুতে ছুটাছুটি করতে হাজীদের দারুণ তকলিফ হতে দেখে বাদশাহ ফয়সলের দিলে রহম পয়দা হয়। তাই তিনি ছাফা মারওয়া দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান উপরের দিকে সাঈর

www.pathagar.com

এই পথ পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভরাট করে দেন এবং দুপাশে ইটের দেওয়াল দ্বারা আবদ্ধ করে দেন এবং দুই পাহাড়ের শীর্ষদেশের আনুমানিক ১৫/২০ ফুট নীচে গ্রীবাদেশে সংযোগ করে সাঈর জন্য পাকা ঘরের ছাদের ন্যায় সমতল এই পথটি নির্মাণ করেন। সমাগত দর্শনার্থীদের উপলব্ধির জন্য বা ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসাবে অবলোকনের জন্য এই শৃঙ দেশটি, যেখানে আমরা বসে আছি এবং ঐ দিকে অনুরূপ ভাবে অপর একটি, এই শৃঙ দু'টিকে প্রতীক হিসাবে রেখে দিয়েছেন। জবাবে বুলবুল ব্যাপারটা সঠিক হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তার উত্তর আমি দিতে পারিনি। শুধু এইটুকুন বলেছি যে, আমাদের এই সাঈ বা দৌড়াদৌড়ি বিবি হাজেরার সাঈর হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। বিবি হাজেরা পাহাড়ের উঁচু থেকে নীচুতে আবার নীচু থেকে উঁচুতেই সাঈ করেছিলেন আর বর্তমানে আমরা সউদী নির্মিত সমতল পথের উপর দিয়েই তা করে থাকি।

সাফা ও মারওয়া দুইটি স্বতন্ত্র পাহাড় নয়। ১২৭৫ ফুট উঁচু কোবাইশ পাহাড়ের একটি শৃঙ এবং তারই পাদদেশে অবস্থিত সাফা। মারওয়া পাহাড়টি ১৩০৫ ফুট উঁচু 'জবলে হিন্দ' বা হিন্দ পাহাড়ের পাদদেশে উক্ত পাহাড়ের আরেকটি শৃঙ। এই দুটি পাহাড়ের পরস্পরের দূরত্ব ৭৫০ ফুট। আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে পৌত্তলিক কোরাইশরা 'উলাফ' ও 'নাইলী' নামে দুটি মূর্তি এই দুই পর্বত শৈলে প্রতিষ্ঠা করে তাদের পূজা করত এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পদচারণা করত। অতএব এই সাফা মারওয়ায় আরোহণ করা এবং তদ মধ্যবর্তী স্থানে পদচারণা করা পৌত্তলিকদের অনুসরণ মনে করে মুসলিম জনগণ ইহাতে অনীহা প্রকাশ করে এবং কুণ্ঠাবোধ করে। মদিনা বাসী আনসারগণ বিশেষ ভাবে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাকের তরফ হতে কোরানের এই আয়াতটি নাজেল হয়–"ইন্নাস্‌সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ ইরিলা ফামান হাজ্জাল বাইতা––" অর্থাৎ "সাফা মারওয়া দুই পাহাড় আল্লাহর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। অতএব যাহারা হজ্ব বা ওমরাহ করিবে তাহাদের এই দুইটি পাহাড়ে তাওয়াফ করিতে হইবে ঃ তাহাতে তাহাদের গুণাহ হইবে না বরং নেকী হইবে। যাহারা খুশীর সহিত পুণ্য কাজ করিবে তাহাদিগকে আল্লাহ পুরস্কৃত করিবেন। আল্লাহ সবকিছুই জানেন এবং নেক্‌কারদের কদর করিয়া থাকেন।" এইভাবে আল্লাহ পাক হযরত হাজেরার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য সাফা মারওয়ার সাঈকে ওয়াজীব করেছেন এবং সমাগত সকল তীর্থযাত্রীরা আগ্রহ ভরে হযরত হাজেরার মত উদ্বীগ্ন চিত্তে এই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বর্তমান সমতল পথে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসাবে ছুটাছুটি করেন।

নবীজির জন্ম গৃহ

একদিন সাফা মারওয়া সাঈ শেষে বেরিয়ে উপস্থিত হলাম মৌলিদুন্নবীতে অর্থাৎ নবীজির জন্ম গৃহে। ইহাই সেই পাক পবিত্র পুন্য স্মৃতিবাহী গৃহ যেখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সরওয়ারে কায়েনাত, সর্দারে দোজাহান হযরত মুহম্মদ (দঃ)। এই গৃহেই বাস করতেন হুজুর (দঃ) এর আব্বাজান আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিব।

www.pathagar.com

হুজুর (দঃ) এর আম্মাজান আমিনার কোল আলোকিত করে এই গৃহেই ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার হযরত (দঃ) ভূমিষ্ট হন। হযরত খদিজার (রাঃ) সাথে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত ২৫ বৎসর কাল হুজুর (দঃ) এই গৃহে বসবাস করেন। সুতরাং ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলেও এই গৃহের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আবার ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনসাধারণের আবেগ অনুভূতির দিক থেকে বিচার করলেও এই গৃহের গুরুত্ব সমধিক। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এবং পূতঃ পবিত্র এই গৃহের দিকে তাকালে মনে হয় না যে সরকার এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে অনুরূপ কোন গুরুত্ব আদৌ দিয়ে থাকেন। এই গৃহটি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে রক্ষিত। কেমন যেন দায়ে ঠেকা গোচের। মূল সড়ক থেকে একটু নীচে একটি সাধারণ গৃহ, দরজা জানালা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ। বাহির থেকে উঁকি মেরে ও ভিতরে কিছু দেখবার উপায় নেই। কেউ বলে না দিলে এই গৃহই নবীজির (দঃ) জন্মস্থান একথা বুঝবার কোন উপায় নেই। ঘরটির বাইরে একটি সাইন বোর্ড আছে। আরবীতে ওজরাতুল হজ্ব ওয়াল আওকাফ, মক্তব, মক্কা মোকাররমা শব্দ কয়টি লেখা। বলা হয়েছে এখানে বর্তমানে একটি কুতুবখানা বা গ্রন্থালয় স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বাহির থেকে উঁকি মেরে ও ভিতরের অবস্থা দেখতে পারিনি। সে ব্যবস্থা সৌদী সরকার রাখেননি, খুব সম্ভবতঃ দর্শনার্থীরা ভাবাবেগে শরীয়তের পরিপন্থী কোনরুপ শিরিক বা বেদাত করে বসতে পারেন এই কারণে। নেহায়েত বিলীন করা সম্ভব নয় বলেই এই অবস্থাতেই পুন্যময় ঐতিহাসিক এই স্মৃতিটিকে রক্ষা করা হয়েছে। রাস্তার মধ্যে কয়েকজন ফটোগ্রাফার বগলে একটি থলেতে ভরে পলোরেইড ক্যামেরা নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। দৃষ্টি কিন্তু এদের বিহবল। কেননা হঠাৎ পুলিশ যদি দেখে ফেলে ক্যামেরাতো হারাবেই শ্রীঘর নিবাস অনিবার্য। কোন কোন দর্শনার্থী স্মৃতি হিবাবে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে এই ঘরটিকে পেছনে পটভূমিকায় রেখে স্বীয় ছবি তুলছেন। তিন মিনিটের মধ্যেই ফটোগ্রাফার পাঁচ রিয়ালের বিনিময়ে ছবিটি সরবরাহ করে দিচ্ছে।

এই মৌলিদুন্নবী বা আবদুল্লাহ আমিনার ঘরটি কাবা শরীফ হতে সোজা পূর্বদিকে অবস্থিত। সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল উপত্যকা ভূমির মধ্য দিয়ে এই ঘর থেকে সোজা নবীজি, তাঁর পিতা এবং তৎপূর্বে পিতামহ আবদুল মোত্তালিব এঁরা সকলেই কাবা ঘরে আসা যাওয়া করতেন। সেই পথ আজ রুদ্ধ। সেই উপত্যকা ভূমি ও আজ আর নেই। আজ যেতে হলে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে সৌদী নির্মিত সাঈর জন্য সমতল রাস্তা পেরিয়ে আবার সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে কাবাগৃহে যেতে হয়। হেরেম শরীফের বাহির থেকে সাফা মারওয়া পর্বত ও আর দেখা যায় না। এই ঘরের চত্বরেই ছিল নবীজির পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের বাস গৃহ। কিন্তু তার কোন অস্তিত্ব আজ নেই। সাফা মারওয়া থেকে বেরিয়ে শৌচাগারের খোঁজ করলে একজন দেখিয়ে দিল আবু জেহেলের এই গৃহেই যাও। অর্থাৎ আবু জেহেল যেখানে বাস করত সেই স্থানেই এই আধুনিক শৌচাগারটি নির্মিত। এখানে ও একই কথা, বলে না দিলে বুঝবার কোন উপায় নাই যে এখানে আবু জেহেলের বাসগৃহ ছিল।

www.pathagar.com

মদিনার মতো মক্কায় ও ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা হয়নি। হযরত খদীজার (রাঃ) গৃহটির ও সেই একই অবস্থা। এই গৃহে বিবাহের পর হতে মদিনায় হিজরত পর্যন্ত নবীজি জীবনের ২৮টি মূল্যবান বৎসর কাটিয়ে ছিলেন। এই গৃহেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী। এই গৃহের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে জড়িত নবীজির জীবন, ইসলামের ইতিহাস। এই গৃহেই নবীজির শয্যায় হযরত আলীকে রেখে, হযরত (দঃ) হিজরত করেছিলেন ইয়াস্রেবের পথে। এই গৃহেই নবীজিকে হত্যা করবার জন্য কোরাইশরা প্রবেশ করেছিল নগ্ন তরবারী হাতে। কিন্তু পেয়েছিল নবীজির শয্যায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চিন্তে শ্বেত বস্ত্রাবৃত অবস্থায় শায়িত হযরত আলীকে। এই গৃহটিকে ও বিলুপ্ত করা হয়নি। তবে কেউ বলে না দিলে বুঝবার কোন উপায় নেই যে এটি বিবি খদিজার (রাঃ) সেই ঐতিহাসিক বাসগৃহ। আমিতো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করাতে, এমনকি কয়েকজন কারের ড্রাইভারকে বলাতে ও তারাও বলতে পারলো না যে খদিজার (রাঃ) গৃহ কোথায়। অন্য নামে পরিচিত কিনা তা অবশ্য জানতে পারিনি। মোদ্দা কথা ইতিহাসের দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করে এই সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান সমূহকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বরঞ্চ এই সমস্ত স্থানে আবেগের আতিশয্যে কোনরূপ শরীয়ত বিরোধী কার্যাদি যাতে অনুষ্ঠিত হতে না পারে তৎ প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

মিনা

দেখতে দেখতে আইয়ামে তশরিক এসে গেল। ৯ই জিলহজ্ব থেকে ১৩ই জিলহজ্ব পর্যন্ত দিন সমূহকে আইয়ামে তশরিক বলা হয়। হজ্বের যাবতীয় আহকাম এই দিন সমূহেই পালন করতে হয়। ৮ই জিলহজ্ব তারিখ হতে মিনায় অবস্থান করে ১৩ই জিলহজ্বের মধ্যে হজ্বের সকল অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়ে যায়। তৎপর হতে শুরু হয় স্বদেশ যাত্রার পালা। এতদিন ধরে আমরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত ছিলাম এই দিন সমূহের জন্য। এই দিন সমূহে মিনা, আরাফাত ও মোজদালেফার ধূসর প্রান্তর সমূহ "লব্বাইকা আল্লাহুম্মা লব্বাইক' রবে মুখরিত থাকে। আল্লাহর একত্বকে মনে প্রাণে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করে, আল্লাহর দরবারে সকাতর হাজিরা প্রদান করার জন্য সকল হাজীগণ ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এইখানে এই সময় হাজী সাহেবানরা পার্থিব সকল বস্তু এবং নিজের সকল স্বত্বার উপর আল্লাহর প্রভুত্বকে, আল্লাহর শ্রেষ্টত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে একমাত্র মাবুদ মহাপ্রভু আল্লাহর সামনে নিজেকে উজাড় করে সঁপে দেয়ার শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ এবং তা আজীবন পালন করবার ব্রত গ্রহণ করেন।

হুদা সাহেব, হাদী সাহেব, নাদেরুজ্জামান সওদাগর ও আমি সকলে বিবিগণসহ বাসায় পরামর্শ করে ঠিক করলাম ৭ই জিলহজ্ব রাত্রেই আমরা মিনার পথে রওয়ানা হব। ৮ তারিখ সকালে গেলেও চলে। কারণ মিনায় অবস্থানের সময় হল ৮ই জিলহজ্ব জোহর থেকে পরের দিন সকালের ফজরের নামাজ পর্যন্ত। বিলম্বে গেলে মোয়াল্লিমের তাঁবুতে সুবিধাজনক স্থান পাওয়া দুরুহ বিবেচনায় তড়িঘড়ি করে আগে ভাগে যাওয়ার একটা প্রতিযোগিতা প্রায় সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

খুব হালকা বিছানা পত্র এবং অতীব প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও বস্তু সমূহ একটি হেভারচেকে ভরে কাঁধে তুলে নিয়ে ৭ই জিলহজ্ব রাতের আহারাদি শেষ করে মিনার পথে রওয়ানার উদ্দেশ্যে মোয়াল্লিমের দফতরের সম্মুখে এসে আট জনই হাজির হলাম। দেখলাম মোয়াল্লিমের কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। মোয়াল্লিম বা তার লোক জনের কারো টিকিটি ও দেখা যাচ্ছে না। কোন বাস কতক্ষণে ছাড়বে, কোনটাতে আমাদের যেতে হবে, এসব নির্দেশ দেবার মত কোন লোকজন আশ পাশে পেলাম না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, রাস্তার পাশে ফুটপাথে। বসার কোন স্থান নেই। মক্কা হতে ৩ মাইল দূরে এই মিনা প্রান্তরে পায়ে হেঁটে যেতে ও একঘন্টার বেশী সময় লাগে না। অধুনা নির্মিত সুড়ঙ্গপথ আর ও সংক্ষিপ্ত। অনায়াসে পৌছা যায় আরও স্বল্প সময়ে। কিন্তু মনে হল এই ৩ মাইল পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ার অপেক্ষায় কত ঘন্টা বা দিন সপরিবারে এই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার কোন হদীস মিলছেনা। এমতাবস্থায় জামাতা জাহাংগীর একখানা জি,এম,সি, গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে এল এবং সকলকে সেই গাড়ীতে উঠতে আহবান জানাল। আমরা সকলে সে গাড়ীতে উঠে বসলাম। বুঝলাম বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে মোয়াল্লিমকে আমাদের দেয়া এ পথের গাড়ী ভাড়া গচ্ছা গেল। তবু ও ভালো লাগল, কিছু পয়সা অতিরিক্ত গেলেও ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকার জিল্লতি থেকে রেহাই পেলাম বলে।

গাড়ী যাত্রা করল বটে, কিন্তু ৩ মাইলের সোজা পথ ধরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। কেননা বিভিন্ন প্রকারের যানবাহনে এই পথ জাম হয়ে আছে। সেই পথে ৩ ঘন্টায়ও ৩ মাইল পথ অতিক্রম করার আশা দুরাশা দেখে গাড়ীর চালক ভিন্ন পথে তিন তিরিক্কা নয় মাইল পথ ঘুরে মক্কার উপকণ্ঠে মিনায় এসে উপস্থিত হল। বাংলাদেশ মিশন অফিসের সম্মুখে গাড়ী নিয়ে যেতে বললে সে এদিক সেদিক কিছু ঘুরাঘুরি করে সেটা বের করতে না পেরে অবশেষে একস্থানে এক রকম জোড় করেই আমাদের নামিয়ে দিল। অন্যান্য সময়ে ও দেখেছি গাড়ীর চালকেরা নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান খুঁজে বের করার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করে না। সঠিক স্থানের নাম বলতে পারলে এবং সেটা তার জানা থাকলে ঠিক সে স্থানে এসে নামিয়ে দেবে। নইলে ডানে বাঁয়ে একটু ঘুরাঘুরি করে এক স্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে এবং পয়সা দিয়ে নেমে যেতে বাধ্য করে। এখানে ও তাই হল। আমরা নেমে নিকটবর্তী একজন পুলিশের কাছ থেকে পথ নির্দেশ নিয়ে, গাট্টি পুট্‌লি কাঁধে–বগলে নিয়ে সে দিকে পদব্রজে কিছুদূর গিয়েই দেখলাম–পত্ পত্ করে উড়ছে টক্‌টকে লাল সূর্য খচিত বাংলাদেশের সবুজ পতাকা। এ পথটা হেঁটে আসতে আমাদের তেমন কষ্ট হয়নি। সামান্য পথ, কষ্ট হবার কথা নয়। তবে এই সঠিক স্থানটি খুঁজে বের করে আমাদের তথায় নামিয়ে দেয়াটা আমাদের গাড়ীর চালকের জন্য মোটেই কষ্টকর ছিল না। এখানে প্রত্যেক মোয়াল্লিম নিজ নিজ হাজী সাহেবানদের জন্য আগে থেকে তাঁবু টাঙ্গিয়ে রেখেছেন এবং প্রত্যেক মোয়াল্লিমের তাঁবুর মাঝামাঝিতে পরিস্কার বাংলায় ও আরবীতে মোয়াল্লিমের নাম লিখে ক্ষুদ্রাকৃতির হালকা গেট দেয়া আছে। সুতরাং আমাদের মোয়াল্লিম সফিরুদ্দিনের গেট দিয়ে আমরা শিবিরে প্রবেশ করলাম।

www.pathagar.com

মধ্যখানে চলাচলের জন্য সরু একটি পথ রেখে দু'পাশে একই রকম দুই সারিতে দীর্ঘ এই শিবির হাজী সাহেবানদের মিনায় সাময়িক অবস্থানের জন্য স্থাপন করেছেন। চারিদিকে মোটা কাপড় দ্বারা ঘেরা এবং মাথার উপরে ও অনুরূপ কাপড়ের একটি আচ্ছাদন। তারই মধ্যে সারিবদ্ধভাবে এক সারিতে অন্ততঃ পক্ষে ৫০ জনের মত অবস্থান করার ঠাঁই আছে এই শিবিরে। যেহেতু আমাদের সাথে মেয়েলোক আছে এবং আমরা আগে ভাগে পৌঁছে গেছি তাই এই তাঁবুর এক পাশে আমাদের পছন্দমত একটি জায়গা বেছে নিতে কষ্ট হল না। মহিলা চার জনের জন্য এক সারিতে বিছানা পেতে নিজেদের কাপড় দ্বারা ঘিরে দিলাম। তার বিপরীত সারিতে আমরা চার জনের জন্য বিছানা পাতলাম। এখানে এরকম সারি সারি অসংখ্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। এক তাঁবু থেকে বেরুলে সঠিক কোন চিহ্ন বা লেখা বা নিদর্শন ঠিক করে না রাখলে নিজ সঠিক অবস্থান হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা ষোল আনা বিদ্যমান। পথিমধ্যে কথায় কথায় একজন হাজী গল্পচ্ছলে বলেছিলেন যে এক নিরক্ষর সিলেটী চাকুরী উপলক্ষে লন্ডন গিয়েছিল। তার বাসায় এবং চাকুরী স্থানের মধ্যে ১০নং বাস চলাচল করে। কিন্তু ইংরেজী 10 সংখ্যাটি সেই সিলেটী বুঝে না এবং চিনে না। তাই সে যেন ভুল কোন বাসে উঠে না যায় সে জন্যে তার সাথী তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে–যে বাসের সম্মুখে এক লগি (বাঁশ) এক আন্ডা (০) লিখা দেখবে সব সময় সেই বাসেই উঠবে। অর্থাৎ যেই বাসের সম্মুখে একটি সোজা দন্ড এবং তার পাশে একটি শূন্য দেখবে সেই বাসে উঠলে কখনো পথ ভুল হবে না। পরবর্তীকালে কিন্তু সেই সিলেটী ভদ্রলোক পড়তে না পারলে ও ইংরেজী ভাষা বলায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। গল্পটি সদ্য শোনা, তাই হুদা সাহেব যখন পেন্সিল নিয়ে তাঁবুর কাপড়ে চিহ্ন দিতে উদ্যত হলেন, তখন হাসতে হাসতে বললাম আপনি ও এক লগি এক আন্ডা চিহ্ন দিন, তা'হলে আমরা নিজ শিবির খুঁজে নিতে বিভ্রান্ত হব না। হুদা সাহেব ও হাসতে হাসতে ইংরেজীতে 10 সংখ্যাটি লিখে চিহ্ন দিলেন এবং মিনায় যে কয়দিন অবস্থান করেছি এই একলগি এক আন্ডা (10) চিহ্ন ধরেই যাতায়াত করেছি।

এই বিরাটাকার তাঁবুটি আবার চারিদিকে ঢেউ টিন দ্বারা ঘেরা। এক এক মোয়াল্লিমের এরূপ এক এক নির্দিষ্ট শিবির। সারা মিনা প্রান্তরে এইরূপ অসংখ্য তাঁবু। আমাদের তাঁবুর একপাশে প্রশস্ত সড়ক। বিভিন্ন মোটর যান সড়কের উভয় পার্শ্বে দন্ডায়মান। এখান থেকে যাতায়াত করে মক্কা আর আরাফায়। আরেক পাশে প্রকান্ড এক শেড। এই শেডটি প্রস্থে আনুমানিক ১২০ ফুট, দৈর্ঘে ২ মাইলের চেয়ে ও বেশী, উচ্চতা আনুমানিক ৪০ ফুট। ১২০ ফুট প্রস্থ এই শেডের উপরে আর, সি, সি, ছাদ। কিন্তু এত উপরে সেই প্রশস্ত ছাদ রক্ষার জন্য মধ্যখানে কোন পিলার বা স্তম্ভ নাই। ফলে নীচের মেঝেটি নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা যায়। এই শেডকে সকলে শেড বললে ও আসলে কিন্তু এটার নাম দেয়া হয়েছে Pedestrian road অর্থাৎ পায়ে হেঁটে চলার রাস্তা। মক্কা, মোজদলেফা, আরাফা হতে যারা পদব্রজে যাতায়াত করে তাদের চলার সুবিধার জন্য পৃথকভাবে ছাদযুক্ত এই সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে। এইশেডের বা সড়কে দুই পাশের পিলার সমূহে আনুমানিক ২৫ ফুট উচ্চে বিরাট

www.pathagar.com

আকারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Air Cooler) ফিট করা আছে। তদুপরি দু'দিকে খোলা থাকায় স্বাভাবিক ভাবে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত হয়। ফলে এই শেড বা রাস্তায় সব সময় একটা শীতল আবহাওয়া বিরাজ করে। ফলে এই শেডের প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগ অংশ হাজী সাহেবানরা বিছানা পেতে দখল করে নেন। নিজ নিজ তাঁবুর মধ্যে প্রত্যেকের স্থায়ী বিছানা থাকলেও আর একটি অতিরিক্ত বিছানা এই শেডের মধ্যে পেতে রাখে। মিনার প্রচণ্ড গরম অসহ্য হয়ে উঠলে সকলেই এই শেডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে পথিকদের চলাচল এর জন্য ২৫/৩০ ফুটের বেশী জায়গা আর থাকে না। আমরা ও কোন ব্যতিক্রম নই। তাই তাঁবুতে স্থায়ী বিছানা পাতলেও এই শেডের মধ্যেও আর একটা এডিশনাল বিছানা পেতে রাখলাম। শেডে পর্দা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে সাথের মেয়েগণকে এখানে এই শেডে আনতে পারিনি। দুপুরের প্রচন্ড গরমে ছটফট করার সময় সাথের মেয়েগণকে একবার এখানে আনলেও পর্দার অভাবে তারা অস্বস্তি প্রকাশ করে এবং ক্ষণকাল পরেই তারা সে স্থান ত্যাগ করে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে গরমে আলু সিদ্ধ হতে থাকে। অথচ দেখেছি আমাদের পাশেই বসে আছে অন্যান্য দেশের মহিলারা। পাকিস্তানী একটি দম্পতিকে ২জন ছোট ছোট শিশু নিয়ে আমাদের পাশে স্থায়ীভাবে আসন পেতে অবস্থান করতে দেখেছি। দেখেছি আরো নানা দেশের মেয়েদেরকে। তারা কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের মত এত লাজুক নয় এবং সম্পূর্ণরূপে স্বামী নির্ভরশীল ও নয়। তাই বলে কারো মধ্যে কিন্তু কখনো কোনরূপ অশালীন আচরণ দেখিনি। একটা শালীনতার মধ্য দিয়ে পূতঃ পবিত্র পরিবেশে সাম্যমৈত্রী ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব বন্ধনে, দুখন্ড শ্বেত বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে সকলেই একই সাথে অবস্থান করছেন এই তাঁবুতে, এই শেডে। সকলেরই কন্ঠে একই ধ্বনি–লব্বাইকা, লাশারিকালাক"।

এই শেডটি অতি সম্প্রতি নির্মিত। ইতিপূর্বে মিনাতে পানি এবং শৌচাগারের উত্তম ব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল। এই মিনাতে হাজী সাহেবানদেরকে স্বয়ং পাক করে খেতে হত। ফলে অজু, গোসল, কাপড় চোপড় ধোয়া, রান্না বান্না করা ইত্যাদি কাজে প্রচুর পানির প্রয়োজন হত। ভেস্তীগণই ছিল এই পানির একমাত্র সরবরাহকারী। পয়সার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে পানি নিয়ে হাজী সাহেবানরা প্রয়োজন মিঠাতেন। মাটিতে সামান্য গর্ত করে চারিদিকে অস্থায়ী ঘেরা দিয়ে নির্মিত হত শৌচাগার। ফলে পরিবেশ হত দূষিত এবং বিরাজ করত অস্বস্তিকর আবহাওয়া। তাই বর্তমান সৌদী সরকার এদিকে বিশেষ ভাবে নজর দেন এবং হাজী সাহেবানদের এই কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে উপরোল্লিখিত বিশাল শেডটি নির্মাণ করেন। এই শেডটির বাম পাশটির বিস্তীর্ণ এলাকা হাজী সাহেবানরা বিছানা পেতে দখল করে রাখেন। চলাচলের জন্য যে রাস্তাটি আছে তা বাদ দিয়ে শেডটির ডান পার্শ্বে নির্মাণ করা হয়েছে এক আধুনিক স্বাস্থ্য সম্মত স্নানাগার ও শৌচাগার। এই শৌচাগারটির আকারও বিরাট। একস্থানে একদিকে ১০ টি এবং বিপরীত দিকে ১০টি এই ভাবে ২০টি শৌচ কক্ষ নির্মিত হয়েছে। এই শেডের কিছুদূর পর পর এরকম ৪০টি শৌচাগার নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ ১০০০ জন লোক একসাথে এই শৌচাগার ব্যবহার করতে পারেন এবং প্রত্যেকটি তাঁবুর কাছে কাছেই

www.pathagar.com

শৌচাগারগুলি স্থাপন করা হয়েছে। শেডটির মধ্যখানে চলাচলের জন্য যে ২৫/৩০ ফুট জায়গা ফাঁকা আছে সেটিও অধিকাংশ সময় দখল করে রাখে ইরানীদের মিছিল। পরিবেশকে সোচ্চার করে রাখে শ্লোগানের পর শ্লোগান। শৌচাগারের অভ্যন্তরে টয়লেট শাওয়ার ফিট করা আছে। সেই শাওয়ার দিয়ে সকল কাজ সহজভাবে সমাধা করা হয়। শাওয়ারের নলটি অসাবধানে বেশী খুলে দিলে এত দ্রুত বেগে পানি আসতে শুরু করে যে ভিজে পুরে লন্ড ভন্ড হয়ে যেতে হয়। প্রথম দিকে এইরূপ একজন হাজী সাহেবকে দেখেছি অসর্তকতায় নল জোরে খুলে দেয়ায় এতদ্রুত বেগে পানি আসতে শুরু করে যে ভয় পেয়ে হাজী সাহেব দরজা খুলে শৌচাগার থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসেন। দন্ডায়মান জনৈক তরুণ হাজী সাহেব ভিতরে ঢুকে নল বন্ধ করে ব্যবহার পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলে ঐ হাজী সাহেব স্বস্তি লাভ করেন। এই রকম প্রত্যেকটি শৌচাগারের সন্নিকটে আবার দুটি করে ষ্টল আছে। একটাতে ভাত, রুটি, গোশত, তরকারী, চা, কপি, প্রভৃতি গরম পানীয় এবং অপরটিতে ফলফ্রুট, বিস্কুট, এবং ঠান্ডা পানীয় প্রভৃতি বিক্রি করা হয়। আমাদের তাঁবুর পার্শ্বে খাবারের দোকানটি ছিল পাকিস্তানী। তবে চা ব্যতীত সেখান থেকে আমাদের অন্য কিছু কিনে খাবার প্রয়োজন হয়নি। কেননা আমাদের দুবেলার খাবার ও সকাল বিকালের নাস্তা মোয়াল্লিম সরবরাহ করেছেন এবং সেজন্য মক্কাতে আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করে নিয়েছেন। ফলের দোকানটি ছিল চট্টগ্রামের এক ভদ্র লোকের। প্রচন্ড গরমের দরুণ প্রত্যেকদিন তার কাছ থেকে ঠান্ডা পানীয়, ফলফ্রুট প্রভৃতি কিনেছি। আলাপের মাধ্যমে জানতে পারি ছয় হাজার রিয়াল সেলামী দিয়ে সে নাকি ষ্টলটি ভাড়া নিয়েছে। তার টাকা উসুল হবে কিনা সে নিয়ে ভারী দুশ্চিন্তার কথা জানাল। মিনায় সর্বমোট অবস্থান কাল চার দিন। তার মধ্যে একদিন চলে যাবে আরাফাত আর মোজদলেফায়। বাকী তিন দিনে সেলামীর টাকা সহ মূলধন তুলে তবেইত লাভের মুখ দেখবে। সবার ব্যবহারের পানি গড়িয়ে নীচে পড়ে স্নানাগার এবং ওজু করার চত্বরটি সব সময় স্যাত স্যাতে হয়ে থাকে। সংক্রমণ রোধের জন্য সেখানে বেশ কিছু পরিমাণ ডি,ডি,টি, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ছিটিয়ে দেয়া হয়। এই পাউডারের তীব্র গন্ধ আর তার সাথে উত্তপ্ত মরু বায়ু মিশে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হত। তীব্র এই গন্ধ আর প্রচন্ড গরম সহ্য করতে খুবই কষ্ট হত।

তবু ও বলতে হবে সৌদি সরকার মিনায় পানি সরবরাহের এবং শৌচাগার ও স্নানাগারের এক অতি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। এই স্নানাগারের দুই প্রান্তে লম্বা একটি করে নল এবং সেই নলের সাথে ৮/১০ টি করে পানির টেপ সংযুক্ত করে দেয়া আছে। পূর্ব দিকের টেপ গুলি সাধারণ টেপের মত হাত দিয়ে ঘুরালেই পানি পড়ে। কিন্তু পশ্চিম দিকের টেপগুলি অভিনব এক সংযোজন। এখানে কোন টেপ বা কলের মুখ হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয় না। হাত দিয়ে খোলাবাঁধা ও করতে হয় না। স্পর্শ না করে শুধু মাত্র নলের মুখে হস্ত দ্বয় পেতে দিলেই আপনা হতেই দ্রুতবেগে নির্ঝরের মত পানি ঝরতে থাকে। আবার হাতটি নিয়ে ফেললে আপনা হতেই পানির স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। এখানে কলের মুখগুলো বেশ বড়, এক ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট।

www.pathagar.com

পানির চাপের গতি ও অত্যন্ত ভারী। ফলে এখানে যথেষ্ট পানি অপচয় হয়। মনে হয় যেন অপচয় করেই এতদিনের অভাবের প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শৌচাগারের দুদিকের এই কলগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যবহার করতে হয়। ফলে অজু করার সময় শেষের দিকে পা ধুতে গিয়ে দেখা দেয় বিড়ম্বনা। তাই হাজী সাহেবানরা অন্য সব অংগ ধৌত করে দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে টেপের উপর পা তুলে দেয়। একটি ধোয়া হলে সেটি নামিয়ে অপর পা'টি তুলে দেয়। এভাবেই অজুর কাজ সম্পন্ন করে। মেয়েদের বেলায় লাগে ফ্যাসাদ। কেননা পুরুষদের মত উন্মুক্ত স্থানে তাদের পক্ষে ওভাবে পা তুলে দেয়া সম্ভব নয়, শোভন ও নয়। সুতরাং পা ধোয়ার জন্য তাদেরকে অন্য কোন রূপ পাত্রের আশ্রয় নিতে হয়। সামগ্রিকভাবে উত্তম ব্যবস্থার মধ্যে এটিকে একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা এগুলি নির্মাণ করা হয়েছে হাজী সাহেবানদের জন্য এবং এগুলোর ব্যবহার কাল হল বৎসরে মাত্র ৪/৫ দিন, ৮ থেকে ১২/১৩ই জিলহজ্ব। বৎসরের বাকী দিন গুলিতে এখানে কেউ আসে না, কেউ থাকে না। এগুলো ফাঁকা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। হাজী সাহেবানরা এই কলগুলো সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেন অজু করার জন্য। অথচ অজুর অন্যতম ফরজ পা ধোয়ার সুব্যবস্থা এই কলগুলোতে রাখা হয়নি। বসে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হলে অজু বানাতে আর কোন রূপ বিড়ম্বনা পোহাতে হত না।

মিনা এক বিশাল মরু প্রান্তর। চারিদিকে শিলাময় গিরিমালা। মধ্যখানে সমতল। এই সমতল উপত্যকা ভূমিতেই গড়ে উঠেছে ছোট্ট এক জনপদ। এই পাহাড় গুলোর গায়ে পাতা আছে অসংখ্য তাঁবু। এইগুলি নাকি স্থানীয় বেদুইনদের। তারা এখানে এই মৌসুমে হজব্রত পালনের সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে দু পয়সা উপার্জন ও করেন। অনেক তাঁবু পাহাড়ের এত উপরে যে আমাদের মত লোকের এই কঠিন পাষাণ বেয়ে অত উপরে একবার উঠতে ও হাঁফ ধরে যাবে। মিনার পশ্চিম দিকে ছোট্ট এক শহর। এখানে আছে বেশ কিছু সংখ্যক দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা। এগুলোর কিছু কিছুর ব্যবহার হয় আবাসিক ভবন এবং কিছু কিছু বাণিজ্যিক ভবন হিসাবে। আর কিছুতে আছে সরকারী দপ্তর। এখানে আছে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস, যেখান থেকে সংযোগ দেয়া আছে বিশ্বের প্রায় সব দেশের সাথে। শেডে আমরা যেখানে বিছানা পেতে ছিলাম তার অনতিদূরে রাস্তার পার্শ্বে আছে বেশ কয়েকটি টেলিফোন কয়েন বক্স। মক্কা ও মদিনায় টেলিফোন কয়েন বক্সে যে ভীড় দেখেছি এখানে সে রূপ কোন ভীড় পরিলক্ষিত হয়নি। আমি নিজে ও এখান থেকে কোন টেলিফোন করিনি। তাই এই কয়েন বক্সগুলিকে সব সময় দেখেছি ফাঁকা। মালিক আবদুল আজিজ রোডের অনতিদূরে আছে মদিনাতুল হাজ্জাজ, সৌদী হাসপাতাল। এই সৌদী হাসপাতালের দক্ষিণে মালিক আবদুল আজীজ রোডের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত মিনার বিখ্যাত মসজিদ, বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদে খায়েফ। এই মসজিদটি অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু পুরাতনত্বের কোন চিহ্ন এখানে নেই। এই মসজিদে অসংখ্য নবী নামাজ আদায় করেছেন এবং বহু নবীর কবর ও এখানে বিদ্যমান আছে। বর্ণিত আছে হযরত আদম (আঃ) এর কবরও

www.pathagar.com

এখানে অবস্থিত। অনেক ঐতিহ্যের ধারক ও স্মৃতির বাহক পুরানো মসজিদটি ভেংগে সৌদি সরকার আধুনিক স্থাপত্যের আকারে আরো অনেক বড় করে বর্তমান মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। এই মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য হাজীদের সব সময় ভীড় লেগেই থাকে। আল-আস রোডে একটি ডাকঘর এবং আমীর ফয়সল রোডের তেমাথায় আরেকটি ডাকঘর আছে, যেখান থেকে সারা বিশ্বের সাথে এ কয়েকদিন পত্র যোগাযোগ চলে। ডাকঘরের পশ্চিমেই বেতার ভবন, তার পশ্চিমে রেড ক্রিসেন্টের অফিস। আল-আস রোডে রেড ক্রিসেন্ট অফিসের সামনাসামনি বিপরীত দিকে আছে পুলিশ অফিস। এই অফিসের পূর্ব দিকেই রাজ প্রাসাদ। সৌদি বাদশাহ অথবা রাজ পরিবারের অন্য কোন সদস্য মিনায় এলে এ রাজ প্রাসাদে অবস্থান করেন। মালিক আবদুল আজিজ রোড স্থিত শেড বা পায়ে চলার পথ ধরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে যেখানে ছোট্ট শহর গড়ে উঠেছে তারই কাছাকাছিতে অবস্থিত 'জামরা-ই-উলা' অর্থাৎ বড় শয়তান। এটি মসজিদে খায়েফ ও মদিনাতুল হাজ্জাজের কাছাকাছি। তার কিছু পশ্চিমে "জামরাতুল ওয়াস্তা" অর্থাৎ মেঝ শয়তান, তার পশ্চিমে "জামরাতুল আকাবা" অর্থাৎ ছোট শয়তান-মিনা ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে তিনটি স্তম্ভ। আল্লাহতালার আদেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) কে যখন কোরবানির জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, এই তিন স্থানেই শয়তান হযরত ইসমাইল (আঃ) কে পিতার অনুগমনে অবাধ্যাচরণ করার জন্য কুমন্ত্রণা দিয়েছিল এবং এই তিন স্থানেই শয়তানকে তাড়াবার জন্য তিনি শয়তানের উদ্দেশ্যে ঢিল নিক্ষেপ করেছিলেন। শয়তানের প্রতীক হিসাবে ঐ স্থানে তিনটি পাকা বৃহৎ গোলাকারের স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে এবং হজরত ইসমাইলের (আঃ) অনুকরণে এই তিনটি স্তম্ভের প্রতি হাজী সাহেবানরা নর নারী নির্বিশেষে ঢিল নিক্ষেপ করে থাকেন। তবে এখানে প্রস্তর নিক্ষেপ করার সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। তাই এই ঢিল নিক্ষেপের সময় ভয়াবহ ভীড় সৃষ্টি হয়। এই ভীড়ের মধ্যে প্রতি বৎসর কয়েকটি মূল্যবান প্রাণ হারিয়ে যায়। এই ভীড় এড়ানোর জন্য সৌদি সরকার এই স্তম্ভ গুলোর উপর ফ্লাইওভার বা ওভারব্রীজ নির্মাণ করে স্তম্ভগুলোকে উপরের দিকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। এই ব্রীজগুলোর উপর দিয়ে ও হেঁটে গিয়ে জামরায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ নীচে একদল, উপরে সমসংখ্যক আর এক দলের একই সময়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতি বৎসর হাজীদের সংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ফ্লাইওভার নির্মাণ করে, দ্বিগুণ হাজীর একই সময়ে প্রস্তর নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হলেও ভীড় কিন্তু মোটেও কমেনি এবং দূর্ঘটনা ও প্রতি বৎসর লেগেই আছে। আমার মনে হয় এই ভীড় এড়াবার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে দূর্ঘটনা এড়ানো এবং মূল্যবান জীবন রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব ব্যপার নয়। ভীড়ের চেয়ে ও এখানে দূর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হল হাজরে আসওয়াদের সম্মুখ স্থানের মত এখানে ও যে পথে প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য গমন করা হয়, কাজ শেষে সেই একই পথে ফিরে আসতে হয়। এই সময়ে আফ্রিকার কালো মানুষের ঝাঁকের সম্মুখে যদি কেউ পড়ে যায় তাহলেই কেয়ামত দেখা দেয়। এখানেও যদি "এক দিকে চলাচল পথ" বা

www.pathagar.com

'ওয়ান ওয়ে' করা যায়, এবং সেটা আদৌ অসম্ভব নয়, তাহলে এই ভীড় এড়ানো সম্ভব। একজন হাজী সাহেব প্রস্তর নিক্ষেপ করে পিছন দিকে ফিরে না এসে যদি সামনের দিকে চলে যাবার পথ পায় তাহলে দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস। সৌদী সরকার এত উন্নয়ন, এত আরামদায়ক ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু এই ছোট্ট ব্যাপারটিকে কেন যে অসম্ভব করে রেখেছেন তা বোধগম্য নয়।

হজরত ইসমাইলের (আঃ) অনুকরণে শয়তানের প্রতীক হিসাবে উপরোক্ত ৩টি স্তম্ভে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এই কংকর নিক্ষেপের সময় প্রায় হাজীদের মধ্যে বেশ জোশ এবং জযবা দেখা যায় এবং যথেষ্ট জোরের সাথে এমন ভাবে নিক্ষেপ করে থাকেন মনে হয় যেন সম্মুখে দন্ডায়মান শয়তানকেই প্রস্তর নিক্ষেপ করছেন। তাই অনেকে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধও শুঁকবার চেষ্টা করেন। প্রকৃত ব্যাপার হল এই অনুষ্ঠানটি করা হয় প্রথমত হযরত ইসমাইল (আঃ) এর প্রস্তর নিক্ষেপের ঘটনার স্মরণে। দ্বিতীয়তঃ এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল, দন্ডায়মান শয়তানকে প্রস্তর নিক্ষেপ নয়, বরঞ্চ এর উদ্দেশ্য হল–শয়তান ও সকল প্রকার শয়তানীয়তাকে এবং নিজ নফ্‌সে আম্মারার সকল কুপ্রবৃত্তিকে নিজের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে পরম করুণাময় আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি করা। যাবতীয় পার্থিব লোভ লালসার প্রতি নিজের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করে, চলার পথে শয়তানের সকল বাধাকে প্রতিহত করে, নিজের আত্মা শুদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই হজরত ইসমাইল (আঃ) এর অনুকরণে এই প্রস্তর নিক্ষেপ অনুষ্ঠান। এই প্রস্তর নিক্ষেপ করে হযরত ইসমাইল (আঃ) শয়তানকে সম্মুখ হতে তাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর রাহে নিজেকে কোরবানি দিবার জন্য সোপর্দ করে দিয়েছিলেন দ্বিধাহীন নিঃশঙ্ক চিত্তে। তাই হজ্ব সমাপন করে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যাবার উদ্দেশ্যে প্রস্তর নিক্ষেপের দ্বারা নিজের মন থেকে সকল প্রকার লোভ লালসা, হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা, পাপাচার, অন্যায়, অনিয়ম, উশৃংখলতাকে বলি দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার লক্ষ্যে এই প্রস্তর নিক্ষেপ। সুতরাং এর মধ্যে পৌত্তলিকতার কোন গন্ধ নাই এবং থাকতে পারে না। এই জামরা অর্থাৎ শয়তানের প্রতীক স্তম্ভ ৩টি হল মিনার সর্ব পশ্চিম প্রান্তে। শয়তানকে এখানে পরাভূত করে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বীয় প্রিয় পুত্রকে নিয়ে গেলেন মিনার সর্বপূর্ব প্রান্তে যেখানে স্বীয় পুত্রের গলার উপর দিয়ে ছুরি চালিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুরুস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন বেহেশতের একটি দুম্বা। পূর্ব প্রান্তের এই স্থানটিকে হাজীদের কোরবানির স্থান হিসাবে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

যেস্থানে হযরত ইসমাইল (আঃ) এর গলার উপর দিয়ে ছুরি চালিয়ে ছিলেন সেস্থানে বর্তমানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই মসজিদটির নাম মসজিদে কবশ। ইহা ছাড়া মিনায় আরো একাধিক মসজিদ আছে। যেমন মসজিদে আকাবা, হিজরতের পূর্বে যেখানে মদিনার ৬০জন আনসার হযরত (দঃ) এর হস্তে বায়াত করেন এবং মদিনায় এসে ইসলাম প্রচারের আহবান জানান এবং সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আরো আছে মসজিদে দব, যেখানে হযরত

www.pathagar.com

(দঃ) মক্কা–জীবনে অনেক সময় অবস্থান করতেন। এই ঐতিহাসিক মসজিদ গুলো তুলনামূলক ভাবে আকারে ছোট। তাই এখানে এই সময়ে নামাজীদের স্থান সংকুলানের অভাবে ভীড় লেগেই থাকে। ভিতরে ঢুকে নামাজের স্থান লাভ করা প্রায় দুষ্কর। তাঁবুতে আমরা যেখানে বিছানা পেতেছিলাম তার পাশেই দেখি আলম সাহেব ও তাঁর বেগম সাহেবা ও শয্যা পেতেছেন একেবারে তাঁবুর একধারে। মদিনা থেকে ফেরার পর এখানেই সর্বপ্রথম আলম সাহেবের দেখা পেলাম। অনেক কথা হল। জানতে পারলাম তিনি হেরেম শরীফ থেকে বেশ দূরে নাক্কাসায় এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্থান করছেন। তাই নিয়মিত ভাবে হেরেম শরীফে যেতে পারেননি। তবে মোয়াল্লিমের সাথে স্থির হয়েছে হজ্বের পর ভীড় কমে গেলে হেরেম শরীফের কাছাকাছিতে তাদেরকে একটি ঘর দেয়া হবে, যাতে করে হেরেম শরীফে নামাজ ও যাতায়াতের কাজ সহজতর হয়। আলম সাহেবকে সাথে নিয়ে দুজনে মিনায় খুব ঘুরে বেড়ালাম। ফ্লাই ওভারের উপরে উঠে সমগ্র মিনা প্রান্তরটি চোখ ভরে দেখে নেবার চেষ্টা করলাম। খুঁজে বেড়ালাম সৈয়দ আহমদ চৌধুরীকে। কিন্তু তাঁর তাঁবু বের করতে পারলাম না অনেক চেষ্টা করেও।

পরের দিন সকালে নামাজ পড়ে তাঁবুতে ফিরে আসতেই আবদুল হাদী সাহেব বললেন, পটিয়া মাদ্রাসার হাজী মওলানা মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব, যিনি "পটিয়ার হাজী সাহেব" নামে সুপ্রসিদ্ধ, মুফতি মওলানা আবদুল রহমান সাহেব, মওলানা জাহাংগীর এবং তাঁদের অন্যান্য সংগীগণ আমাদের পাশের তাঁবুতে অবস্থান করছেন। তাঁদের সাথে সকালের নাস্তা করবার জন্য আমাকে তাঁদের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। হাদী সাহেব নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। হাজী সাহেবের সাথে পূর্ব হতে পরিচয় ছিল। চাক্তাই হাজী নূর আলী সওদাগরের গদীতে অনেকবার তাঁর সাথে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে। মৌলানা জাহাংগীর সেই একই সুবাদে পরিচিত। মুফতী মওলানা আবদুর রহমান সাহেবের সাথে সর্ব প্রথম এখানে দেখা। হাদী সাহেব পরিচয় করে দেয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সাথে আমার হৃদ্যতা ও সখ্যতা গড়ে উঠে। তাঁর সাথে অনেক আলাপ হল। হজ্বব্রত পালনে তাঁর বই অনুসরণ করছি বলে তাঁকে জানালাম। তিনি ও আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে হজব্রত পালনের ঠিক মোক্ষম দিনগুলিতেই এহেন বুজুর্গানে দ্বীনের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। তাঁদের সান্নিধ্যে থেকেই তাঁদের প্রত্যক্ষ উপদেশের মাধ্যমে ও তত্ত্বাবধানে হজ্বের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে ছিলাম এবং সকল আহকামাদি সুষ্টরূপে পালন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আগেই বলেছি ইতিপূর্বে মিনায় হাজী সাহেবানরা নিজে নিজে পাক করেই খাদ্যগ্রহণ করতেন। ১৯৭৫ ইং সনে এরূপ এক চুল্লির আগুন থেকে তাঁবুতে আগুন লেগে যায়। ফলে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই ১৯৭৫ সনে হুদা সাহেব ও হজ্বে এসেছিলেন। তাঁর শিবিরে ও আগুন লেগে যায়। তিনি সেই আগুনের বর্ণনা দিয়ে পশ্চাতের পাহাড়টি দেখালেন যেই পাহাড়ের উপর দৌড়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন। সৌদী সরকার অবশ্য নগদ টাকা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হাজীদের ক্ষতি

www.pathagar.com

পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর থেকেই মিনায় হাজীদের পাক করে খাওয়া বা কোনরূপ আগুন জ্বালানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তাই সকাল বিকাল নাস্তাসহ দু'বেলার খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে মোয়াল্লিমের মাধ্যমে। মোয়াল্লিমের তরফ থেকে প্রত্যেকের জন্য মোয়াল্লিমের সীলমোহরাঙ্কিত একটি করে চিরকুট সরবরাহ করা হয়। মোয়াল্লিমের দফতরের সম্মুখে মোয়াল্লিমের লোকেরা পাক করার পর খাদ্য মওজুদ করে রাখে। ঐ চিরকুটগুলো নিয়ে সেখানে কিউতে দাঁড়িয়ে খাদ্যের সরবরাহ নিতে হয়। দুপুরে সূর্যকে মাথার উপর রেখে লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যেন ফুলসিরাত পার হওয়ার মহড়া দেয়া। এ বৎসর হজের মৌসুম ছিল তীব্র গ্রীষ্মে। তাই সৌদি সরকার বিভিন্ন জায়গায় হাজীদের উদ্দেশ্যে বড় বড় হরফে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় উপদেশবাণী লিখে দিয়েছেন– 'প্রত্যক্ষ সূর্য কিরণ এড়িয়ে চলুন। পিপাসার্ত হলে প্রচুর পানি পান করুন।"। তৃষ্ণা পেলে পানি পান করার উপদেশ দেয়ার কারণ হল এদেশে জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক ও আদ্রতাহীন। শরীর থেকে বেরুবার আগেই ঘাম শুকিয়ে যায়। পানির তেষ্টাকে দীর্ঘক্ষণ অবদমন করে রাখলে শরীরে পানি শূন্যতা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা অমূলক নয়। তাই এরূপ উপদেশ। কিন্তু বিস্ময় লাগল সৌদি সরকারের এহেন উপদেশকে উপেক্ষা করে মোয়াল্লিম হাজীগণকে প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণের মধ্যে এভাবে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রাখার হিম্মত পেল কিভাবে? হাজী সাহেবানরাতো হাজী সাহেব, ধ্যানে মগ্ন, তপস্যায় রত। প্রতিবাদের ভাষা জানে না। নির্বাক কণ্ঠ। তাই সে মূহর্তে সেখানে আমরাও পারিনি কোন প্রতিবাদ গড়ে তুলতে। তবে হ্যাঁ, সংখ্যায় আমরা পুরুষ ৪জন ছিলাম বলে পরস্পর পালা করে খাবার আনতাম। ফলে কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়।

আরাফাত

৮ তারিখ এভাবে মিনায় কাটিয়ে ৯ই জিলহজ্ব ভোরে ময়দানে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবার প্রস্তুতি আরম্ভ করলাম। অতি সামান্য হালকা সামান আর দু'টি চাদরে একটি বালিশ জড়িয়ে বুলবুলের হাতে দিলাম। ছোট্ট হেভারচেকটি আমি কাঁদে তুলে নিলাম। পটিয়ার হাজী সাহেব, মুফতী আবদুর রহমান সাহেব, মৌলভী জাহাংগীর তাদের অন্যান্য সাথীগণ ও আমরা ৮ জন সকলে এক সাথে বেরিয়ে উচ্চস্বরে তকবীরে তশরীক ও তলবীয়া পাঠ করতে করতে রাস্তায় আসতেই মোয়াল্লিমের গাড়ী পেয়ে গেলাম। মিনা থেকে ৬ মাইল ও মক্কা থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত এই ময়দানে আরাফায় যথাসময়ে এসে পৌছে গেলাম। ৯/১০ বর্গমাইলের এই বিরাট বিশাল ময়দানে আরাফাতে লক্ষ লক্ষ তাঁবু খাটানো আছে। ড্রাইভার আমাদের মোয়াল্লিমের তাঁবুর সম্মুখে এনে আমাদেরকে নামিয়ে দিল। নইলে এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে নিজ তাঁবু খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার। বাস থেকে উচ্চ স্বরে লাব্বাইকা বলে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিলাম। হৃদয় মন ভরে গেল এক স্বর্গীয় অনাবিল আনন্দে, অনুভবে ও প্রেরণার উচ্ছ্বাসে। হজ্বের মূল ও মুখ্য অংশ হল ৯ই জিলহাজ্ব ময়দানে আরাফায় সমবেত হওয়া এবং জোহরের পর হতে

www.pathagar.com

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওকুফ বা অবস্থান করা। হজ্ব মৌসুমে হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে সমাগত বিশ্বের সকল মুসলমানের ৯ই জিলহজ্ব তারিখে এখানে এই মহাসম্মেলনই হল হজ্বের মূল অংশ। ইতিপূর্বে বিভিন্ন হাজী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করলেও ৯ই জিলহজ্ব জোহরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে একসাথে অবস্থান করেন। জনশ্রুতিতে বলা হয় এবছর (১৯৮৬/১৪০৬ হিঃ) ৩৫ লক্ষ হাজী ময়দানে আরাফায় এ সময়ে অবস্থান করেছেন। তবে হাজীদের সংখ্যা সম্পর্কে সৌদি সরকার যে বুলেটিন প্রচার করেছেন তাতে দেখা যায় যে গত বছর পাসপোর্ট ধারী হাজীর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৭ শত ৬১ জন। বর্তমান সালে ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭ শত ১৮জন। অর্থাৎ এ বৎসর ৪ হাজার ৯শত ৫৭ জন হাজী বেশী এসেছেন। সৌদি সরকার আবার দেশ ওয়ারী আরব, অনারব, ইউরোপ, আমেরিকা ভিত্তিক আগত হাজীদের হিসাব ও প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যায় অনারব দেশ ইরান হতে সর্বোচ্চ সংখ্যক হাজী আগমন করেছেন। ইরানী হাজীর সংখ্যা হল ১ লক্ষ ৫২ হাজার এক শত ৪৯ জন। পাকিস্তান থেকে এসেছে ৯২ হাজার ৩ শত ৫জন। ইন্দোনেশিয়া থেকে ৫৯ হাজার এক শত ৭২ জন। ভারত বর্ষ থেকে ৩৯ হাজার ৩ শত ৪৪জন। তুর্কী থেকে এসেছে ৫৪ হাজার ৬ শত ২৪জন। মালয়েশিয়া হতে ২৬ হাজার ৪৩ জন। চীন হতে ২ হাজার ২ শত ৬৭ জন। শ্রীলংকা হতে এক হাজার ৩ শত ১৪ জন। ব্রুনেই হতে ২ হাজার ৯ শত ৫৪ জন। সিংগাপুর হতে ২ হাজার ৪ শত ৭৩ জন। ফিলিপাইন হতে ১৩২৩, থাইল্যান্ড হতে ১৬৮৫, আফগানিস্তান হতে ৪৬০৩, হল্যান্ড হতে ১২৫, অষ্টেলিয়া হতে ৬৩৮, কানাডা হতে ৩৮৬, ফ্রান্স হতে ৫২০, বৃটেন হতে ৬৩৩৬, আমেরিকা হতে ৯৯২, গ্রীস হতে ১৫৯, যুগোশ্লোভিয়া হতে ৭৬৯, বাংলাদেশ থেকে ১৩,৬৩১ জন। আরব দেশ গুলির মধ্যে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক হাজী এসেছেন মিশর থেকে। মিশরের হাজীর সংখ্যা ৯৮,৬০৬ জন। এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক হাজী এসেছেন জিবুতী থেকে। তাদের সংখ্যা ৪৪৪। আফ্রিকা থেকে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক হাজী এসেছেন নাইজেরিয়া থেকে। তাদের সংখ্যা ২৯,৮৯৯। সবচেয়ে কমসংখ্যক হাজী এসেছেন মাদাগাস্কার থেকে। তাদের সংখ্যা ১৬জন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সৌদি সরকারের বুলেটিনে বাংলাদেশের হাজীর সংখ্যা দেখা যায় ১৩,৬৩১ জন। কিন্তু আমরা জানি বাংলাদেশ সরকার মোট ৮ হাজার হজযাত্রীর কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই কোটা ও পূর্ণ হয়নি। তাহলে প্রশ্ন আসে বাকী হাজী গুলো আসলো কোথেকে? বাকী হাজীগুলো এসেছেন বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে যারা অবস্থান করছেন তাদের মধ্য থেকে। বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরবে আগমন করেছেন বলে তাদেরকে বাংলাদেশীদের অন্তর্ভূক্ত দেখানো হয়েছে। তদুপরি যারা পি ফরমে হজ্বে গমন করেছেন তারাও এদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। মোট হাজীর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ হবে বলে আমাদের মোয়াল্লিম আহমেদ সফিরুদ্দিনই কথাটি বলেছিলেন। সৌদি বুলেটিনে আটলক্ষ ছাপ্পান্ন হাজারের মত হাজির সংখ্যা দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন বুলেটিনে যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন

www.pathagar.com

পাসপোর্টধারী হাজী–যাঁরা সৌদি সরকারকে রয়েলটি প্রদান করেছেন। বাকীগুলি স্থানীয় এবং উপসাগরীয় আরব অঞ্চল থেকে বিনা পাসপোর্টে এসেছেন এবং তারা সরকারকে কোন রয়েলটি প্রদান করেন না। সুতরাং সরকারের নথিতে তাদের কোন হিসাব নেই। তারা স্থানীয় এবং নিকটতম অঞ্চলের অধিবাসী বলে তাদের সংখ্যাই বেশী। কথাটা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। কেননা সৌদি সরকারের প্রকাশিত বুলেটিনে সৌদি আরবের হাজীর সংখ্যার কোন উল্লেখ নাই। সেটা থাকা সম্ভবও নয়। রাশিয়া থেকে হজে যেতে অনুমতি দেয়া হয় এবং অনেকেই হজে যায় একথা দেশের অনেক বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে অনেকবার শুনেছি। অনেক দেশের হাজী সাহেবানদের সাথে দেখা হলেও রাশিয়ার কোন হাজীর সাক্ষাৎ আমি পাইনি এবং সৌদি সরকারের প্রকাশিত বুলেটিনে ও রাশিয়ার কোন হাজীর উল্লেখ নেই। মুসলিম উম্মাহর এই বিরাট বিশাল মহাসমাবেশকে ইরান কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক ছাড়াও ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করে আসছে। ইরানের মতে বর্তমানের আমেরিকাই হচ্ছে জুমরাতুল উলা অর্থাৎ বড় শয়তান। বিশ্বের দুর দুরান্ত থেকে আগত হাজীরা এই বড় শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে নাফ্‌সে শয়তান এবং শয়তানের অনুসারী বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিই প্রস্তর নিক্ষেপ করে থাকেন। মিনাতে কিছু পুস্তিকা, প্রচার পত্র ইরানীরা হাজীদের মধ্যে বিলিবন্টন করে। তারমধ্যে একটি পুস্তিকা ইমাম খোমেনীর ১৯৭৯ থেকে ৮১ পর্যন্ত হাজীদের নিকট প্রেরিত এবং ৮১ ইং ১০ই অক্টোবর তারিখে সৌদী বাদশাহ খালেদের প্রতি প্রেরিত বাণী সম্বলিত, যাহা সাদা কাগজে সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা, ডবল ক্রাউন সাইজের ১৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত। আরেকটি ১৯৮৬ ইং সনের ৭ই অগাষ্ট তারিখের, এটি হল বর্তমান সনের হাজীদের প্রতি ইমাম খোমেনীর বাণী। আরেকটি সুন্দর পুস্তিকা যাতে আছে বৃহৎ শক্তিবর্গ সম্পর্কে ইমাম খোমেনীর অভিমত। এগুলো আবার আরবী ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই মুদ্রিত। চেহারা দৃষ্টে অনারব জ্ঞানেই আমার হাতে জুটল ইংরেজী কপি। হাতে আসার সাথে সাথে খুলে পড়ে দেখার চেষ্টা করতেই পাশ থেকে একজন বলল বিছানার ভেতর এগুলো লুকিয়ে ফেল। আমার প্রশ্নের জবাবে সে বলল পুলিশ দেখলে এগুলি কেড়ে নিয়ে যাবে এবং তোমাকে শুদ্ধ টানাটানি করার সম্ভাবনা আছে। তাই সস্বিত ফিরে পেয়ে বিছানার মধ্যে এগুলি লুকিয়ে রাখলাম।

ইমাম খোমেনীর বক্তব্য হল–হজ্ব শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও কর্তব্য পালন নয়। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে ও ইসলামের বিধান নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি আচরণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়ার নামই ইসলাম। তাই বলা হয়েছে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই বিধানে যেমন আছে ধমীয় কর্তব্য পালনের কথা তেমনি আছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মুসলিম উম্মাহর সমবেত প্রচেষ্টার বিধান। মসজিদে নববী কেবলমাত্র উপাসনালয় ছিল না, ইহা ছিল সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল। তাই নামাজ, রোজা, জাকাত, প্রভৃতি অন্যান্য এবাদতের ন্যায় হজ্বকে ও কেবলমাত্র এবাদত হিসাবে মূল্যায়ন করা উচিৎ নয়।

www.pathagar.com

হজ্ব নামক এই এবাদতের একটি সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। বিশ্বের সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্যে এর একটি রাজনৈতিক ভূমিকা ও আছে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ব, হৃদ্যতা, প্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে হজ্বের এই মহা সম্মিলনকে কাজে লাগাতে হবে। ইমাম খোমেনীর বাণীর সারমর্ম হল–হজ্ব হচ্ছে জালিম অত্যাচারীর বিরূদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে আহুত এক মহাসমাবেশ। এই সমাবেশ বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে একতা ও মজবুত ঈমান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপনিবেশিক শোষক শক্তির বিরূদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্যই। এই সমাবেশে বসেই মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করবে ও নিজেদের সুখ, দুঃখ, সমস্যা, চিন্তাধারা, কর্মপন্থা প্রভৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে এবং বিশ্বের জালিম শক্তির মোকাবেলা করে আল্লাহর দুশমনদের ধ্বংস করার জন্য সমবেত কর্মসূচী গ্রহণ করবে। পবিত্র হজ্বের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে আল্লাহতে বিলীন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর অস্থিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য হজ্ব যে সুযোগ এনে দেয় সে সুযোগকে হেলায় নষ্ট করা উচিৎ নয়।

ময়দানে আরাফায় পৌছে বাস থেকে নেমে আমরা শিবিরের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রথমে ঢুকতেই রাস্তার ডানপার্শ্বে মোয়াল্লিমের দফতর। তারপরে কয়েকটি তাঁবু দেখলাম ফাঁকা, কোন লোকজন সেখানে এখন ও অবস্থান গ্রহণ করে নাই। তারই পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে বাংলাতেই বলছে সামনের দিকে চলে যান। এই শিবির গুলো অন্য মোয়াল্লিমের। তার কথায় বিশ্বাস করে ইতিপূর্বে আগত হাজীরা সামনের দিকে চলে গিয়েছে এবং এগুলো খালি পড়ে আছে। সামনের দিকে অগ্রসর হলে সুবিধাজনক স্থান পাওয়া না যেতে পারে ধারণায় আমরা লোকটির কথা বিশ্বাস না করে এই শিবির গুলোতে বিছানা পাতবার জন্য অগ্রসর হলে সে আরো দৃঢ়তার সাথে বাধা দিবার চেষ্টা করল। তার বাধা অগ্রাহ্য করে আমরা এখানেই ডেরা পাতলাম। আসলে লোকটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তার বা মোয়াল্লিমের পছন্দের হাজীদের জন্য এগুলো খালি রাখবার চেষ্টা করেছিল। একই চত্বরে দুই মোয়াল্লিমের তাঁবু হতে পারে না। অন্য হাজীরা এটা বুঝতে পারেনি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই আমরা এখানে অবস্থান গ্রহণ করি। বিছানা পাতার পর কিন্তু সে আর টু শব্দটি না করে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। পাশের একটি তাঁবুতে পটিয়ার হাজী সাহেব, মুফতী সাহেব তাঁরা বিছানা পেতেছেন। তার পার্শ্বের টিতে একপ্রান্তে মহিলা ৪ জনের জন্য পর্দাঘেরা বিশেষ ব্যবস্থা করে তারই পার্শ্বে আমরা ৪ জন শয্যা পাতলাম। বাইরে প্রখর রৌদ্র তাই আরাফাতের ময়দানে এই তাঁবুর ভিতর বসে দেখলাম সকলেই ধ্যানে মগ্ন। আরাফাতে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার ও স্নানাগার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এখানে অস্থায়ীভাবে মাটিতে গর্ত করে টিনের ঘেরা দিয়ে সাময়িক ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। খুব সম্ভব এখানের অবস্থানকাল অতি স্বল্প বলেই হেজাজ সরকার এখনও এদিকে নজর দেননি। একবার একটি শৌচকক্ষে ঢুকবার চেষ্টা করেছিলাম। তীব্র গন্ধ্যে তিষ্ঠানো সম্ভব

www.pathagar.com

হয়নি। বাইরে একটি মাত্র পানির কল। দু'দিকে দু'টি নল। সেখান থেকে পানি নিয়ে অজু গোসলের মহাধূম লেগেই আছে। কিছুক্ষণ পর আমাদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল একটি পানির গাড়ী (বাউছার)। প্রচন্ড তীর্যক সূর্যরশ্মির মধ্যে তাপদগ্ধ হাজী সাহেবানদের তৃষ্ণা মেঠাবার জন্য মোয়াল্লিম সাহেব এই সুপেয় শীতল পানির ব্যবস্থা করেছেন। মাইক দিয়ে মোয়াল্লিম সাহেব খাবার পানি নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিলে হাজী সাহেবানরা গাড়ীর পেছন দিকের টেপ থেকে পানি সংগ্রহে লেগে যায়। এ সময়ে অনেকেই খাবার পানির অপচয় শুরু করে দেয়। খাবার পানি দিয়ে অনেকেই অজু গোসল শুরু করে দেয়। এই অপব্যবহার লক্ষ্য করে স্বয়ং মোয়াল্লিম সাহেবকে মাইক দিয়ে বারবার চিৎকার করতে শুনলাম–"হাজী সাহেবানরা ৩০০০ রিয়াল ব্যয় করে আপনাদের খাবার জন্য মক্কা থেকে এই এক গাড়ী পানি এনেছি। দয়া করে পানি অপচয় করবেন না"। কিন্তু কে শুনে কার কথা !

এখানেও মোয়াল্লির্ম পাক করে খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দুপুরের খাদ্য সরবরাহে কিছুটা বিশৃংখলা দেখা দিল। শিবিরের এক ধার ধরে খাদ্য সরবরাহ করতে গিয়ে আমাদের ধারে পৌছতে অনেক দেরী হয়ে গেল। ওদিকে ক্ষুধার জ্বালায় সকলেই অস্থির। এ অবস্থায় অসহ্য হয়ে হুদা সাহেব উঠে গিয়ে তাদেরকে হাঁকা বকা করে লাইন ধরবার ব্যবস্থা করে আমাদের সকলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্বে মওলানা জাহাংগীর, উপস্থিত কয়েকজনের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে কার্টুন ভর্তি শীতল পানীয় এবং আরাফাতে প্রাপ্য ফলাদি এনে শিবিরে অবস্থিত সকল হাজী সাহেবানদেরকে সরবরাহ করে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির কিছুটা উপশমের চেষ্টা করেন।

৯ই জিলহজ্ব জোহর থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত–এই সময়টিই আরাফাতে অবস্থানের প্রকৃত সময় অর্থাৎ ইহাই হজ্বের মুখ্য অনুষ্ঠান। আরাফা শব্দের অর্থ পরিচিতি, জানাজানি এবং মিলন। স্বর্গচ্যুতির পর এই ময়দানেই একটি অনুচ্চ পর্বতশীর্ষে আদম আর হাওয়ার পুনর্মিলন ঘটে। এখানেই তাঁদের তওবা কবুল হয়। অর্থাৎ অনুতাপ অনুশোচনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়। সেই থেকেই আরাফাত নামেই এই ময়দানটি খ্যাত এবং পাহাড়টি জবলে রহমত বা করুণা গিরি নামে পরিচিতি লাভ করে। আল্লাহ প্রেমিক মুসলমানগণ এখানে এসে উচ্চস্বরে লব্বাইকা বলে আল্লাহর দরবারে হাজিরা প্রদান করেন। নিবেদন করেন নিজ নিজ মনের আকুতি। এখানে নেই কোন রাজা আর প্রজা, কালো আর সাদা। এখানে নেই কোন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। এখানে মাহমুদ ও আয়াজ, বান্দা আর বান্দা নেওয়াজ সকলেই একই রকম দু'খণ্ড শ্বেত বস্ত্রে আবৃত। সকলেরই কণ্ঠে একই সুর–"আমরা হাজির, আল্লাহ আমরা হাজির, তুমি এক অদ্বিতীয়, তোমার নেই কোন শরীক। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। সকল নেয়ামত, করুণার দান, বিশ্বব্রমান্ডে অখণ্ড সার্বভৌম আধিপত্য একমাত্র তোমারই।" এখানে বুঝবার উপায় নেই কে রাজা, কে বাদশা আর কে প্রজা, কে ফকির আর কে আমির। একই ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় আরাফাতের এই ক্ষণ অবস্থানের মাধ্যমেই নিজেকে জানা এবং

www.pathagar.com

নিজেকে জানার মাধ্যমে আল্লাহকে জানার, স্রষ্টাকে জানার, নিজরবকে জানার জন্য সকলেই ব্যাকুল চিত্তে উদগ্রীব হয়ে থাকেন। প্রচন্ড উত্তাপের কারণে এ সময়ে তাঁবু থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। তাই তাঁবুর বাইরে লোকজনের তেমন আনাগোনা দেখা যায় না। সকলেই নিজ নিজ শিবিরে যুৎসই আসন নিয়ে নিজ স্রষ্টার সাথে মিলনের ধ্যানে মশগুল এবং স্রষ্টার মাঝে নিজ সত্তাকে বিলীন করে দেয়ার সাধনায় আত্মহারা।

আছরের সময় হয়ে এলে শিবিরের সকলেই হাজী ইউনুস সাহেবকে ইমামতির জন্য ধরে বসলেন। উল্লেখ্য যে ময়দানে আরাফায় লক্ষ লক্ষ হাজী সমবেত হলে ও সকলের এক সাথে নামাজ পড়ার কোন সুযোগ নেই। সেরূপ কোন ব্যবস্থা ও নেই। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ তাঁবুতে খণ্ড খণ্ড জামাতে নামাজ আদায় করেন। এমন কি মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফাত কোথায় ও সকল সমাগত হাজীগণের এক সাথে একটি মোনাজাত ও করা হয় না। মসজিদে নিম্‌রা আমাদের শিবির থেকে অনেক দূরে। সে দিকে যাবার চেষ্টা করিনি। কেননা একেত তীব্র সূর্য রশ্মি, তদুপরি হারিয়ে যাবার ভয়। তারপরেও সাথে আছে মহিলা। হাজী সাহেব বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতার অজুহাতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে সে দায়িত্ব গিয়ে পড়ে মুফতী আবদুর রহমান সাহেবের উপর। নামাজ শেষে মুনাজাতের জন্য হাজী সাহেবকে সকলেই ধরে পড়লে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। তবে মুনাজাতের পূর্বে তিনি সংক্ষিপ্ত এক খোৎবা প্রদান করলেন। হাজী সাহেব তাঁর বয়ান তাঁর স্বাভাবিক অনুচ্চস্বরে করে যাচ্ছিলেন। মৌলানা জাহাংগীর তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য সকলের শ্রুতির মধ্যে উচ্চস্বরে পৌছিয়ে দিচ্ছিলেন। মনে হল এমনি ভাবে হযরত নবী করিম (দঃ) এই মাঠেই বিদায়ী খোৎবা দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) একই ভাষায় উচ্চ কণ্ঠে সমবেত লক্ষ জনতার কর্ণে তা পৌছিয়ে দিচ্ছিলেন। শিবিরের মধ্যে এ সময়ে পিনপতন নিস্তব্দতা বিরাজ করছিল। সকলেই মনযোগের সাথে নিবিষ্ট মনে শুনে যাচ্ছিল। বয়ান শেষে হাজী সাহেব দুহাত তুলে মুনাজাত শুরু করলেন। দীর্ঘ সেই মুনাজাত। সকলেরই নয়ন সিক্ত হয়ে গেছে অশ্রু জলে। সে অশ্রু গন্ড বেয়ে বুক ভাসিয়ে দিল এবং স্বর্গীয় পুলকে, তৃপ্তিতে, আবেগে আর উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে গেল দেহমন। মুনাজাত যখন শেষ হল সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে গেছে। রৌদ্র কিরণের তীব্রতা হ্রাস পেয়ে গেছে। বুলবুলকে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে নিকটেই নির্জন একস্থানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'জনে এখানেই দাঁড়িয়ে অবস্থান করি। দু'জনেই মনের সকল ব্যাকুলতা, সকল কামনা, বাসনা, অনুতাপ, অনুশোচনা, মার্জনা ভিক্ষা সবিনয়ে পেশ করলাম আপন প্রভুর দরবারে। দেখতে দেখতে সূর্য চলে গেল অস্তাচলে। অকুফে আরাফাত বা হজ্বের মুখ্য অনুষ্ঠানের অবসান হয়ে গেল। বিদায়ের পালা শুরু হয়ে গেল। কার আগে কে আরাফাত ত্যাগ করবে তাড়াতাড়ির ধুম পড়ে গেল। মাগরিবের নামাজ না পড়েই আরাফাত থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। মুজদালেফায় গিয়ে মাগরিব এবং এশা একসাথে পড়াই বিধান। অনেককেই দেখলাম সূর্যাস্তের পূর্বেই বাসে উঠে বসে আছে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে যাত্রা শুরু হবে বলে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনেষু; সব বাস একসাথে যাবার চেষ্টা

www.pathagar.com

করে বলে রাস্তায় মহাযানজট। ফলে কোন বাসই সামনের দিকে সহজে অগ্রসর হতে পারে না। আমাদেরকে কিন্তু তাড়াতাড়ি ছুটতে দিলেন না হাজী সাহেব। বললেন ধীরে সুস্থে শৃংখলার সাথে শান্তভাবে আমরা যাব। ধৈর্য হারাবার প্রয়োজন নেই। তাঁর নির্দেশে আমরা শান্তভাবে তাঁবুর মধ্যেই অবস্থান করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে মোয়াল্লিমের লোকজন এসে তাঁবু খুলে ফেলতে শুরু করল। আমরা তাঁবুর বাইরে এসে গোধূলির ক্ষীণ আবছা আলোতে আরাফাতের উন্মুক্ত আকাশের নীচে অবস্থান নিলাম। উর্দ্ধে আকাশে লক্ষ তারার ঝলমলানি আর নিম্নে মরুভূমির মৃদু সমীরণ এ সময়ে মনকে জুড়িয়ে দিল। মাগরিবের সময় যায় যায়। কিন্তু আরাফাতে মাগরিবের নামাজ পড়া যায় না। গোটা জীবনে এই একটি দিনের একটি ক্ষণের ফরজ নামাজ ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দেবার বিধান শরীয়ত সম্মত। মোজদালেফায় এসে মগরিব ও এশার নামাজ একত্রে পড়তে হয়। এ সময়ে মোয়াল্লিমের লোক এসে প্রত্যেকের হাতে একটি করে প্যাকেট ভর্তি খাবার বা প্যাকেট ডিনার দিয়ে গেল। বলে দিল মোজদালেফায় রাতের খাবার মিলবে না, কেননা মোজদালেফায় কে কোথায় ঠাঁই নেবে তার স্থান নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই মোজদালেফার রাত্রের আহার সন্ধ্যার পরে আরাফাতেই সরবরাহ করে দিয়ে মোয়াল্লিম নিজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণের চেষ্টা করলেন। হাজী সাহেবের নির্দেশে উম্মুক্ত আকাশের নীচে আরাফাতের মাঠে বসেই সে রাতের আহার গলাধঃকরণ করলাম। অবশেষে সড়ক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যানজট কমে এসেছে দেখে হাজী সাহেবের নির্দেশে মোজদালেফার উদ্দেশ্যে বাসে আরোহন করলাম। মোয়াল্লিমের লোক এখানে তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বলে দিল এই বাস মোজদালেফায় আপনারা নিজেদের কাছেই রেখে দেবেন। সকালে এই গাড়ীতে আপনারা মিনায় প্রত্যাবর্তন করবেন। মোদ্দাকথা মোজদালেফায় এবং মিনায় ফেরৎ পথে মোয়াল্লিমের কোন দায়িত্ব নাই এবং সেখানে দায়িত্ব নেয়াটা সম্ভবপর ও নহে।

দেখলাম ইরানের আন্দোলন সফল হয়নি। হজ্বের মহাসম্মেলনকে মুসলিম উম্মাহর পার্থিব কল্যাণে আর উন্নয়ন সাধনে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি এই মহাসম্মেলনকে। এই মহাসমাবেশে মহাপ্রভুর সাথে আধ্যাত্মিক যোগ সূত্র স্থাপন করা সম্ভব হলে ও মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নয়ন হলে ও মানুষে মানুষে মহামিলন, মানবাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হয়নি। এখানে হয়নি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষে মানুষে মনের মিলন, ভাবের বিনিময়। এখানে আলোচিত হয়নি মুসলিম উম্মাহর সমস্যার কথা এবং তার সমাধানের জন্য দেয়া হয়নি কোনরূপ পথনির্দেশ। এখানে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি মুসলিম বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা। এসব ব্যাপারে মুসলিম বিশ্ব বহুধা বিভক্ত বলে অনৈক্য সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহত্তর অকল্যাণের আশংকায় সেটা পরিহারের যুক্তি অনেকেই দিয়ে থাকেন। এতদসত্বে ও দেখলাম ইরানই একমাত্র দেশ যে হজ্বের এই মহাসম্মিলনকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। জানি না সফলতা আদৌ আসবে কিনা।

www.pathagar.com

৯ই জিলহজ্ব হজ্বের দিন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেছি বটে ; কিন্তু সেদিন আরাফাতের মাঠ দেখিনি। দেখবার মত মন মানসিকতা ও ছিল না। জিজ্ঞাসা করায় মুফতী রহমান সাহেব একবার শিবিরের বাইরে এসে দূরে আঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন–ঐ যে আবছা দেখা যাচ্ছে ওটাই জবলে রহমত। সেই সময়ে আমাদের শিবির থেকে সেদিকে যাওয়া এক রকম অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হয় না। ময়দানে আরাফাত দেখেছিলাম হজ্বের পর। মক্কা থেকে একটি টেক্সী নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। টেক্সীটি ভাড়া করেছিল জামাই জাহাংগীর। ড্রাইভার ছিল আমাদের চট্টগ্রামেরই এক অধিবাসী। শশ্রু মণ্ডিত এক তরুণ। জাহাংগীরের পরিচিত লোক। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ানো যাবে বলেই জাহাংগীর আমাদের জন্য তার টেক্সীটি নিয়েছিল। ভোরে নাস্তা করে রোদ উঠার আগেই যাত্রা করলাম। আমি, বুলবুল, হুদা সাহেব, মিসেস হুদা ও জাহাংগীর। পথে যেতে যেতে হঠাৎ একদিকে পাহাড়ের ধারদেশ বেয়ে যাওয়া একটি পাকা নালা দেখিয়ে জাহাংগীর বলল এইটাই সেই খলিফা হারুনর রশিদের স্ত্রীর খনন করা পানির নহর। শুনেই আমি ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললাম। এটা দেখতে হবে। অন্য সব সাথীরা একটু বিরক্তি প্রকাশ করল, ময়দানে আরাফাতে পৌছতে দেরী হয়ে যাবে বলে। বললাম ঐতিহাসিক এই স্মৃতি "নাহারে জোবাইদা" এর ধার ঘেষে যাবো অথচ সেটা দেখবো না এটা কেমন কথা। হজ্ব শেষ হয়ে গেছে। আমরা বিমানের নির্ধারিত ফ্লাইটের প্রতিক্ষায় আছি মাত্র। এ সময় এই ঐতিহাসিক নহর দেখে না গেলে অন্যায় হবে, অপরাধ হবে। যুক্তি মেনে হুদা সাহেব গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। সকলেই হেঁটে গিয়ে পাহাড়ের ধারদেশে বেশ কিছু উপরে উঠলাম–দেখলাম পাকা এক নালা উপর দিকে ও ঢাকা। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলতে চলতে এক জায়গায় কিছু অংশ খোলা দেখলাম। নালাটি প্রস্থে ৩/৪ ফুট। গভীরতা ৪/৫ ফুটের বেশী হবে না এবং মাঝে মাঝে এই নালা থেকে পানি বেরুবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে শুষ্ক তাতে কোন পানি নেই। খলিফা হারুনর রশিদের স্ত্রী মালেকা জোবাইদা স্বপ্নাদিষ্ঠ হয়ে হজব্রত পালনে মক্কায় এসে হাজীদের পানির অভাব নিবারণ করার উদ্দেশ্যে এক লক্ষ দিনার ব্যায়ে ২৫ মাইল দূর হতে হিজরি অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে একটি খাল খনন করে মক্কায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এই খাল ন–হ–র–ই জোবাইদা নামে ইতিহাসে খ্যাত। কিন্তু স্বচক্ষে যা দেখলাম তা হল মাটিতে খনন করা কোন খাল নয়। এটি হল একটি পাকা নালা। বর্তমান যুগের বৃহৎ আকারের পাইপ লাইনের মত। তাই আমার ধারণা পাল্টে গেল। ইতিপূর্বে আমার ধারণা ছিল নহরে জোবাইদা একটি খাল যার মধ্য দিয়ে পানির স্বাভাবিক স্রোত প্রবাহমান। কিন্তু দেখলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে পানি সরবরাহের প্রশংসনীয় এই ব্যবস্থা। ২৫ মাইল দীর্ঘ পথের মধ্যে অন্যত্র কোথাও মাটিতে খাল খনন করা আছে কিনা, এখানে পাহাড়ের পাদদেশ বয়ে গেছে বলে পাকা ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে কিনা সে তথ্য কেউ দিতে পারল না। এই নহর–ই–জোবাইদা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজনে পরিত্যক্ত এবং অকেজো। ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি বর্তমান সৌদি সরকার আধুনিক পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে পানির প্রাচুর্যে মক্কা মদিনা ভেসে যেতে পারে ক্ষণিকের

www.pathagar.com

মধ্যেই। সৌদি সরকার ১৯৮১ মনে একবার সেটা করে ও ছিলেন। সে বৎসর কতিপয় ভিন্ন মতাবলম্বী লাশ বহনের খাটে করে অস্ত্র সস্ত্র বহন করে হেরম শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কাবা দখল করার চেষ্টা করলে সরকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। নিষিদ্ধ এলাকা, শান্তির এলাকা, নিরাপদ এলাকা অস্ত্রের ঝনঝনানিতে, গোলাগুলির আওয়াজে ভরে যায়। পবিত্র কাবা চত্বর রঞ্জিত হয়ে যায় টকটকে লাল তাজা রক্তে। অনেকেই নিহত হয়, অনেকেই আত্মসমর্পণ করে। আবার অনেকেই চারিদিকে মসজিদুল হারামের ভূমিতল (আন্ডার গ্রাউন্ড) কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখান থেকে বের করতে অসমর্থ হয়ে সেখানে নল দিয়ে উষ্ণ পানি ঢেলে দিয়ে উষ্ণ জল প্লাবনের সৃষ্টি করে নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয় সকল বিদ্রোহীকে। একটি প্রাণী ও প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে বেরুতে পারেনি। তার পর থেকে হেরমের প্রত্যেকটি দরজায় বসানো হয় কড়া প্রহরা। প্রত্যেক হাজীর গাট্টি বোস্কা, থলে প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পরেই মিলে প্রবেশের অনুমতি। মহিলাদের বেলায় ও রেহাই নেই, বরং কড়াকড়ি আরও বেশী। কাল বোরখা দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত বিরাট বপুধারী কালো একটি মেয়ে গেটের ধারে চেয়ারে বসে আছে। বোরখার গোল গোল ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোন মহিলার পক্ষে হেরম শরীফে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এই চেকিং এর কারণে প্রায় সময় বিরক্ত হয়ে যেত বুলবুল। খাবার জন্য একবার দুটি আপেল নিয়েছিল সে তার ব্যাগের মধ্যে। মহিলা পাহাড়াদারের কালো হাতটি ব্যাগের বাইর থেকে তার উপর পড়লে সম্ভবতঃ বোমা সন্দেহে আঁতকে উঠেছিল। ব্যাগ খুলে স্বস্তি পেল। কিন্তু কলম কাটা ছুরি, কাঁচি, অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন ক্ষুদ্র কোন বস্তু ও সাথে নিয়ে প্রবেশের অনুমতি মিলে না।

এই সেই নহর-ই-জুবাইদা, খলিফা হারুণ-উর-রশিদের বেগম জুবাইদা স্বপ্নে দেখলেন-সকল মানুষ, পশু পাখী, কীট, পতঙ্গ সকলেই তার সাথে যৌন সঙ্গম করছে। স্বপ্ন বৃত্তান্তের তা'বির করা হল-রাণী জুবাইদা এমন একট মহৎ কাজ করবেন যারদ্বারা দুনিয়ার সকল মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই উপকৃত হবে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে মক্কায় হজ্ব করতে এসে হাজীদের পানির অভাব দেখে এই নহর খনন করিয়েছিলেন। এককালে এই নহর-ই জুবাইদাই ছিল মক্কায় পানি সরবরাহের প্রধান উৎস। জুবাইদার স্বপ্ন সফল হয়েছিল। কিন্তু এই নহরের সেই যৌবন আজ আর নেই। নেই তার ভিতর স্রোতস্বীনির সেই ফলগুধারা। আজ সে বৃদ্ধা, বন্ধ্যা, তাই পরিত্যক্তা। নেই তার সেই কদর, সেই মর্যাদা। ইতিহাসের এক মৌন নীথর নীরব স্বাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে আমারই মত দু'একজন অভাজনের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসা মিঠাবার জন্য।

নহর-ই-জুবাইদা দর্শন শেষে গাড়ী আবার চললো তীর বেগে। জাহাংগীর আশ পাশের অনেক কিছু দেখালো। সব কথা মনে নেই। আমি কোন নোট নিইনি বা ডায়েরী ও লিখিনি। শুধু মাত্র স্মৃতি থেকেই লিখে যাচ্ছি। তাই সব খুঁটি নাটি

www.pathagar.com

গুচিয়ে বলা সম্ভব নয়। চলার পথে রাস্তার ধারে একস্থানে নাতি উচ্চ এক পাহাড়ের উপর খাড়াভাবে বিচ্ছিন্ন একটি শিলাখণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। এই শিলাটির আকৃতি এরূপ যে ইহাকে একটি মনুষ্য মূর্তি হিসাবে ও কল্পনা করা যায়। জাহাংগীর এই প্রস্তর খন্ডটির প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল–এটি এক বুড়ী। হিজরতের সময় হজরত (দঃ) এই পথে গিয়েছিলেন। বুড়ী তা দেখেছিল এবং পশ্চাদধাবণকারী শত্রুপক্ষের লোকদের কাছে হুজুর (দঃ) এর গমন পথ ফাঁস করে দেওয়ার অপরাধে হুজুরের (দঃ) অভিশাপে তার এই প্রস্তর মূর্তির রূপ ধারণ। জাহাংগীর শিক্ষিত লোক। এরূপ ভিত্তিহীন কল্প কাহিনী কোত্থেকে সংগ্রহ করেছে জানি না। সম্ভবতঃ এগুলো কিংবদন্তী হিসাবে স্থানীয়ভাবে চালু আছে। কিন্তু তারা জানে না যেই হুজুর (দঃ) এর প্রতি মক্কাবাসী, তায়েফবাসী লোকজন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছে, অত্যাচার নিপীড়নের পরাকাষ্টা দেখিয়েছে, হুজুরের (দঃ) পবিত্র দেহে তরবারীর আঘাত হেনেছে, রক্তপাত ঘটিয়েছে তাদেরকে নবীজি (দঃ) কোনদিন অভিশাপ দেননি বরঞ্চ দোয়া করেছেন হেদায়েতের জন্য, এই বলে যে–"আল্লাহ এরা জানে না এরা কি করছে। তুমি তাদেরকে হেদায়েত দান কর, সত্যপথের সন্ধান দাও"। সেই রহমতল্লিল আলামিন পথ বাতলিয়ে দেবার সামান্য অপরাধে এহেন অভিশাপ প্রদান করার উক্তি নবী (দঃ) এর চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

গাড়ী এসে থামল জবলে রহমতের পাদদেশে। জবল শব্দের অর্থ পাহাড়। রহমত অর্থ করুণা। সুতরাং জবলে রহমত অর্থ করুণার পাহাড়। আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম এখানে এসে আল্লাহর করুণা লাভ করেছিলেন। তাই এ পাহাড় আল্লাহর করুণা লাভের স্থান হিসাবে চিহ্নিত। এ পাহাড় পাপ মার্জিত হবার, অনুতাপ গৃহীত হবার স্থান হিসাবে ও সুনির্দিষ্ট বটে। শেষ নবী (দঃ) এখান থেকেই তাঁর শেষ বাণী, ঐতিহাসিক খোতবা প্রদান করেছিলেন তদানিন্তন ও অনাগত মানব সমাজের উদ্দেশ্যে। হজ্বের দিন ইচ্ছা থাকলে ও এখানে আসা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তাই যারা অনুসন্ধিৎসু, জ্ঞান পিপাসু তারা হজ্বের পূর্বে বা পরে সুযোগ মত একবার এই পবিত্র স্থানে আসার চেষ্টা করেন।

পাহাড়টির পাদদেশে কিছু দূরে দূরে দুটি পানির নল আছে। সেখানে গিয়ে একে একে সকলেই অজু করে নিলাম। অগ্রসর হলাম পাহাড়ের গোড়ার দিকে। ইতিমধ্যে আমাদের মত আরও কয়েকটি যাত্রীদল এসে গেছে। তবে সম্ভবতঃ দূরে অবস্থিত ও ভ্রমণ ব্যয় সাপেক্ষ বলে অথবা অজ্ঞতার কারণে অনেকে এখানে আসাটা সময় নষ্ট করা বলেই মনে করে থাকেন। পাহাড়ের গোড়ায় দেখলাম দুইতিন জন ছবিওয়ালা পুষ্প সজ্জিত উঠ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঠের পাশে একটি সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা উটের পিঠে উঠে। পাঁচ রিয়ালের এওজে একটি করে তাৎক্ষণিক ভাবে রঙীন আলোক চিত্র সংগ্রহ করে স্মৃতি হিসেবে নিজ নিজ দেশে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

গোড়া থেকেই বাঁকে বাঁকে একটি সিঁড়ি চলে গেছে উপরের দিকে। বুলবুল আর মিসেস হুদাকে বললাম, দেখ–"শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কান্থা, শনৈঃ পর্বতঃ লঙ্ঘনম।" পথ চলতে, কাঁথা সিলাতে, পর্বত আরোহনে মন্থর গতি অবলম্বন কর। শক্তির অপচয় হবে না। শীর্ষে আরোহন সহজ সাধ্য হবে। কিন্তু যাত্রার সময় দেখলাম মনের আবেগে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে চরণ তাদের চঞ্চল হয়ে গেছে। গতির মধ্যে এসে গেছে বেগ। আমাকে তাড়া দিয়ে দ্রুত পায়ে অনায়াসে উঠে গেল জবলে রহমতের শীর্ষ দেশে। ৩০০ ফুট উঁচু এই পাহাড়। শীর্ষ দেশ সমতল। সেই সমতল ভূমির মধ্যখানে একটি পাকা স্তম্ভ। সম্ভবতঃ দর্শনার্থীদের পাহাড়টি চিহ্নিত করতে যাতে কোন বেগ পেতে না হয় সেইজন্য এই স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই মালভূমিতে দাঁড়িয়ে কেবলা মুখী হয়ে সকলকেই দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করতে দেখলাম। আমরাও তাই করলাম। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম আকুল চিত্তে, এহেন মোবারক স্থানে আসার অনন্য সুযোগ প্রদান করেছেন বলে।

স্তম্ভটির চারিদিকে সামান্য উঁচু প্ল্যাটফরম। সেখানে বসে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম দিগন্তের পানে। নয়ন ভরে দেখলাম ময়দানে আরাফা। এক কালে এই মাঠ ছিল ধূসর বালুকাময় এক মরুপ্রান্তর। নিদাগ দুপুরের রৌদ্র কিরণে জবলে রহমত থেকে যে কোন দিকে তাকালে দেখা যেত চিক্ চিক্ করছে মরুসাগরের বালি, মায়া মরিচিকা। সে দৃশ্য আজ নেই। আজ সমগ্র নয়/দশ বর্গমাইল বিস্তৃত এই ময়দানে আরফার বেশ কিছু অংশ পরিপূর্ণ হয়ে আছে সবুজের শ্যামলিমায়। যে দিকেই থাকাই শাখা প্রশাখায় পল্লবিত কচি কচি নিমতরুর সারি। মনে হয় যেন ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান।

ময়দানে আরাফাকে সবুজায়ন করার জন্য সউদী সরকার এক দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। নিমগাছ একবার উঠে গেলে নাকি সহজে মরে না। তাই এখানে লাগানো হয়েছে শুধু লক্ষ লক্ষ নিমতরু, সারিবদ্ধভাবে, পরিকল্পনা মোতাবেক। এগুলো চারা গাছ। অর্থাৎ বেশী দিন হয়নি লাগিয়েছে। পাইপ লাইন দিয়ে পানি সেচের ব্যবস্থা করে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ খাতে অকাতরে সউদী সরকার কোটি কোটি রিয়াল ব্যয় করে যাচ্ছে। সউদী সরকারের এই মহৎ পরিকল্পনা যদি সফল হয় আরাফার মরুপ্রান্তর রূপান্তরিত হয়ে যাবে সবুজ শ্যামলা, গিরি কুন্তলা এক অনুপম, মনোহর, নয়ন জুড়ানো উদ্যানে। সত্যি সত্যি যদি সে দিন এসে যায় এখানে হাজীদের তাঁবু খাটানো, শিবির স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা হয়তঃ আর থাকবে না। এই বৃক্ষরাজির সুশীতল ছায়াতলেই স্বল্পক্ষণের অকুফে আরাফা সমাধা করা অসম্ভব হবে না।

করুণার পাহাড় থেকে অবতরণ করে তার পাদদেশে দন্ডায়মান পুষ্পসজ্জিত একটি উটের পাশে দাঁড়ালাম। অতি শান্ত প্রকৃতির পশু উট নামক মরুর এই বাহন। দাঁড়িয়ে আছেত আছেই। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই, প্রতিবাদ নেই। নেই কোন ক্ষোভ। দেখলাম আমাদের সামনে সিঁড়ি বেয়ে উটের পিঠে উঠে গেল

www.pathagar.com

ভিনদেশী এক দর্শনার্থী। ক্যামেরাওয়ালা অদূরে মাটিতে হাঁটু ভাঁজ করে বসে ক্লিক্ করে ছবি তোল্‌ল। নেমে আসার প্রায় সাথে সাথেই রোদের মধ্যে একটু নেড়ে শুকিয়ে ছবিটি তার হাতে দিয়ে দিল। কৌতূহলের বসে আমরা ও একটু দেখলাম। বেশ সুন্দর চমৎকার রঙীন ছবি পুষ্পসজ্জিত উষ্ট্র পৃষ্টে, করুণা গিরির পট ভূমিকায়। মনে হল যেন নওশা চলেছে দুলহানের গৃহাভিমুখে। বুলবুলকে বললাম উষ্ট্র পৃষ্টে উঠ। তোমার একটা এমনি সুন্দর ছবি নিই। কিছুতেই রাজী হল না। জাহাংগীরের তাড়া খেয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

অতঃপর মসজিদে নিম্‌রার সামনে এসে গাড়ীর গতি রুদ্ধ হল। প্রশস্থ রাস্তার পাশে এই মসজিদ-ময়দানে আরাফার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। হজ্বের দিন এই মসজিদটিই এবং তার অভ্যন্তরের ও আশে পাশের দৃশ্যাবলী সৌদি সরকার টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করে থাকেন। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশের মানুষেরা হজ্বের দিন টেলিভিশনের মাধ্যমে এই দৃশ্য অবলোকন করেন। এখান থেকেই বাদশা বা তাঁর প্রতিনিধি হজ্বের দিন সমাগত তীর্থ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে খোৎবা বা ভাষণ দান করেন। হজ্বের দিন এই মসজিদের কাছে ঘেষা বলতে গেলে এক রকম দুঃসাধ্য ব্যপার। এখানে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। কিন্তু আজ দেখলাম মসজিদটি এবং তার আশে পাশের সমগ্র এলাকা একেবারে ফাঁকা, জন বিরল। কোথাও একটি মানুষের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায় না। মূল মসজিদটি পুরনো হলে ও বর্তমান মসজিদটি অত্যন্ত আধুনিক, আয়তনে বিরাট বিশাল, বড় বড় কাঠের দরজা ও কাঁচের জানালা। মসজিদটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। তালাবদ্ধ, কপাট খুলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। খুলে দেবার জন্য কোন লোকজনের সন্ধান মিলেনি আশে পাশে কোথাও। বারান্দায় দাড়িয়ে কাঁচের জানালা এবং কাঠের দরজার ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে দেখলাম অভ্যন্তর ভাগ। মসজিদ ভবনের তুলনায় বারান্দাটি তত প্রশস্থ নয়। বারান্দায় ধূলিবালি পড়ে এমন অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে যে বারান্দায় জায়নামাজ পেতে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা ও অস্বস্তিকর। বারান্দার সাথে অবস্থিত প্রশস্থ সড়ক। এখানে আমাদের দেশের মসজিদ গুলির মত সম্মুখে কোন চেহেন বা উন্মুক্ত চত্বর নেই।

জবলে নূর—হেরা গুহা

আরাফাতের মাঠে বিভিন্ন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে অত্যন্ত সুক্ষ্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী। ফলে হজ্বের দিনে ও যেখানে ৩০/৩৫ লক্ষ আদম সন্তান এক সাথে অবস্থান করে, সেখানে এই সব সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে তেমন কোন অসুবিধা হয়না। কখনো যদি যানজটের সৃষ্টি হয় সেটা হয় মানুষের ভীড়ের জন্যে, না হয় যানবাহনের আধিক্য হেতু। এমনি একটি রাস্তা ধরে ময়দানে আরাফা ত্যাগ করে গাড়ী এসে থামল জবলে নূরের পাদদেশে। 'নূর' মানে জ্যোতি অর্থাৎ জ্যোতির পাহাড়। এই পাহাড়ের শৃঙদেশে অবস্থিত পবিত্র হেরা গুহা, যেই নিবৃত পর্বত গুহায় বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) গভীর ধ্যানে তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। হেরা

www.pathagar.com

গুহার এই নিবৃত প্রকোষ্টে ধ্যানে মগ্ন থাকাকালীন ২৬শে রমজান, শবে কদর রাত্রে হযরত জিব্রাইল (আঃ) তৌহিদের প্রথম বাণী "ইক্‌রা বে ইছমে রাব্বিকা" অর্থাৎ "পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে" নিয়ে আসেন। এখানেই হযরত (দঃ) সর্বপ্রথম ঐশীবাণী লাভ করেছিলেন। নিরক্ষর নবী পাঠ করতে জানেন না বলে জানালে পুনরায় বলা হল– "পাঠ কর আল্লাহর নামে"। তারপরেও পাঠ করতে না পারায় হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে জোরে চাপ দেয়ার পর পড়তে শুরু করলেন আল্লাহর নবী (দঃ)। এক অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোর্তিময় হয়ে যায় গোটা পাহাড়। এখান থেকেই শুরু হয় দ্বীনে ইসলাম। ৬১০ খৃষ্টাব্দের পবিত্র রমজান মাসের ২৭শে তারিখের গভীর রাত্রে ঐশীবাণী পাঠ করে দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন হযরত (দঃ) এবং শুরু হয় দ্বীন ইসলামের প্রচার। দ্বীনে ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় আরাফাতের ময়দানে দশম হিজরীর ৯ই জিলহজ্ব মোতাবেক ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ময়দানে আরাফায় জবলে রহমতের সন্নিকটে যেখানে সর্বশেষ ওহি– "আল এওমো আকমাল্‌তু লাকুম দ্বীনোকুম"–আজ আমি তোমার জন্য তোমার দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমার উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমার ধর্ম বলিয়া মনোনীত করিলাম"।

পাহাড়টি বেশ উঁচু, অত্যন্ত খাড়া। নীচ থেকে খাড়াভাবে একটি সরুপথ বেয়ে দর্শনার্থীরা উপরের দিকে উঠছে। পায়ের দাগ পড়ে পড়ে পথটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে এবং স্পষ্টতঃ সেটা নজরে পড়ে। ইচ্ছে হল উপরে উঠে পবিত্র এই গুহাটি একবার দেখে আসি। হুদা সাহেব গেলবার হজ্ব করার সময় হাজী ইউনুস সাহেবের সাথে একবার সেখানে আরোহন করেছিলেন। সে কথা প্রকাশ করে তাঁর অনাগ্রহ দেখালেন এবং বললেন নীচের এই গোড়া থেকে উপরের শৃঙ্গে যেখানে হেরা গুহাটি দেখা যাচ্ছে, সেখানে পৌছতে সময় লাগে ৪৫ মিনিট অর্থাৎ উঠতে নামতে দেড় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। বুলবুল ও মিসেস হুদাকে এত উঁচু পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে তেমন আগ্রহী দেখা গেলনা। বিশেষতঃ ইতিমধ্যে রোদের তীব্রতা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। সুতরাং উপরে যাওয়াটা ও খুব সহজসাধ্য ছিল না। "শনৈঃ পর্বত লংঘনম' প্রবচন টি এখানে কোন কাজে এলনা। আমি একজনের জন্য দেড় দুই ঘন্টা গাড়ী বসিয়ে রাখতে এবং সংগীরা কেহই ততক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকতে রাজী হলেন না। তাই আমার ইচ্ছাকে অবশ্যই অবদমন করতে হল। নীচে থেকেই হুদা সাহেব বর্ণনা দিলেন, এই হেরাগুহা, তার মুখে ক্ষুদ্র একটি পথ দিয়ে সে গুহায় নামা যায়। ভিতরে প্রশস্থ স্থান। অনেকেই সেখানে অবতরণ করে হযরত (দঃ) এর অনুকরণে কিছুক্ষণ বসে থাকেন ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি শীতল পানির বোতল যেটি পাহাড়ের গোড়ায় এক রিয়াল দামে বিক্রি হয়, সেই একই পানির বোতলের দাম এই পর্বত শীর্ষে নাকি হাঁকা হয় ৫ রিয়াল। তখন তৃষ্ণার এমন অবস্থা যে এক বোতল পানির ৫ রিয়াল অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের টাকায় ৪০ টাকা দাম অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী চাহিদার তুলনায় যথার্থ বলেই মনে হয়।

www.pathagar.com

জবলে রহমত, মসজিদে নিমরা, ময়দানে আরাফাতের অন্য কোথাও কোনরূপ ভীড় দেখা না গেলে ও এখানে কিন্তু পর্যটকদের অত্যন্ত ভীড় দেখা গেল। এই পর্বতের পাদদেশে ছোট্ট একটি স্থায়ী বিপণী কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বেশ কয়েকটি পাকা দোকান বিভিন্ন সৌখিন ও মনোহারী পশরা সাজিয়ে রেখেছে। সাথে সাথে আবার খোলা আকাশের নীচে হকাররা বিভিন্ন শীতল পানীয়, ফল মূল ও অন্যান্য পণ্য সাজিয়ে রেখে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। একটি দোকানে ঢুকে পছন্দনীয় কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখছিলাম। তবে হুদা সাহেবের তাড়া খেয়ে গাড়ীতে উঠে বসলাম।

মোজদলেফা

হাজী সাহেবের নির্দ্দেশ মতে আরাফার এই খোলা মাঠে বসে সকলেই সূর্যাস্তের সাথে সাথেই রাত্রির আহার শেষ করে মোজদলেফার উদ্দেশ্যে গাট্টি বোস্‌কা কাঁধে তুলে নিলাম। রাস্তায় গাড়ীর ভীড় একটু কমে এসেছে দেখে হাজী সাহেবের নির্দেশ মতে সকলে বাসে উঠে বসলাম এবং যাত্রা শুরু হল। আরাফাত থেকে বিদায় কালে সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত, চক্ষু অশ্রুসজল, কণ্ঠে উচ্চরবে তলবিয়া, গোটা বাস, 'লব্বায়েকা' রবে মুখরিত। আরাফা হতে মোজদলেফার এই পথেই অবস্থিত "মুহাস্‌সার"--৫৪৫ হাত দীর্ঘ একটি নীচু স্থান। এখানে কাবাঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে দাম্ভিক বাদশাহ আবরাহা নবীজির (দঃ) জন্ম সালে এক বিশাল হস্তী বাহিনী নিয়ে এসে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। পরে আল্লাহর হুকুমে ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পক্ষীর নিক্ষিপ্ত কংখরাঘাতে তার হস্তীযুথসহ বিরাট সৈন্য বাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এইপথে যারা পদব্রজে যাতায়াত করে গজবের স্থান বিধায় এই স্থানটুকু দ্রুতপদে অতিক্রম করে। কিন্তু বাসের গতিতে তেমন কোন তারতম্য করার অবকাশ নেই। কেননা বাসের সামনে পেছনে গাড়ীর বিরাট বহর। ওভারটেক করার কোন সুযোগ নেই।

"মুহাসসার" অতিক্রম করে আমাদের গাড়ী মোজদলেফায় প্রবেশ করল। কিন্তু আমরা দেরীতে যাত্রা করায় মোজদলেফা প্রান্তর প্রায় দখল হয়ে গেছে। রাস্তার দুধারে সারি সারি বাস দণ্ডায়মান। আমাদের বাস থামবার কোন স্থান পাওয়া যাচ্ছেনা। চালক বারবার চেষ্টা করেও বাস থামাবার জায়গা পাচ্ছেনা। দুয়েক জায়গায় থামালেও প্রহরারত পুলিশ ড্রাইভারকে বাস থামাতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিল। আরো কিছুদূর অগ্রসর হবার পর একস্থানে ডান পাশে সামান্য জায়গা পাওয়া মাত্র ড্রাইভার বাস থামাল। জামাই জাহাংগীর ও আরেকজন নেমে গেল। অন্যযাত্রীরা নামবার পূর্বেই পুলিশ এসে বাস তাড়িয়ে দিল। ফলে জাহাংগীররা পুনরায় বাসে উঠবার সময় পেলনা। পরে অবশ্য খোঁজাখুজি করে তারা দলে ভিড়ে ছিল। মোজদলেফার প্রতি স্থান হাজী ইউনুচ সাহেবের নখাগ্রে। এতক্ষণে তিনি লক্ষ্য করলেন যে আমাদের বাস মোজদলেফার সীমানা অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। অথচ মোজদলেফায় অকুফ বা অবস্থান করা হজ্বের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। তা না

www.pathagar.com

হলে হজ্ব অপরিপূর্ণ থেকে যাবে। তাই এবার হাজী সাহেব অত্যন্ত রেগে গেলেন। উচ্চ কণ্ঠে সোচ্ছার করে বলে উঠলেন – তোমরা ড্রাইভারকে জব্দ করো। এখানেই গাড়ী থামাতে বলো। আমরা নেমে পড়ব। নইলে হজ্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তৎমতে ড্রাইভার গাড়ী থামালে সকলে নিজ নিজ মালামাল নিয়ে নেমে পরলাম। কিন্তু ড্রাইভার পার্ক করতে না পেরে, পুলিশের তাড়া খেয়ে গাড়ী নিয়ে উধাও হয়ে গেল। সকলে হাজী সাহেবকে ধরে বসলাম। সাথে আমাদের মেয়ে ছেলে আছে। সকালে মিনায় যাবো কেমনে? হাজী সাহেব শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন–তা আমি জানি না। হজ্ব করতে এসেছো, হজ্ব করবে। আমি এইটুকু জানি। হজ্বের অত্যাবশ্যকীয় আহ্কাম মোজদলেফায় অবস্থান বাদ দিলে হজ্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। চিন্তা করোনা, তোমরা আল্লাহর মেহমান, আল্লাহ তোমাদেরকে মিনায় পৌঁছিয়ে দেবেন। মওলানা জাহাংগীর সহ আরো দুয়েকজন আশ্বাস দিয়ে বললেন যে সকালে কোন একটা যানবাহনের ব্যবস্থা করা যাবে। চিন্তার করণ নাই। সকলে আশ্বস্ত হলাম। বিছানা পেতে মোজদলেফা প্রান্তরে অবস্থান নিলাম। হুদা সাহেব জামাতার খোঁজে পিছন দিকে চলে গেলেন। পরে জাহাংগীরকে সংগে নিয়ে ফিরে এলেন।

মোজদলেফায় প্রকান্ড এক ফ্লাইওভার বা ওভার ব্রীজের অনতীদূরে এবং আরেকটি সড়কের পাশ ঘেষে একটি ত্রিভুজ আকৃতি স্থানে আমরা অবস্থান নিলাম। মোজদলেফাও আরেকটি প্রকান্ড বালুকাময় মরুপ্রান্তর। রাত্রি হলেও উজ্জ্বল স্বচ্ছ চন্দ্রকিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত। তদূপরি আছে সরকারী বিদ্যুৎ বাতি। সুতরাং খোলা আকাশের নীচে রাত্রিযাপন করলে ও এখানে অন্ধকারের রূপ অনুভূত হয় না। দিনের বেলায় প্রচন্ড তাপদগ্ধ হলে ও এখানে আসমানী সামিয়ানার তলে মৃদু সমীরণে গরমের তীব্রতা ও অধিক অনুভূত হয়নি। মোজদলেফা প্রান্তর রুক্ষ। আরাফাতের মত এখানে তরুলতা, বৃক্ষরাজির সমারোহ নেই। সমগ্র আরব এলাকার ন্যায় এখানেও প্রকৃতি অনুদার কৃপণ–নেই কোন তরুতৃণ বা শ্যামলিমার লেশ। তথাপি জিলহজ্ব চাঁদের শুক্লপক্ষের দশমি তিথিতে তারা ভরা রাতের নিদাঘ দুপুরে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলো আর তারার ঝিলিমিলি সেও এক নয়নাভিরাম দৃশ্য !

বিছানা পেতে অন্যান্যের সাথে একটু দুরত্ব বজায় রেখে বুলবুল ও মিসেস হুদাকে বসিয়ে দিয়ে ছুটলাম পানির সন্ধানে। এখানে মিনার মত পানি প্রবাহের আতিশয্য নেই। এমনকি আরাফাতের মত ক্ষীণ ব্যবস্থা ও নজরে পড়েনি। এক ধারে ঢেউটিনে নির্মিত পাশাপাশি অনেক কতগুলো শৌচাগার বিদ্যমান দেখেছি। কিন্তু দেখিনি তার কোন ব্যবহারকারীকে। কেননা এখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই। আরো কিছুদুর অগ্রসর হয়ে ছোট্ট একটি ষ্টল পেলাম। সেখান থেকে কিনে নিলাম বড় বড় দুই বোতল পানি। তাই দিয়ে আমি ও বুলবুল দু'জনকেই শৌচকর্ম এবং ওজুর কাজ অবশ্যই সারতে হল। অতঃপর প্রথামতে মগরীব এবং এশার নামাজ পর পর একসাথে আদায় করলাম। ৯ই জিলহজ্বের দিবাগত এই রাত অত্যন্ত পুণ্যময়, বরকতময় ও মর্যাদাবান রাত। মোজদলেফায় অবস্থানের এই রাতটি দোয়া কবুলের অন্যতম পবিত্রতম রাত্রি। এ রাতের মহিমা ও ফজিলত ছহি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই এখানে কেউ ঘুমাবার জন্য তেমন কোন চেষ্টা করেনি। প্রত্যেকেই

www.pathagar.com

নানাভাবে এবাদত বন্দেগীতে এবং আল্লাহর জিকিরে, স্মরণে ও ধ্যানে মগ্ন থেকেই রাতটি কেটে দিল। মিনাতে শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়ি পাথর এখান থেকে সংগ্রহ করাই রেওয়াজ। অন্যান্যদের মত আমিও আমরা দু'জনের জন্য তা কুড়িয়ে নিলাম।

আরাফাত এবং মোজদলেফায় অবস্থানকাল ভিন্নধর্মী। আরাফাতের অবস্থান দিনের প্রচন্ড সূর্য্য কিরণে তাঁবুর মধ্যে। আর মোজদলেফায় উজ্জ্বল চন্দ্রালোকদীপ্ত রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। অর্থাৎ সূর্য্য যখন আকাশে দেখা যায় সেটি হল আরাফাতে আর সূর্য যখন আকাশে দেখা যায় না সেটি হল মোজদলেফায় অবস্থানকাল। দুটি সময়ই অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ এবং আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাই হাজী সাহেবানরা এই সময়কালকে এবাদতবন্দেগী, দোয়া দরুদ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে বিনীত আকুতি ও মিনতি প্রকাশে সদা যত্নবান থাকেন। অবশেষে পূর্ব আকাশে ধল পহরের আলো উঁকি দিল। ফুলের মত ভোর ফুটে উঠল। যাত্রার সময় হয়ে এল।

মিনার পথে রওয়ানার জন্য সকলেই প্রস্তুত হয়ে গেলাম। সমস্যা দেখা দিল ট্রান্সপোর্টের। কেননা আগেই বলেছি আমাদের বাস পার্ক করতে না পেরে আমাদেরকে ফেলে রাতেই চলে গিয়েছিল। মওলানা জাহাংগীর, জামাই জাহাংগীর ও অন্যান্যরা এদিক ওদিক অনেকদূর ছুটাছুটি করেও এবং অনেক খোঁজাখুজি ও চেষ্টা তদবীর করেও ট্রান্সপোর্টের কোন ব্যবস্থা করতে পারলোনা। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর হাজী সাহেব পায়দল যাত্রার হুকুম দিলেন। সকলে নিজ নিজ গাঁটরী নিজ নিজ কাঁধে তুলে নিলাম। চাদর দুখানা বালিশে মুড়িয়ে সেটি বুলবুলের হাতে দিলাম। হাজী সাহেব বৃদ্ধ লোক। তিনি ইতিপূর্বে অসংখ্যবার হজ্ব করেছেন। বর্তমানে বার্ধক্যহেতু পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে অক্ষম। তাই তাঁর জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। সেটি হল সৌদী আরবে ছোট ছোট ক্ষুদ্র পরিমাণ মালামাল এখান থেকে ওখানে আনা নেয়ার জন্য ছোট ছোট চারি চাকা বিশিষ্ট উন্মুক্ত এক প্রকার ঠেলাগাড়ী ব্যবহার করা হয়। ঐরূপ ছোট্ট একটি ঠেলাগাড়ী হাজী সাহেবের ব্যাগেজের মধ্যে সব সময় অন্তর্ভূক্ত থাকে। সেই ঠেলাগাড়ীটিকেই এখন কাজে লাগানো হল। হাজী সাহেবকে সে গাড়ীর মধ্যখানে বসিয়ে দেয়া হল। পেছন দিক থেকে দুয়েক জন ঠেলতে লাগল। চমৎকার এই ব্যবস্থা দেখে থ' বনে গেলাম। আমাদের বিপদ ছিল সাথের মহিলারা। দেখলাম অনন্যোপায় হয়ে তারাও এতক্ষণে মনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে। হৃদয়ের এই শক্তিতে তাদের পা ও সঞ্চারমান হয়ে গেছে। সকলের সাথে সমতালে তাদের পদ যুগল ও মিনার পথে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বুলবুলের হাতে গাটরী দেখে মওলানা জাহাংগীর তার হাত থেকে সেটি ছিনিয়ে নিয়ে হাজী সাহেবের পেছনে গাড়ীতে বসিয়ে দিল। ফলে পদযাত্রী নারী পেটরা বহন থেকে রেহাই পেল। ওদিকে হাজী সাহেব ও পেছনে হেলান দিয়ে বসতে আরাম বোধ করলেন।

www.pathagar.com

মিনায় প্রত্যাবর্তন

রোদ উঠে যাচ্ছে। রোদের মধ্যে পায়ে হেঁটে এই নাতিদীর্ঘ পথ নারী সমবিভ্যহারে কিভাবে পাড়ি দিব সে ভয় একবার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল। সাথে সাথে তোয়াক্কাল করলাম আল্লাহর উপর। হেঁটে চলেছি ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। কিন্তু রাস্তা দিয়ে চলাটা হল দুষ্কর। পথ দুর্গম নয়, তবে বিভিন্ন যানবাহনের যানজট রাস্তায় লেগেই আছে। আমাদের মত পদযাত্রীর সংখ্যা ও মোটেই কম নয়। মাঝে মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে রাস্তা থেকে নীচে নেমে পাশ কেটে যানজট অতিক্রম করতে হয়। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে মিনার শেড বা পায়ে হাঁটার রাস্তার প্রান্তে এসে পৌঁছে গেলাম টেরই পাইনি। ভেবেছিলাম পায়ে হেঁটে এই পথ পাড়ি দেয়া খুবই কষ্টসাধ্য হবে। অথচ অনায়াসেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়ে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জানালাম।

তাঁবুতে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম, যে হালতে সব রেখে গিয়েছিলাম সবই তেমনিতেই আছে। কেউ এসব স্পর্শ করেনি। শিবিরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব সে 'যো' নেই। আজ ১০ ই জিলহজ্ব মিনায় অনেক কাজ। প্রথমে জামরা-ই-উলায় অর্থাৎ বড় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই কংকর মারা যায়। তবে দ্বিপ্রহরের পূর্বে এটা সমাধা করা ভালো। মহিলা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ মাজুর ব্যক্তিগণ সূর্যাস্তের পরও তা করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু বলা হয়েছে দ্বিপ্রহরের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম, তাই দেখেছি সকলে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করতে এমন মরিয়া হয়ে উঠে যে সেখানে এক প্রচন্ড ভীড়ের সৃষ্টি হয়। যার ফলে ঐস্থানে প্রতি বৎসর একাধিক লোক মৃত্যুবরণ করে। মুফতী আবদুর রহমান সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক আমরা দ্বিপ্রহরের পূর্বে সেখানে যাবার কোন চেষ্টা না করে শিবিরে অবস্থান করে স্নানাহার করে পথ ভ্রমণের ক্লেশ নিবারণে সযত্ন হলাম। দ্বিপ্রহরের পর রমী অর্থাৎ শয়তানকে প্রস্তর মারার জন্য জামরায়ে আকাবার দিকে অগ্রসর হলাম। দ্বিপ্রহরের আগের মত এখন এখানে প্রচন্ড ভীড় নেই। তাই বলে একেবারে ফাঁকাও নয়। প্রথমে মহিলা ৪জন অর্থাৎ মিসেস হুদা, মিসেস হাদী, মিসেস নাদেরুজ্জমা ও বুলবুলকে নিরিবিলি এক নিরাপদ স্থানে বসিয়ে আমরা পুরুষেরা রমীর কাজ শেষ করে এলাম। অতঃপর মহিলাদের রমী করাবার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করলাম। দলের কয়েকজন পুরুষকে আগে রেখে মহিলাদেরকে মধ্যখানে রেখে আমরা নিজ নিজ স্ত্রীর পেছনে থেকে জামরা অর্থাৎ শয়তানের প্রতীক স্তম্ভের দিকে অগ্রসর হলাম। দ্বিপ্রহরের পর বলে ভীড়ের তীব্রতা না থাকায়, এই বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ৩ দিনই আমাদের সাথের মহিলারাও স্বল্প আয়াসে শয়তানকে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়। অতঃপর শিবিরে ফিরে আসি।

এখন তলবীয়া পাঠ বন্ধ। এরপরের কাজ হল কোরবানি দেয়া। শিবির থেকে রমীর জন্য প্রায় মাইল খানেক পথ হেঁটে যেতে হয়। সেখান থেকে ফিরে এসে তার বিপরীত দিকে সমপরিমাণ পথ হেঁটে গেলে পাওয়া যায় কোরবান গাহ্ । অর্থাৎ আমাদের তাঁবুটি জামরা এবং কোরবান গাহ্ এর প্রায় মাঝামাঝিতে অবস্থিত ছিল।

www.pathagar.com

এখন সকলে শ্রান্ত। খুবই অবসন্ন। কোরবান গাহে যাবার জন্য কেহই প্রস্তুত নয়। অবশেষে আমি আর জামাই জাহাংগীর উঠে দাঁড়ালাম। প্রত্যেকে হিসাব করে দম এবং কোরবানির জন্য টাকা দিল। দেখা গেল আমাদের সকলে মিলিয়ে ২টি উট এবং কয়েকটি দুম্বা নিতে হবে। আমি আর জাহাংগীর রওয়ানা দিলাম সেই স্থানের দিকে যেখানে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে নিজের একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কোরবানি দিয়ে ছিলেন। সেখানে যাবার, সে স্থানটি দেখ্বার আমার আগ্রহ প্রথম থেকেই ছিল। সেই কোরবান গাহ্ না দেখে মিনা হতে চলে আসব এটা আমি ভাবতেই পারিনি। তাই শত অবসন্নতা সত্বেও আমি কোরবান গাহের দিকে পা বাড়ালাম, বাংলাদেশ বিমানের দেয়া ছাতাটি হাতে নিয়ে।

শেডের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর বাম দিকে মোড় নিয়ে কোরবানগাহের দিকে এগিয়ে গেলাম। শেড পার হবার সাথে সাথেই রোদের প্রচন্ডতা দেখা দিল। ছাতা ছাড়া অগ্রসর হওয়া আমার মত লোকের জন্য অসম্ভব ব্যাপার। এভাবে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পশু হাটায় প্রবেশ করলাম। এটি হল, যে সমস্ত হাজী সাহেবানরা নিজেরা স্বয়ং কোরবান গাহে উপস্থিত হয়ে নিজে কোরবানির পশু পছন্দ করেন, দরদস্তুর করে পশু কিনেন, স্বয়ং কোরবানি দিতে চান, তাঁদের জন্য। দেখলাম এখানে কোরবানি করা অসংখ্য পশু এই বিস্তীর্ণ ময়দানে পড়ে আছে। সে গুলিকে পাশ কাটিয়ে একধার দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। জবাই করা এসব পশুর স্তুপ অত্যাধিক হয়ে গেলে বুলডোজার এসে সে গুলিকে সরিয়ে দেয়।

কোরবানির গোশতের কিভাবে সদব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে সৌদী সরকার অনেক গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করে, মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত হকদারদের নিকট প্রেরণের মাধ্যমে কোরবানি ও হাদীর অর্থাৎ দম দেওয়া পশুর গোশত যথাযথ ভাবে ব্যবহারের জন্য এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এ কমিটির অন্তর্ভূক্ত। এতদ উদ্দেশ্যে মিনায় "আল মোয়াইসীমু"–আধুনিক আদর্শ কসাইখানা স্থাপন করা হয়েছে এবং একে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। ১৪০৩ হিজরী সনে হজ্ব মৌসুমে সর্বপ্রথম এ প্রকল্পের অধীনে ৭০,০০০ পশু জবাই করা হয় এবং সেগুলো সুদান, জিবুতির শরণার্থীদের জন্য এবং পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী ১৪০৪ হিজরী সালে এক লক্ষ ৮৬ হাজার ১৯৫টি পশু কোরবানি করা হয়। ১৪০৫ হিজরী সালে তিন লক্ষ ৭ হাজার ২৬৬ টি পশু কোরবানি করা হয়। তৎমধ্যে অধিকাংশ পশুর গোশত জিবুতি, বাংলাদেশ, চাদ, ইয়েমেন, মৌরিতানিয়া, মালি, পাকিস্তান ও জর্দানের উদ্বাস্তু শিবিরে প্রেরণ করা হয়। আমাদের এই ১৪০৬ হিজরী সনে এই প্রকল্পের অধীনে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পশু কোরবানির লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথমতঃ কোরবানির গোশত অপচয় রোধ করে বিভিন্ন দেশের দুঃস্থ মুসলমানদের নিকট বিতরণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ যে সব হাজী সাহেবানরা অধিক তাপমাত্রার কারনে বা জ্বরা ব্যাধি হেতু শারিরীক অক্ষমতার ফলে কসাই খানায় যাবার কষ্ট বরদাশ্‌ত করতে পারেন না, তাঁদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। যে সমস্ত হাজী সাহেবানরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোরবানি আদায় করতে ইচ্ছুক, তাঁদেরকে কমিটির হাতে টাকা প্রদান করে নিজের অনুপস্থিতিতে কোরবানি করার ক্ষমতা অর্পণ করতে হয়। এজন্য মক্কা মোকাররমা, জেদ্দা এবং মদিনা আল মনওয়ারায় "আল রাজিহী ফর একচেঞ্জ এন্ড ট্রেডিং" বিভিন্ন শাখা অফিস খুলে রেখেছেন। এই সমস্ত অফিসের যে কোন একটিতে গিয়ে হাজী সাহেবানরা ক্ষমতা পত্রে দস্তখত করে কি জাতীয় পশু কোরবানি করতে চান দরখাস্তে প্রদর্শিত স্থানে টিক মার্ক প্রদান করেন এবং তদানুযায়ী ঐ পশুর মূল্য পরিশোধ করে কুপন সংগ্রহ করেন। যারা এইরূপে কুপন সংগ্রহ করে তাঁদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থেকে কোরবানির ঝামেলা পোহাতে হয়না। কর্তৃপক্ষ আধুনিক কসাই খানায় আধুনিক পদ্ধতিতে এগুলো জবেহ করে হিমাগারে সংরক্ষিত করে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু কোরবানির পরে মাথা মুন্ডন করে এহরাম মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হয়, তাই কখন কোরবানি হল বা না হল সেটা না জেনে হাজী সাহেবানরা কখন মাথা মুড়িয়ে এহরামমুক্ত হবেন এবং কোরবানিদাতার অনুপস্থিতিতে আধুনিক কসাইখানায় আধুনিক পদ্ধতিতে জবেহ করা ইত্যাদি নিয়ে শরীয়তের প্রশ্ন উঠতে পারে বিবেচনায় "আল রাজিহী মুদ্রা বিনিময় ও তেজারতী কোম্পানী" হাদীস শরীফের উদৃতি সম্বলিত এ সম্পর্কিত ফতোয়া সংগ্রহ করে তা ছাপিয়ে হাজী সাহেবানদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।

আল মোয়াইসীমু-আধুনিক কসাইখানায় কোরবানির অনুষ্ঠান তদারকির জন্য প্রতি ৩০জন হাজী একজন হাজী সাহেবকে প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারেন। ঐ প্রতিনিধিকে কসাইখানার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য একটি প্রবেশ পত্র দেয়া হয়। তিনি ইচ্ছা করলে কোরবানিদাতা হাজী সাহেবানদের জন্য জবাই করা কয়েকটি পশু নিয়ে ও আসতে পারেন। আমরা কিন্তু এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোরবানি দেয়ার কথা ভাবিনি। সকলে উপস্থিত থেকে পছন্দমত পশু সংগ্রহ করে কোরবানি দেবার ইচ্ছা ছিল সকলের। কিন্তু ভ্রমণের ক্লেশ এবং গ্রীষ্মের ভীষণতার দরুণ আমিও জাহাংগীর ছাড়া দলের আর কেউ কোরবান গাহ্‌তে আসতে সাহস পাননি। আমাদের দুটি উট কিনতে হবে। সুতরাং প্রথমেই উট সংগ্রহ করবার জন্য বাজারের অভ্যন্তরে ঢুকে গেলাম। বেশ কয়েকটি উট দেখলাম, কিন্তু দরাদরিতে জাহাংগীরের সাথে বনিবনা ও হল না। কে একজন বলল আরো অভ্যন্তরে গেলে আরো সুবিধাজনক দামে আরো তাজা ও বলিষ্ট উট পাওয়া যাবে। রৌদ্রতাপের তীব্রতা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলাম ভেতরের দিকে। এসে হাজির হলাম উটের পালের মধ্যে। আমি উট পছন্দ করি, জাহাংগীর উটের মালিকের সাথে দরাদরি করে। মাঝারি ধরনের একটি উট বেশ মোটা ও তাজা, শরীয়তের দিক থেকে নিখুঁত। উটের মালিক

www.pathagar.com

২ হাজার রিয়াল দাম হেঁকে বসল। ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতার দরুণ আমি নীরব সাক্ষী হিসাবে দণ্ডায়মান থাকলাম। জাহাংগীর আনা, আন্‌তা, রফি, আহাদা–আশারা, আছ্‌না আশারা করতে করতে অবশেষে ১৬০০ রিয়ালে গিয়ে উটটির স্বত্বাধিকার লাভ করে রসিটি হাতে পেল। এবং পাল থেকে বের করে হাঁটিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে টাকা গুনে দিল। আমরা একটি একটি করেই কোরবানি দিয়েছিলাম। প্রথম উটটি কার কার ভাগে দিব হিসাব করে কোরবানি দিবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এখন জবেহ করা নিয়ে দেখা দিল সমস্যা। জবেহ করবার জন্য দাম হেঁকে বসা হল ৫০ রিয়াল। এবং এটিই নাকি ফিক্সড রেট। অবশেষে গাঁট থেকে ৫০ রিয়াল খুলে আল্লাহর নামে উটটি জবেহ্ করা হল। একই পাল থেকে একই দরে আরো একটি উট নিয়ে একইভাবে কোরবানি দেয়া হল। অতঃপর দুম্বা।

উটটি জবেহ করার পর সাথে সাথেই দেখলাম একজন বয়স্ক লোক এবং তার দুই ছেলে প্রথম উটটির চামড়া ছিলতে শুরু করল। আমি কিছু বুঝতেই পারিনি। কিন্তু জাহাংগীর আমাদের পরিষ্কার চাটগাঁর ভাষায় তাদেরকে সম্বোধন করে বলল–"তোমরা আমাদের অনুমতি নিয়ে তবে তো গোশত নেবে?" বয়স্ক লোকটি আমাকে অবাক করে চাঁটগার ভাষাতেই জাহাংগীরের কথার জবাব দিয়ে বলল– আপনারা মানা করলে নেব না। আপনারাতো নেবেন না, তাই আমরা চামড়া ছিল্‌তে শুরু করেছি। জাহাংগীর শর্ত দিল ঠিক আছে তোমরা নাও তবে আমাদের জন্য কিছুটা গোশ্‌ত বের করে দিতে হবে। তারা রাজী হল। পরে জানতে পারলাম এরা টেকনাফের অধিবাসী। এদের মত বেশ কিছু সংখ্যক লোক সৌদী আরবের এখানে ওখানে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে এবং বিভিন্নস্থানে শ্রম দান করে জীবিকা নির্বাহ করে।

আমাদের দেশে বিক্রীর জন্য যে রূপ যত্নসহকারে পশুর চামড়া ছিলা হয় দেখলাম এখানে তার ধার ধারে না। এখানে পশুর চামড়ার দাম নেই তাই কদর ও নেই। অর্থাৎ সম্পদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ অপচয়। সৌদী সরকার কোরবানির পশুর গোশ্‌ত বিতরণের ব্যবস্থা করলেও চামড়া এবং হাড়ের যথোপযুক্ত ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা আমার গোচরীভূত হয়নি। তাই দেখলাম টেকনাফের লোকটি চামড়া শুদ্ধ উটের আস্ত একটি রান কেটে নিল। ঘরে নিয়ে ধীরে সুস্থে চামড়াটি তুলে ফেলবে। আমার জন্যে কিছু গোশত ওখান থেকে বের করে দিতে বলায় সে উটের পেটটি কেটে ভিতরের বঁটু (চাঁটগার ভাষায় কলিজা, ফুসফুস, গোরদা কনঠনালী প্রভৃতিকে একযোগে বঁটু বলা হয়) টি আমাকে দেখিয়ে বলল–হাজী সাহেব, আপনাকে এটিই দিয়ে দিই। আমি বুঝতে পারিনি। এতেই আমি রাজী হয়ে গেলাম। তাইগোটা বঁটুটি আমাদের ভাগ্যে পড়ে গেল। পরে বুঝেছি সে তার পরিশ্রম লাগবের জন্য এবং তার মাংসের ভাগে কমতি না হবার জন্য অতি সহজেই বঁটুটি আমার ভাগে দিয়ে পার পেয়ে গেল। পরে বলল যে হুজুর 'চুট' থেকে আপনাকে কিছু দিই। আমি তাতে ও রাজী হলাম। চুটের কিছু অংশ ও আমার ভাগে পড়ল। অবশ্য গোশত ও কিছু পেয়েছিলাম। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় উটটি থেকেও কিছু গোশ্‌ত সংগ্রহ করে নিলাম।

www.pathagar.com

এভাবে কোরবানি, দম দেবার পালা শেষ হল। এখন শিবিরে ফেরার পালা। বটু গুলি ভাগে পড়ায় গোশতগুলি বেশ ভারী বোধ হল। আমাদের পক্ষে বহন করে শিবিরে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। দেখলাম এদিকে ওদিকে ছুরি হাতে কিছু নিগ্রো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এরা ও সৌদি আরবের অধিবাসী। তবে দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত। এরা হয়তো কারো অনুরোধে অর্থের বিনিময়ে কোরবাণির পশুর চামড়া ছিলে মাংস নিয়ে দেয় অথবা অন্যান্য ছোট খাট ফাই ফরমাস খাটে। এরূপ একটি ছেলেকে আমাদের গোশত গুলি শিবিরে পৌছে দিতে বললে সে ১০ রিয়াল চাইল। আমরা অত্যধিক মনে করে একটু ইতস্ততঃ করে ৮ রিয়াল পর্যন্ত বললাম। সে রাজী না হয়ে অন্যদিকে চলে গেল। পরে ১০ রিয়াল দিয়েও তাকে আর রাজী করানো গেল না। অনেক খোঁজাখুজির পর আর একটি ছেলেকে পেলাম, সে কোরবানগাহ থেকে শেডের গোড়া পর্যন্ত এসেই গোশত গুলো একখানে রেখে আর যাবে না বলে সাফ জবাব দিয়ে দিল এবং তার পাওনা মিটিয়ে দিতে বলল। কোনরূপ তর্কাতর্কি করলে লোক জমে যাবে, পুলিশ এসে যাবে এরূপ একটা আশংকায় তাকে ১০ রিয়াল দিয়ে বিদায় করে দিলাম। উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন যে এখানে কোন কুলি মুঠে পাওয়া যায় না। আমাদের মত একজনের বোঝা আরেকজনের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবার রেওয়াজ এদেশে নেই। এখানে ইয়ানফ্সী অর্থাৎ 'খোদমদদ্' নীতিই অনুসৃত হয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে আরেকটি ছেলেকে ডেকে ফুসলিয়ে গোশত গুলো তার মাথায় তুলে দিয়ে শিবিরে পৌছে দিতে অনুরোধ করলাম। তাকে কিছু পয়সা দেবো বলে লোভ ও দেখলাম। শেডের মধ্য দিয়ে সে বেশ কিছুদূর নিয়ে আসার পর সম্ভবত অনভ্যাস বশত ক্লান্ত হয়ে গোশতগুলো একস্থানে ফেলে রেখে কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করে উধাও হয়ে গেল। কিছু পয়সা দেবার জন্য খোঁজে ও তাকে আর পেলাম না। হাঁটবার সময় আমি একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। জাহাংগীরের কাছে আসতেই সে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে উপায় কি জানতে চাইল। এখানে আর কাউকে পাওয়া গেল না। বললাম, ঠিক আছে এবার খোদ্মদদ্। একদিকে তুমি ধর, অপরদিকে আমি। কিন্তু আমি বয়সে প্রবীণ, সে তরুণ। সম্পর্কে আমি তার শ্বশুরের বন্ধু। সুতরাং জাহাংগীর এখানে আমার প্রতি শ্বশুরবৎ সন্মান প্রদর্শন করে আমাকে ধরতে দিল না। সে একাই বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল, গোশ্তের থলে। শিবিরে পৌছে কোরবানি হয়ে গেছে সংবাদ পেয়ে মেয়েরা চুল কেটে এহরাম মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। গোশতগুলো দলের সকলের জন্যই এনেছিলাম। খুলে এক খন্ড গোশ্ত হাতে নিয়ে যখন বললাম এটি চুটের গোশ্ত সকলকে ভাগ করে দিতে হবে। সাথে সাথেই মিসেস হুদা মন্তব্য করলেন উটের চুটের গোশত খায় নাকি? অবাক হয়ে গেলাম মুহূর্তের জন্য ! উটের পিঠে হজরত আলীর (রাঃ) কবর এরূপ একটি কিংবদন্তীর্ কথা ছেলে বেলায় শুনেছি। হযরত আলী (রঃ) শাহাদাত বরণের পর মাটি পানি কেহই তার পবিত্র শব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে পর তাঁকে উটের পিঠে কবর দেয়া হয়। সেই সুবাদে উটের চুট এত বড় উঁচু। উটের পৃষ্টে হযরত আলীর (রাঃ) কবর এরূপ একটি ধ্যান ধারণা আতিশয্য বাদিরা সরল

www.pathagar.com

প্রাণ অবুঝ মুসলিমদের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এরা জানেনা হযরত আলী (রাঃ) র মৃত্যু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসের চরমতম মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত কারবালা প্রান্তর হতে ৭২ কিঃ মিঃ দূরে ইরাকের নজফে হযরত আলীর পবিত্র মাজার বিদ্যমান। শত শত পর্যটক সেখানে জেয়ারতের জন্য প্রতিদিন ভীড় জমায়। জাহাংগীর বুদ্ধি করে নিয়েছিল উটের নড়লী বা কণ্ঠনালীটি। প্রবাদ আছে উটের কণ্ঠনালী হাঁফানী রোগের মহৌষধী। সুতরাং সেটি যেন সকলের ভাগে পড়ে সে সম্পর্কে ও বলে দিয়েছিলাম। এ সম্পর্কে দেখলাম সকলেই সজাগ এবং একমত। উটের কণ্ঠনালীর হিস্যা নিবার জন্য সকলের মধ্যে সমান আগ্রহ লক্ষ্য করলাম।

১০ই জিলহজ্বের এই দিনটি হাজীদের জন্য সবচেয়ে ব্যস্ততম দিন। সকালে মোজদলেফা হতে মিনায় পৌছে রমী বা প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য ছুটে যেতে হয় জামরায়। সেখান থেকে এসে যেতে হয় কোরবান গাহে। কোরবানি দিয়ে হালক বা মাথা মুন্ডন করে ছুটে যেতে হয় তাওয়াফে জেয়ারতের জন্য খানায়ে কাবার দিকে। তাওয়াফে জেয়ারত শেষে কোথাও অবস্থান না করে অনতিবিলম্বে মিনায় ফিরে আসাই শরীয়তের বিধান। সুতরাং অবসর নেবার অবকাশ নেই।

আমি আর হুদা সাহেব দু'জনে হালক বা মাথা মুন্ডনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম স্নানাগারের অনতিদূরে একটু উঁচু স্থানে বসে একজন সিলেটী ভদ্রলোক সেভ করার সেইফটি রেজার দিয়ে হাজী সাহেবদের মাথা মুন্ডন করছে। লাইন ধরে অপেক্ষা করে অবশেষে সুযোগ পেলাম। সিলেটের ভাষায় গিজ্‌গিজ্ করতে করতে তার ভোতা ব্লেডটি যখন মাথার উপর দিয়ে টানতে লাগল মনে হল যেন সাঁড়াশি দিয়ে মাথার উপর কর্ষণ করা হচ্ছে। মেওয়ার আশায় ধৈর্য ধরে থাকলাম। ধৈর্যের পরীক্ষায় জয়ী হলাম। মাথা মুন্ডন শেষ হল। ব্লেডের চেয়ে ও ভোতা আরেকখানা কাঁচি নিয়ে মুখাবয়বে গজানো দীর্ঘ উশৃংখল শশ্রুগুলিকে খাটো করে সুশৃংখল করবার অপচেষ্টা করল। অতঃপর মুখে হাত বুলিয়ে নামিয়ে দিল তার ইটাসন থেকে। সেজন্য গুণে গুণে ফেল্‌তে হল ৫টি সৌদি রিয়াল।

গোসল করে এহরামমুক্ত হয়ে এবার ফিরে এলাম স্বাভাবিক অবস্থায়। স্থির হল রাত্রির আহার শেষে তাওয়াফে জেয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হব এবং এটিই হল হজ্বের শেষ রুকন বা আচার। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আমার আনিত কোরবানির উটের গোশতগুলি। মিনাতে রান্নার কোন সুযোগ নেই। এগুলোকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে বাসায় পাক করে রেখে আসা অথবা ডীপ ফ্রিজে কাঁচা রেখে আসা শুধু দুরূহ নয় বরঞ্চ এক বিরাট ধরনের বিড়ম্বনা। শেষ পর্যন্ত একখানা গাড়ী ভাড়া করে রওয়ানা হলাম হেরম শরীফের উদ্দেশ্যে। মক্কায় পৌছে বাসার সন্নিকটে একস্থানে গোশতগুলি সহ জাহাংগীরকে নামিয়ে দিলাম। সে বাসায় গিয়ে ডিপ ফ্রিজে গোশত গুলো রেখে হেরম শরীফে আমাদের সাথে পুনরায় যোগ দিয়েছিল। আমরা হেরম শরীফে পৌছে প্রথমে বাবে উম্মোহানির সন্নিকটে দাঁড়িয়ে ঠিক করলাম তাওয়াফের

www.pathagar.com

সময় কে কোথায় হারিয়ে যাই, বা কার কখন তাওয়াফ, সাঈ শেষ হয় তার ঠিক নেই। সুতরাং প্রত্যেকে তাওয়াফ শেষে এই স্থানে এসেই অপেক্ষা করব। অতঃপর সকলে একসাথে মিনায় প্রত্যাবর্তন করব। এরূপ সিদ্ধান্ত করে আমরা জোড়ায় জোড়ায় ৪ জোড়া প্রবীণ দম্পতি তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মাতাফে নেমে পড়লাম।

মাতাফ

মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াফের স্থান। খানায়ে কাবার চারিদিকে যেই প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান তাওয়াফের জন্য নির্দ্ধারিত করে রাখা হয়েছে সেটিকে মাতাফ বলা হয়। রাত্রি দিন ২৪ ঘন্টা অনবরত বিরামহীন ভাবে শীত বর্ষা গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা উপেক্ষা করে হাজার হাজার হজ্ব যাত্রী দলে দলে পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণ করে থাকেন। তাওয়াফ করতে হয় নগ্নপদে। গরমের দিনে দুপুরের খরতাপে এই মাতাফ যাহাতে উত্তপ্ত না হয় সে জন্য বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত একজাতীয় মার্বেল পাথর মাতাফে বসানো হয়েছে। এই পাথরগুলো এমন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে, যার ফলে দুপুরের তীব্র রোদে অন্যত্র ভূমিতল এত উত্তপ্ত হয় যে যেখানে পা রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, সেরূপক্ষেত্রেও মাতাফের মর্মর পাথর সমূহ স্বাভাবিক শীতল অবস্থায় থাকে। ফলে গ্রীষ্ম মৌসুমে দুপুরের তীব্র উত্তাপে ও নগ্নপদে তাওয়াফ করা হাজীদের জন্য অত্যন্ত সহজতর হয়। এই পাথর বসানোর জন্য অকাতরে বিস্তর অর্থব্যয় করেছেন সৌদি সরকার। সে জন্য সৌদি সরকার অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। পাথরগুলো দিনের বেলায় মোটেই গরম হয় না। সূর্যাস্তের পর ভিতর হতে একটু করে তাপ বিকিরণ হতে থাকে। তাই সন্ধ্যার পর বরঞ্চ পাথরগুলোকে আরামদায়ক ঈষদুষ্ণ বোধ হয়।

মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ

এই মাতাফ বা তাওয়াফের উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানের চারিদিকে মসজিদুল হারামের মর্মর নির্মিত ইমারত। মাতাফের সাথে সংলগ্ন প্রথম ইমারতটি নির্মাণ করেন ওসমানীয় শাসনামলে তুরস্কের সম্রাট। চারিদিকে এই ইমারতটি দেখতে সাধারণত চতুর্ভূজ বা আয়তক্ষেত্র আকারের মনে হলেও আসলে কিন্তু এটা চতুর্ভূজ বা আয়তক্ষেত্র আকৃতি নয়। আবার গোলাকার ও নয়। প্রত্যেকটি কোণায় বাঁকা বাঁকা করে কেটে বহুভূজ আকৃতির করা হয়েছে। এটা কিন্তু টাহর করে না দেখলে সাধারণতঃ নজরে পড়ে না। তুর্কী সম্রাটদের নির্মিত এই ইমারতটি একতলা বিশিষ্ট। ছাদের উপরে অসংখ্য গম্বুজ একটির সাথে আরেকটি পাশাপাশি ঠাসাঠাসি করে অবস্থিত। এতে তুর্কী সম্রাটগণের অদূরদর্শিতাই প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতে মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হতে পারে একথা তাঁরা ভাবতে পারেন নি। ফলে একতলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করে উপরে গম্বুজ স্থাপন করে তার উপরের দিকে সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এত সহসা কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই যে মসজিদুল হারামের বিস্তর সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে একথা তাঁদের চিন্তায় আসেনি বলেই মনে হয়। ইমারতটি একতলা বিশিষ্ট হলেও বেশ উঁচু। এটি মধ্যযুগীয় মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করছে। অভ্যন্তর ভাগ

www.pathagar.com

বেশ কারুকার্যময়, মেঝেতে ছঙ্গে মরমর বসানো। তার উপরে মূল্যবান কার্পেট পাতা, মাথার উপর ভন ভন করে ঘুরছে হাল জমানার বৈদ্যুতিক পাখা।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সৌদি বংশ ক্ষমতায় আসার পর মসজিদুল হারামের পরবর্তী সম্প্রসারণ সাধিত হয়। তদানীন্তন মসজিদুল হারামের মধ্যে হাজী সাহেবানদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় ইহার সম্প্রসারণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তুর্কী নির্মিত ইমারতটি থেকে প্রায় এক ইঞ্চি ফাঁক রেখে পিছন দিকে সরে গিয়ে তার চারিদিকে নূতন সম্প্রারিত পরবর্তী দালানটি নির্মাণ করা হয়েছে। তুর্কী ও সউদী নির্ম্মীত দালানের মধ্যবর্তী এই ফাঁকটি স্পষ্টতঃই নজরে পড়ে। পূর্ববর্তী দালানটির অবস্থিতিতে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি যাতে করতে না হয় সে উদ্দেশ্যেই এই ফাঁকটি রাখা হয়েছে বলে মনে হয়। পরবর্তীতে সৌদি নির্ম্মীত প্রকান্ড এই দালানটির পিছন দিকে একটি আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর আছে। এই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরটির বহির্দ্বার একেবারে সড়ক সংলগ্ন। কিন্তু বাহির থেকে দেখবার কোন জো নেই, বুঝবারও কোন উপায় নাই। ভিতর থেকে ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে, পিছনের দিকে এই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের কলাপ্সিবল গেইটের ধারে এসে না দেখলে তার অস্থিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। এই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্রত্যেকটি গেইট তালাবদ্ধ। তাই আমরা ভিতরে ঢুকতে পারিনি। অবশ্য দুয়েকজন তীর্থযাত্রীকে ভেতরে নামাজ পড়তে দেখেছি। পরে অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি বহুদূর দিয়ে একটি মাত্র পথ খোলা আছে। এরা সেদিক দিয়ে প্রবেশ করেছে।

আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্রত্যেকটি প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়ার ঘটনাটি ঐতিহাসিক। ইতিপূর্বে বিপুল সংখ্যক হাজী সাহেবান এখানে ভীড় জমাতেন এবং পরস্পর ঠাসাঠাসি করে একই জামাতে নামাজ আদায় করতেন। ১৯৬৯ ইং সনে কতিপয় বিপ্লবী লাশ বহনের ছদ্মাবরণে মৃতের খাটে অস্ত্রসমেত ভিতরে প্রবেশ করে মসজিদুল হারাম বা খানায়ে কাবা দখল করে নেবার এক ষড়যন্ত্র করেছিল। পরবর্তীতে সৌদি বাহিনী হেরম শরীফের প্রত্যেকটি ফটক বন্ধ করে দিয়ে বিপ্লবীদের মোকাবিলা করলে বিপ্লবীদের অনেকেই নিহত হয়। প্রাণ ভয়ে অনেকেই এই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঢুকে পড়ে ফটক বন্ধ করে দেয়। সেখান থেকে তাদের বের করে আনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ায় সৌদী বাহিনী এখানে পানি ঢেলে দিলে পানিতে ফ্লোরটি ডুবে যায়। ফলে বিপ্লবীরা মৃত্যুবরণ করে। পরে সেখান থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হয়। এই ঘটনাটি আমার শুনা। শুনেছি এই ঘটনার পর থেকে আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশেষত জিলহজ্ব মাসের প্রথম সপ্তাহে হাজীদের প্রচন্ডতম ভীড়ের সময়ও এই ফ্লোরের দরজা খোলা দেখিনি।

এই দালানটির গ্রাউন্ড ফ্লোরটি পিছন দিকে ষ্ট্যাডিয়ামের গ্যালারির মত ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উটে গেছে। আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর ব্যতীত উপরের দিকে এটি দোতলা। কিন্তু দোতালার মেঝটি কাবা সমতল হতে অনুমানে অন্ততঃ ১০০ ফুট উঁচু হবে। দোতলায় গিয়ে খানায়ে কাবার দিকে নজর দিলে ইহাকে ক্ষুদ্র বলে মনে হয়

www.pathagar.com

এবং তার চারিদিকে প্রদক্ষিণরত মানুষ গুলিকে আরো ক্ষুদ্রাকৃতির মনে হয়। ছাদের উপর উঠে দেখলে আরো ছোট অনুভূত হয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে বুলবুল বেশ বেগ পেত। তাই তার অনীহা দেখে কখনো ছাদে উঠিনি। তবে গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং মাতাফে নামাজের জায়গা না পেয়ে কখনো কখনো দোতলায় উঠেছি। জামাত শেষে ভীড় কমে গেলে সন্মুখ প্রান্তে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে খানয়ে কাবা এবং প্রদক্ষিণরত মানুষদের অবলোকন করেছি। মনে হয়েছে যেন হাজার হাজার খোদা পাগল, উম্মাদ, মাতাল– মত্ত হজ্বযাত্রী খোদার প্রেমে মাতোয়ারা ও আত্মহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আল্লাহর ঘরের চারিদিকে। এজন্যেই বোধ হয় মহাকবি ইকবাল বলেছেন–"দুনিয়াকি ভূত কদুমে পাহেলে উয়ে ঘর খোদাকা, হাম উস্‌কে পাসবাঁ হেঁ উয়ে পাসবাঁ হামারা"।

নব নির্মিত সুউচ্চ দোতলা এই ভবনটির নির্মাণ কৌশল আধুনিক মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের আরেক উজ্জ্বল নিদর্শন। বেশ বড় আকারের গোলাকার অসংখ্য স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান এই ভবনটি। এই স্তম্ভগুলোকে সোজাভাবে বা তির্যক ভাবে যেদিক থেকেই দেখা যাকনা কেন একই সরল রেখায় অনুভূত হয়। ঠিক একই রকম স্তম্ভের সমাহার দেখেছি দিল্লীর দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাসে। ভবিষ্যতে উপরের দিকে আরো সম্প্রসারণ প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনায় সৌদী সরকার উপরে কোন গম্বুজ নির্মাণ করেননি। সৌদী নির্মিত পেছনের এই দালানটি খানায়ে কাবার ভিটি ভূমি থেকে পিছনের দিকে ক্রমান্বয়ে উপরে উঠে গেছে, বৃহৎ হলের গ্যালারীর মত। ফলে সন্মুখের স্তম্ভ বাধার সৃষ্টি না করলে একেবারে পিছনের সারির যে কোন লোক খানায়ে কাবার তলদেশ পর্যন্ত অনায়াসে দেখতে পারে। এই দালানের উপরের দিকে সুদক্ষ শিল্পীর নিপূণ হস্তে রচিত অনেক কারু কার্য চোখে পড়ে।

গোটা মসজিদুল হারামটিই অত্যন্ত তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও একটি বালুকণা পড়বার উপায় নেই। পড়লে সংগে সংগে উপস্থিত খেদমত গার তা কুড়িয়ে নেয়। প্রত্যেকটি স্তম্ভের গোড়ায় রক্ষিত লাল রংয়ের পানির ব্যারেল গুলো সর্বদা জমজমের পানি দ্বারা পূর্ণ। কিছু পরিমাণ খালি হতে না হতেই সেটা পুনরায় পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং বেশ বড় আকারের বরফ খন্ড ট্রলিতে করে এনে ব্যারেলের ভেতর ফেলে দেয়া হয়। ফলে হাজী সাহেবানরা ডানে বাঁয়ে হাত বাড়ালেই পান জমজমের শীতল সুপেয় সুস্বাদু পানি। মসজিদুল হারামকে পরিষ্কার রাখবার ব্যবস্থাটিও চমৎকার। বেশ কয়েকজন লোক চারিদিকে রসি দিয়ে প্রশস্ত পরিমাণ একটি জায়গা ঘিরে ফেলে। তার ভেতরে কোন লোক থাকলে তাকে সসম্ভ্রমে ঘেরার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে জায়গাটি খালি করে মেঝেতে ডেটল বা ফিনাইল জাতীয় তরল পদার্থ দ্বারা দ্রুত ব্রাশ করে দেয়া হয়। এভাবে একস্থানে পরিচ্ছন্ন অভিযান শেষ হলে রসির ঘেরাটি তুলে নেয়া হয়। স্থানটি আবার পূর্ণ হয়ে যায় হাজীদের ভীড়ে। অনুরূপভাবে পার্শ্ববর্তী স্থানে শুরু হয় একই পদ্ধতিতে। এভাবে অবিরাম চলছে পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

www.pathagar.com

বুলবুলকে নিয়ে মাতাফে নামলাম। এক চক্কর দিতেই দলের অন্যান্য সংগীরা কোথায় হারিয়ে গেল। তাওয়াফ শেষ করে মকামে ইব্রাহিমে নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর জমজমের পানি পান শেষে ছাফা মারওয়ায় সাঈ করতে যাই। পর্বতদ্বয়ের মধ্যখানে সমতল পথে ছুটাছুটি শেষ করে অবসন্ন দেহে পূর্বের নির্ধারিত স্থান মনে করে মসজিদুল হারামের তুর্কী নির্মিত একটি অংশে বসে পড়ে দলের সংগীদের জন্য কথা মতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরেও যখন কেউ আসছেনা তখন আমরা নির্ধারিত সঠিক স্থানে অপেক্ষা করছি কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় উঠে দাঁড়িয়ে বাম দিকে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর আসার পর দেখি জাহাংগীর সহ হুদা সাহেব গং ৩ জোড়া প্রবীণ দম্পতি উৎকণ্ঠার সাথে আমাদের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। দেখার সাথে সাথেই সকলে একসাথে আমাদের এত দেরী করার কৈফিয়ত তলব করলেন। বুঝতে পারলাম আমরা ভূল করে ভূল জায়গায় অপেক্ষা করছিলাম। প্রকাশ করলে শরম পাবো সে আশংকায় প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলাম। অতঃপর সকলে বাবে উম্মেহানী হয়ে বেরিয়ে এসে একটি গাড়ী ভাড়া করে ফিরে এলাম মিনাস্থ শিবিরে। তখন রাত গভীর হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে রাত দিন বলতে গেলে প্রায় সমান। নিয়ন বাতির উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক আলোকিত। সকলেই মশগুল এবাদত বন্দেগীতে। তাই রাত গভীর হলে ও মিনার এই তাঁবু সজ্জিত কোলাহলময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর কে নিদ্রাপুরী ভাববার কোন উপায় নেই। হজ্বের আহ্কাম বলতে গেলে এখানেই শেষ।

পরের দিন সকালে নাস্তা করতে বসেই দেখি বেশ বড় একটি ডিসে রান্না করা তাজা চর্বিদার গরুর গোশত। জানতে পারলাম হাজী ইউনুস সাহেবেরা ১৮০০ রিয়াল দিয়ে একটি তাজা ষাঁড় কোরবানি করেছেন। মিনাতে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কিছুটা রান্না করেছেন তাঁরা। তারই কিছুটা জুটে গেল আমাদেরও ভাগ্যে। পরের দুইদিন অর্থাৎ ১১ ও ১২ ই জিলহাজ্ব রমী অর্থাৎ শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। আগের দিন অর্থাৎ ১০ই জিলহাজ্ব প্রস্তর নিক্ষেপের নির্ধারিত সময় ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্বে। কিন্তু এই দুইদিন নির্ধারিত সময় হল দ্বিপ্রহরের পরে। সুতরাং এই দুইদিন প্রচন্ড ভীড় হয় দ্বিপ্রহরের পর। জোহরের পর আমরা প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা চিন্তা করলে মুফতী সাহেব সাথের মহিলাদের কথা উল্লেখ করে সূর্যাস্তের কিছুটা পূর্বে যেতে পরামর্শ দিলেন এবং ভীড়ের তীব্রতা থাকলে মহিলাদেরকে সূর্যাস্তের পর ফাঁকা অবস্থায় রমী করতে উপদেশ দিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর লিখা বইয়ে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার কথা ও জানালেন। তাঁরই পরামর্শ মোতাবেক আমরা উভয় দিনই আছরের নামাজের পর রওয়ানা হই এবং শেষ সময়ে ভীড়ের তীব্রতা কমে এলে পূর্বে উল্লেখিত বিশেষ ব্যবস্থাধীনে অর্থাৎ সামনে আমাদের দলের কয়েকজন মহিলাদের থেকে সামান্য দুরত্ব বজায় রেখে আগে আগে চলেছেন, মহিলাদেরকে মধ্যে রেখে আমরা পিছনে থেকে স্তম্ভের নিকটে গিয়ে শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপ শেষ করলাম।

www.pathagar.com

এখন হজ্বের সকল আহকাম শেষ হয়ে গেল। আর কোন আচার অনুষ্ঠান বাকী নেই। নেই কোন করণীয়। ১২ তারিখ দুপুরের দিকে আলম সাহেবের সাথে দেখা হলে জানতে পারলাম তাঁর বেগম সাহেবা ভীড়ের কারণে রমী বা শয়তানকে প্রস্তর নিক্ষেপ না করে এক আত্মীয়ের সাথে মিনা ত্যাগ করে চলে গেছেন। তবে সেই কাজটি করবার জন্য স্বামী দেবতাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে গেছেন। বিকেলের দিকে পথে ভীড় বেশী হবে ধারণায় সকাল সকালেই মিনাস্থ শিবির ত্যাগ করে তিনি চলে গেছেন। যাতে না ভ্রমণে কোন কষ্ট হয়। দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। শুধু বললাম আমাদের সাথে বা মুফতী সাহেবের সাথে পরামর্শ করলে ক্ষতির কিছু ছিল না। মহিলাদের প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য শরীয়ত সম্মত এমন সময় আছে যখন মোটেই কোন ভীড় থাকে না। আমাদের মত ছাপোষা লোকেরা হজ্বে বারবার আসে না। সুতরাং হজ্বের কোন আহকাম বাদ দেয়া নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কংকর নিক্ষেপ কার্য সমাধা করে ১২ তারিখ ইচ্ছা করলে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করা যায়। তবে ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করা অপশনাল। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে না পারলে ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করা বাধ্যতামূলক এবং ঐ দিন পুনরায় তিন তিনটি শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। অতএব ১২ তারিখ মিনা ত্যাগ করা সাব্যস্ত হল। বিছানা পাতি গুটিয়ে নিলাম। হাজী ইউনুস সাহেব, মুফতী আবদুর রহমান সাহেব তাঁদের দলের অন্যান্যরা এবং আমাদের দলের সকল সদস্যরা মোয়াল্লিমের গাড়ীর তোয়াক্কা না করে নিজেদের উদ্যোগে একখানা গাড়ী ভাড়া করে রওয়ানা দিলাম মক্কার পথে। শেষ বিকেলের মিটেকড়া রোদ ভেদ করে গাড়ী ছুটে চলেছে পবিত্র মক্কাধামের পথে। পথের দুধারে অনেক শিবির গুঠিয়ে ফেলা হয়েছে, আবার অনেক শিবির এখনো স্থিতাবস্তা বজায় রেখে চলেছে। রাস্তায় কোলাহল নেই। যানবাহনের ভীড় নেই, যানজট ও নেই। রাস্তার দুধারে পবিত্র মক্কা নগরীর শহরতলীর গিরিকুন্তলা, রুক্ষ দৃশ্য দেখতে দেখতে ছুটে চলেছি। কয়েক স্থানে দেখলাম বাড়ী ঘর উঠেছে, বৃহদাকারের বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এখানে বসবাস করেন সৌদী আরবের অভিজাত ধনাঢ্য পরিবারবর্গ। মক্কাবাসীরা তাদের পূর্বেকার ঐতিহ্যবাহী মৃত্তিকা নির্মিত বসত বাড়ী পরিত্যাগ করে এইসব অত্যাধুনিক স্থাপত্য শিল্পের কারুকার্যে সৌন্দর্যমন্ডিত অট্টালিকা সমূহে উঠে এসেছেন সপরিবারে। অতঃপর প্রবেশ করলাম অধূনা নির্মিত আধুনিক মক্কা নগরীর অভিজাত বাণিজ্যিক এলাকায়। দুধারে সারি সারি রাশি রাশি অসংখ্য দোকান–আধুনিক পণ্য সামগ্রীতে ভরপুর। চট্টগ্রাম শহরের মত, বরঞ্চ তার চেয়ে অনেক বেশী, উঁচু নীচু পাহাড়ী পথ বেয়ে গাড়ী উপরের দিকে উঠে যায়, আবার দ্রুতবেগে চলে নিম্নাভিমুখী। এভাবে খুব বেশী দেরী হল না গাড়ী এসে থাম্‌ল নাক্কাশার অভিজাত আবাসিক এলাকার এক গলিমুখে। এখানে নেমে পড়লেন হাজী ইউনুস সাহেব, মুফতী আবদুর রহমান সাহেব এবং তাঁদের সংগীরা। সালাম, দোয়া শেষে মোসাফা করে বিদায় নিলাম তাঁদের কাছ থেকে। সউদী আরবে

www.pathagar.com

এখানেই তাঁদের সাথে শেষ দেখা। পরবর্তীতে আর দেখা পাইনি তাঁদের। অতঃপর মিছফালা মহল্লার বাসার ধারে এসে গাড়ী থাম্‌ল। নেমে পড়ে সবাই বাসায় উঠে এলাম।

মিনায় প্রচন্ড গরম সহ্য করতে না পেরে মাঝে মধ্যে আমার গামছাটি পানিতে ভিজিয়ে শরীরে এবং মাথায় ঠান্ডা লাগাতাম। এরূপ করবার আমার একটা কারণ ও ছিল। একবার দেখলাম আমাদের তাঁবুর ধারে আরেকটি তাঁবুতে একজন বৃদ্ধ হাজী সাহেব গরমের প্রচন্ডতা সহ্য করতে না পেরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। হজ্ব মিশনে খবর দিলে সেখান থেকে দুজন লোক এল। তারা অবস্থা দেখে বললেন হিট ষ্ট্রোক। তাই বরফ দিয়ে তাঁর মাথায় বুকে, সমস্ত শরীরে ঘষ্‌তে লাগল। পরে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। লোকটি এমনিতেই ছিল বয়স্ক। তদুপরি শরীর ছিল অত্যন্ত দুর্বল। পরবর্তীতে তাঁর সম্পর্কে আর জানতে পারিনি। অনেকটা হিট ষ্ট্রোক হতে আত্মরক্ষার সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে আমি ভিজা গামছাটি ব্যবহার করতাম। এ'সময়ে মিনাতে সকলেই এহরাম পরিহিত অবস্থায় থাকেন। এবং এহরাম অবস্থায় মাথায় কোন কাপড় দেয়া নিষিদ্ধ। আমি মাথায় ভিজা গামছা লাগাতে দেখে হুদা সাহেব এবং হাদী সাহেব আমাকে এই বলে ঠাট্টা করতে শুরু করলেন যে, "তুমি এহরাম অবস্থায় মাথায় কাপড় দিয়েছ। সুতরাং তোমাকে একটা ছাগল বা একটা দুম্বা কাফ্‌ফারা দিতে হবে"। উঠতে বসতে তাঁরা এরূপ ঠাট্টা করতে লাগলেন। আমি অনন্যোপায় হয়ে মুফতী আবদুর রহমান সাহেবের শরণাপন্ন হলাম। তিনি সব শুনে বললেন সামান্য কিছুক্ষণের জন্য বিশেষ কারণে এহরামের সময় মাথা বস্ত্রাবৃত করলে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। ইচ্ছাকৃত ভাবে কেহ দীর্ঘক্ষণ মস্তক আবৃত করে রাখলে তাকে অবশ্যই কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আমার বেলায় কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। একথা শুনে হুদা সাহেব এবং হাদী সাহেব দু'জনেই মুফতী সাহেবকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন–"আপনি সহজেই ছেড়ে দিলেন। আমরা কিন্তু সোবহানকে ভালভাবে জব্দ করেছিলাম"।

মিছফালার বাসায় এসে সে কথা আমার মনে পড়ল। বুলবুলও আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তার নিজের পক্ষে একটি দুম্বা কোরবানি দিতে। তাই আমি হুদা ও হাদী সাহেবকে বললাম যে মিনায় কোন পশু জবেহ্‌ করলে সেটা আমাদের কোন কাজে আসতোনা। পাক করে খাবার ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। কাফ্‌ফারা দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনারা যখন ধরেছেন আমি বুলবুলের পক্ষে একটা কোরবানি দেব। সেটা এখানে বাসায় করলে সম্পূর্ণ গোশতগুলি সদব্যবহার করা যাবে। তাঁরা সানন্দে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। বললেন দুম্বার গোশত অতিরিক্ত চর্বিদার, তেমন সুস্বাদু নহে। তাতে একটু মৃদু গন্ধ আছে। তাই একটা মোটা তাজা খাসি আনতে হবে। আমি রাজী হয়ে গেলাম। জামাই জাহাংগীরকে প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে একটি খাসী আনবার জন্য নিকটস্থ বাজারে পাঠিয়ে দিলাম। ভিতরে এসে যখন বুলবুলকে বললাম তোমার আগ্রহ অনুযায়ী তোমার পক্ষে কোরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ছাগল আনবার জন্য জাহাংগীরকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছি।

www.pathagar.com

বুলবুল রেগে তেড়ে মেরে উঠল, বলল–"খাসীর মাংস অনেক খেয়েছি। ছাগল দিয়ে দেশে অনেক কোরবানি করেছি। আমাদের দেশে দুববা পাওয়া যায় না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ পাক বেহেশ্‌ত থেকে কোরবানীর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে পশুটি সেটি খাসী নয়, ছাগল ও নয়, উট, গরু ও নয়। সেটি ছিল একটি দুব্‌বা। তাই আমার ইচ্ছা ছিল একটি দুব্‌বা দিয়েই কোরবানি করি। তুমি খাসীর জন্য পাঠালে কেন?" তার বক্তব্য শুনে মনে মনে দুঃখিত হলাম। আফসোস করে বললাম যে কথাটি আগে বললে না কেন? খাসী আর দুব্‌বার দামের মধ্যে তেমন কোন প্রভেদ নেই। প্রায়ই একই দামে একই মানের দুব্‌বা ও খাসী বিক্রি হয়। দুব্বা আনতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু তখন জাহাংগীর চলে গেছে। সংবাদ তার কাছে পৌছানোর কোন উপায় ছিল না। তাই দুঃখ ও আফসোস করা ব্যতীত ঐ সময়ে আর কিছুই করার ছিল না।

তবে স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে এল আপন হৃদয়–গগনে–যখন জাহাংগীর খাসীর পরিবর্তে আস্ত একটা দুব্‌বা নিয়েই হাজির হল এবং বলল–"সুবিধামত তেমন খাসী পাইনি। তাই একটি দুব্‌বাই নিয়ে এসেছি"। দুব্‌বাটি বেশ তাজা ও মোটা এবং চর্বিদার। ভক্তের অন্তরের আন্তরিক কামনা অনুযায়ী, আমাদের গৃহীত ব্যবস্থা উল্টিয়ে দিয়ে, দুব্‌বা কোরবানির ব্যবস্থা করে দিলেন অলৌকিকভাবে স্বয়ং অন্তর্যামী। আমি আর বুলবুল দুজনেই অসংখ্য শোকরানা জানালাম সেজন্য বিশ্বপালক, মহাপ্রভু আল্লাহর দরবারে। প্রবাসকালীন এই অবস্থায় দুব্‌বাটির সমুদয় গোশ্‌ত এককভাবে আমাদের পক্ষে রান্না ও খাওয়া সম্ভব নহে। তাই আমাদের দালানে অবস্থানকারী অন্যান্য হজ্বযাত্রীদের মধ্যে ও বেশ কিছু গোশত বিতরণ করে দিলাম। আবদুল হাদী সাহেব ও নাদেরুজ্জামানেরা নিল একভাগ, আমি আর হুদা সাহেব নিলাম অপর ভাগ। আবার আরো এক ভাগ আবদুল হাদী সাহেব তাঁর বেহাই, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের জন্য ও নিয়ে গেলেন। উল্লেখ করা অনাবশ্যক যে খলিল সাহেব ও সপরিবারে একই সময়ে হজ্বে গমন করেছিলেন। সকলে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে ছিলাম দুব্বার এই গোশত। হুদা সাহেব আর হাদী সাহেব আমার নিকট হতে কাফ্‌ফারা আদায়ের পরোক্ষ উল্লাস ও করেছিলেন বৈকি।

মসজিদে তানঈম

এখন কোন কাজ নেই। বিমানের ফ্লাইটের নির্ধারিত তারিখের অপেক্ষায় দিন গুণছি। এ সময়ে সারাদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ। তাই এ সময়ে মসজিদুল হারামে নিয়মিতভাবে নামাজ পড়া, তাওয়াফ করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ ছিল না। আছরের সময়ে প্রবেশ করলে এশার পূর্বে সাধারণতঃ বের হওয়া যেত না। আবার অনেকে এশার সময় প্রবেশ করলে ফযরের পূর্বে বেরই হয়না। প্রকৃত পক্ষে কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে নফল বা এডিশন্যাল এবাদত করার ইহাই হল প্রকৃষ্ট সময়। অর্থাৎ ইহাই নফল এবাদতের মোক্ষম মওকা। এই সময়ে কেহ কেহ প্রতিদিন, আবার কেহ কেহ দিনান্তর, আবার কেহ কেহ কয়েকদিন অন্তর ওমরাহ পালন

www.pathagar.com

করে থাকেন। মসজিদুল হারামের বহির্দ্বারে নির্দ্ধারিত বাস ষ্টেশনে ডবলডেকার বাস দন্ডায়মান থাকে, ওমরাহ পালনকারীদের মসজিদে তানঈমে নিয়ে যাবার জন্য। ঐ ষ্টেশন থেকে টিকেট করে ডবলডেকার বাসে উঠে বসতাম। সে বাস নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিত ৩ মাইল দুরবর্তী মসজিদে তানঈমে। ওমরাহর জন্য ইহাই এহরাম বাঁধার নির্দ্ধারিত স্থান বা মীকাত। এখানে মকরুহ ওয়াক্ত না হলে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে এহরাম বেঁধে পুনরায় বাসে উঠে প্রত্যাবর্তন করতে হয় হেরম শরীফে। মসজিদে তানঈমে এই উদ্দেশ্যে সর্বদা ওমরাহ পালনকারীদের আনাগোনা লেগেই আছে।

মসজিদে তানঈমের (অপর নাম মসজিদে আয়শা) পুরাতন অবস্থা দেখিনি। বর্তমানে ইহা অধুনা নির্মিত সুউচ্চ প্রকান্ড একটি মসজিদ। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের সৌকার্যমন্ডিত সুউচ্চ এই মসজিদ। একতলা বিশিষ্ট অথচ ৩ তলার সমান উঁচু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদটির অভ্যন্তরে দিনের বেলায় অত্যুজ্জ্বল আলোয় জ্বলমল করে। এই আলো কিন্তু দরজা বা জানালা দিয়ে প্রবেশ করে না। এই আলো প্রবেশ করে মসজিদের উপরের দিক থেকে। উপরের দিক থেকে আলো প্রবেশের এই নির্মাণ কৌশলও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মসজিদের সন্মুখ ভাগে মেহরাব এবং মিম্বরটির নির্মাণ কৌশল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিম্বরটির চারিদিকে ঘেড়া। খোৎবা দেবার জন্য পেছানো একটি সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েকটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান এই মসজিদটি দুভাগে বিভক্ত। ভিতরে প্রকান্ড একটি কক্ষ। প্রবেশদ্বার কাঁচের দরজা দিয়ে আবদ্ধ। বাহিরে ছাদ বিশিষ্ট চেহেন। ভিতরের কক্ষেই ওমরাকারীরা ভীড় করেন ।

মসজিদের বাইরে রাস্তার ধারে বাসসদৃশ ভ্যান জাতীয় গাড়ীতে মোবাইল রেষ্টুরেন্ট দন্ডায়মান। এখান থেকে ওমরাহ পালনকারীরা প্রয়োজনে শীতল পানীয় বা অন্য যে কোন খাবার কিনে নেয়। এরূপ দুটি সরকারী লাইন্সেসধারী চলন্ত খাবার দোকান ছাড়া আমাদের দেশের মত অন্য কোন হকার বা ফেরীওয়ালা এখানে নেই। সরকারী ব্যবস্থায় থাকতে পারে না। জেদ্দা হাজী ক্যাম্প থেকে শুরু করে সৌদি আরবের কোথাও আমাদের দেশের মত হকার বা ফেরীওয়ালা দেখিনি। পথে, ঘাটে, বাস ষ্টেশনে বা অন্য কোথাও ফেরীওয়ালারা দর্শনার্থীদের বিরক্ত করতে আসে না। সরকারী ব্যবস্থায় আসতে পারে না। চলন্ত হোটেল থেকে ঠান্ডা পানিই খেয়েছি বেশী। তবে কখনো কখনো বা রুটি, আইসক্রীম প্রভৃতি ও খেয়েছি। এই রাস্তার ধারে অনেকটা ছোট খাটো পার্কের মত প্রশস্ত কিছুটা স্থান আছে। সেখানে অল্প দূরে দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য আছে টয়লেট। হকার বা ফেরীওয়ালা দর্শনার্থীদের বিরক্ত করতে না পারলে ও পার্কের মত স্থানটিতে কিছু যুবক ছোট্ট একটি থলে বগলদাবা করে ঘুরে বেড়ায়। বগলের থলেটির মধ্যে আছে একটি পলোরেইড ক্যামেরা। এরা অনুচ্চ স্বরে সুবিধামত খদ্দরের আশে পাশে খামছা রেয়াল, খামছা রেয়াল বলে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ ৫ রিয়ালের বিনিময়ে ৫ মিনিটের মধ্যে মসজিদে তানঈমকে পটভূমিকায় রেখে অথবা খদ্দেরের পছন্দমত অন্য যে কোন পট

www.pathagar.com

ভূমিকায় রঙিন ছবি তুলে সরবরাহ করে। স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষণের জন্যে অনেকেই এদের কাছ থেকে ছবি তোলে দেশে নিয়ে যায়। এই ক্যামেরা ম্যানেরা অত্যন্ত সজাগ। অতি দ্রুত কাজ সেরে দূরে সরে যায়। সম্ভবতঃ পুলিশের নজর এড়াবার জন্য।

মসজিদুল হারামে নামাজ পড়ার পদ্ধতি এক ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যবস্থা। পৃথিবীর সর্বত্র কাবার দিকে মুখ করে ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ের রীতি প্রচলিত। কিন্তু যেহেতু কাবার চারিদিকে মসজিদুল হারাম অবস্থিত সেহেতু নামাজের জন্য কাবার চারিদিকেই সকলে দাঁড়ান। কিন্তু ইমাম সাহেব দাঁড়ান একদিকে মাত্র। ফলে এখানে সকল মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে থাকতে পারেন না। ইমাম সাহেব যেদিকে দাঁড়িয়েছেন সেদিকের মুক্তাদিরা অবশ্য তাঁর পেছনে দাঁড়ান। কিন্তু ইমাম সাহেবের ডানদিকে বামদিকে কাবাকে সন্মুখে রেখে যারা দাঁড়ান তারা ইমাম সাহেবের পেছনে দাড়াতে পারেন না। তারা কাবাকে সামনে রেখেই দাঁড়ান। আবার ইমাম সাহেবের বিপরীত দিকে যারা দাঁড়ান তারা কাবাকে মধ্যখানে রেখে প্রকৃতপক্ষে ইমাম সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন। তাই এখানে ইমাম সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে সকলে নামাজ আদায় করেন না, করতে পারেন না।

এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র মসজিদুল হারামেই প্রচলিত এবং তা কাবা, মসজিদুল হারামের কেন্দ্রস্থল ও মসজিদুল হারাম কাবার চারিদিকে অবস্থিত বলেই করতেই হয়।

এখানে মসজিদুল হারামে নামাজ আদায় করার সময় নামাজের কাতার বা সারি সোজা রাখবার দিকে কেউ তেমন নজর দেয় না। ইমাম সাহেব তকবীরে তাহরীমার পূর্বে একবার 'এস্‌তাউ' বলে নামাজের সারি সোজা রাখবার জন্য তাগিদ দিয়ে কর্তব্য শেষ করেন। এই কাতার সোজা রাখবার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। মুসল্লীরাও এদিকে সবিশেষ নজর দেন না। তাই বারবার দেখেছি ভীড়ের মধ্যে যে যেখানে পেরেছে দাঁড়িয়ে গেছে, কাবাকে চোখের সামনে রেখে। কিন্তু কাতার সোজা হয়েছে কি হয় নাই তা মোটেই কেউ লক্ষ্য করেন না। লক্ষ্য করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন না। ফলে আঁকা বাঁকা কাতারে দাঁড়িয়েই সকলে নামাজ আদায় করেন। এই অবস্থা দেখে বারবার আমার মনে হয়েছে– বিশ্বমুসলিমের অনৈক্যের এটাই বোধ হয় প্রধানতম কারণ। কেননা হযরত নবী করিম (দঃ) বলেছেন–"তোমরা মসজিদে নামাজের মধ্যে কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াও, নতুবা আল্লাহতালা তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের মুখকে বাঁকা করিয়া দিবেন"। (মুসলিম, বোখারী) এই হাদীস সম্পর্কে কেউ কখনো কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন না। হজ্বের মওসুমে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম এখানে সমবেত হন, কিন্তু কখনো সারি সোজা করে নামাজ পড়েন না বা পড়তে পারেন না। সৌদি সরকার ও এ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাই এদিকে কোনরূপ নজর দিয়েছেন বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়

www.pathagar.com

মসজিদুল হারামের মধ্যে দুনিয়ার মুসলিম সম্প্রদায় যদি কাতার সোজা করে নামাজ আদায় করতে পারতো তাহলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ আবার একতাবদ্ধ হয়ে পরাশক্তির হুমকী মোকাবেলা করতে সক্ষম হতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এখানে হজ্ব মওসুমে বিশ্বের লাখো মুসলিম একত্রিত হয় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মিক মিলন ঘটে না। ঘটাবার কথা কেউ কল্পনাও করে না। তাই বর্তমানে হজ্ব একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মীয় আচারে রুপান্তরিত হয়ে গেছে। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য ও কল্যাণ সাধনে, নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বৃহত্তর কোন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই বিরাট সমাবেশ কোন কাজে আসে না।

বাসায় এসে খবর পেলাম মৌলানা আবদুল মাজেদ সাহেবের পক্ষ থেকে দু'জন লোক এসে আমাকে খুঁজে গেছেন। পরে অনেক খোঁজাখুজি করে হেরম শরীফে তারা আমাকে ধরে ফেলেন। বললেন মৌলানা আবদুল মাজেদ সাহেব আমাদের সকলকে তাঁর বাসায় দাওয়াত দিয়েছেন। কখন আমাদের সময় হবে জানতে চাইলেন। মৌলানা আবদুল মাজেদ সাহেবের সাথে আমার ইতি পূর্বে প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় ছিল না। তিনি নানুপুরের প্রখ্যাত মৌলানা সুলতান সাহেবের একজন মুরীদ ও খলিফা। এক সময়ে মৌলানা সুলতান সাহেবের পারিবারিক এক মোকদ্দমা পরিচালনা করেছিলাম। সেই সুবাদে মৌলানা সুলতান সাহেবের সান্নিধ্যে আসার আমার সুযোগ হয়েছিল। তদবধি মৌলানা সাহেব আমাকে অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। মৌলানা আবদুল মাজেদ সাহেব যখন জানতে পারলেন আমি মৌলানা সুলতান সাহেবের একজন স্নেহের পাত্র তখন থেকে তিনি হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজতে আরম্ভ করেছেন--দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য। হুদা সাহেবের সাথে পরামর্শ করে দিনক্ষণ ঠিক করা হল। ঐ সময়ে একই স্থানে আলম সাহেব ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে ও বললাম। কিন্তু তিনি অন্যত্র তাঁর দাওয়াত আছে এই অজুহাতে আমাদের সংগী হলেন না।

নির্দ্ধারিত দিনক্ষণে এশার নামাজ শেষ করে হেরম শরীফ থেকে বের হলাম। মৌলানা আবদুল মাজেদ সাহেবের লোকজন একখানা গাড়ী ঠিক করে নিয়ে এল। তাঁর বাসাটি হেরম শরীফ থেকে বেশ কিছু দুরে রিবক্স নামক স্থানে অবস্থিত। তাই এই গাড়ীর ব্যবস্থা। অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌছে গেলাম। গাড়ী থেকে নেমেই বুঝতে পারলাম মৌলানা সাহেবের বাসা একটি হিলটপে। পাথর বসানো সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে হবে। বুলবুল আর মিসেস হুদাকে "শনৈঃ পর্বত লংঘনম" মন্ত্রের কথা কানে কানে বললাম। কিন্তু তারা কথাটি যেন তেমন গ্রাহ্য করল না। বরঞ্চ দ্রুত পদ চালনে উর্ধমুখী চলতে লাগল। চড়াই উৎরাই পার হয়ে বাসায় এসে পৌছলাম। তাঁর বাসাটি দুইভাগে বিভক্ত। একটি বর্হিবাটি অপরটি আন্দরমহল। তার মধ্যখানে পর্দা টাঙানো। পর্দাভেদ করে বুলবুল আর মিসেস হুদা ভিতরে প্রবেশ করল। সেখানে মৌলানা সাহেবের পরিবার তাদেরকে স্বাগত জানাল। সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। বহির্বাটিতে সুন্দর মূল্যবান গালিচা পেতে এবং লম্বা তাকিয়া দ্বারা সজ্জিত মেঝেতে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানেই

www.pathagar.com

মৌলানা সাহেবের সাথে মোলাকাত ও পরিচয় হল। কুশল বিনিময় হল। কথায় কথায় জানতে পারলাম এই জায়গাটি নাকি মৌলানা সাহেবের নিজস্ব। জায়গাটা খরিদ করে তিনি এই বাড়ী নির্মাণ করেছেন। তাঁর মূল বাড়ী টেকনাফ। অনেকদিন ধরে তিনি সপরিবারে মক্কায় বসবাস করছেন। স্থানীয় একটি মসজিদে ইমামতি করেন এবং বেশ কিছু ব্যবসা বাণিজ্য ও আছে। দেশে তাঁর পিতার অবস্থা ও বেশ সচ্ছল। বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে। প্রথমেই দুধের তৈরী হিমশীতল এক গ্লাস করে বাদামী শরবত পরিবেশন করা হলো। গ্রীষ্মের তাপদাহে শরবত গুলি বেশ সুস্বাদু ও সুপেয় মনে হল। কিছুক্ষণ পর আমাদের দেশের পুরাতন প্রথায় একজন লোক লোটা আর চিলমচি দিয়ে সকলকে হাত ধুইয়ে দিল। তারপর থেকে আসতে শুরু করল বিভিন্ন রকমের রান্না করা মাছ ও গোশতের ব্যঞ্জন। প্রায় ১০ রকমের গোশত তার সাথে মাছ ও । প্রত্যেকটি আইটেম বেশ মজা লাগল। মৌলানা সাহেব এতবেশী তরকারীর ব্যবস্থা করেছেন যে, এতটুকু খাওয়া আমাদের মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এতদসত্বেও মৌলানা সাহেব বিনীত ভাবে নিবেদন করলেন যে–তিনি কিছুই করতে পারেননি আমাদের জন্য। দেখেই মনে হয় মৌলানা সাহেব বিনয় স্বভাবের, সোজা সাদাসিদে, শান্ত সরল প্রকৃতির একজন ধার্মিক লোক। বেশ মিশুক ও বন্ধু বৎসল। অবশেষে ভূরিভোজনের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিতে চাইলাম। কিন্তু না, শেষে আরবীয় কায়দায় তৈরী এক কাপ চা পান করতে হবে। তার পর বিদায়ের অনুমতি পেলাম। দেখলাম মৌলানা সাহেব ও আমাদের সাথে সাথে আসছেন। বুঝলাম সৌজন্য, বিদায় দিতে কিছুটা এগিয়ে যাওয়া। পাহাড়ের সিঁড়ির গোড়ায় এসে মৌলানা সাহেবকে চলে যেতে বললাম। কিন্তু না তিনি নাছোড়বান্দা। আমাদের সাথে সাথে নীচে নামতে লাগলেন। বললাম উঠতে অসুবিধে হবে। কিন্তু তিনি তোয়াক্কা করলেন না। অবশেষে রাস্তায় নেমে এসে একখানা গাড়ী ডেকে আমাদের উঠিয়ে দিয়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অতঃপর বিদায় নিলেন। মৌলানা সাহেবের এই আথিতেয়তা, সৌজন্য, শিষ্টাচার ও বিনয় নম্রতা সত্যি ভূলবার নয়।

একদিন হেরম শরীফে ফজরের নামাজের পর তাওয়াফ করতে করতে মাতাফের একস্থানে দেখতে পেলাম চট্টগ্রামের দৈনিক 'নয়া বাংলা' সম্পাদক আলহাজ্ব আবদুল্লাহ আল সগীর সাহেবকে। তিনি তাওয়াফ শেষ করে একস্থানে বসেছিলেন। আমাকে দেখেই বসা থেকে উঠে দুই লাফে আমাকে ধরে ফেললেন। তারপর দুজনে গিয়ে একখানে বসে পড়লাম। দুজনের মধ্যে অনেক আলাপ হল। দেশের কথা, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও বন্যা পরিস্থিতির কথা। সাংবাদিক হিসেবে দেশ সম্পর্কে আমার চেয়ে তিনি অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে খোঁজ খবর নিলাম। পরিশেষে ব্যক্তি গত পর্যায়ে এসে তিনি বললেন তাঁর পিতার জন্য মনটা তাঁর অস্থির। পিতাকে দেশে অসুস্থ রেখে এসেছেন। তাই পিতার কথা মনে পড়ছে এবং কেমন যেন প্রাণ কাঁদছে। পরে দেশে এসে জানতে পেরেছিলাম ঐদিনই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আত্মার সাথে আত্মার কি সম্পর্ক ! তার একস্থানে ব্যাথা পেলে অন্যপ্রান্ত ও

www.pathagar.com

সাথে সাথে ব্যাথিত হয়ে উঠে। সগীর সাহেব বললেন যে তিনি আজ সারারাত ঘুমাননি। হেরম শরীফেই রাত কাটিয়েছেন। দু'জনে আলাপ করতে করতে সূর্য বেশ উপরে উঠে গেছে। তিনি বললেন এবার চলাযাক। হেরম শরীফ থেকে বের হয়েই বুঝতে পারলাম দু'জনেই নিজ নিজ জুতাগুলো হারিয়ে ফেলেছি। নগ্নপদে যাত্রা মোনাসিব নহে ভেবে সাময়িক ব্যবহারের জন্য পরিত্যক্ত স্তুপ থেকে দু'জনে দু'পাটি সেন্ডেল খুঁজে নিলাম। কিন্তু জোড়া মিলল না। এখানে জোড়া মিলে না। মিলা খুব দায়। সগীর সাহেব আজ যেন নাছোড়বান্দা। জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন নিকটস্থ একটি হোটেলে। হোটেলটির নাম পাকিস্তানী হোটেল। দু'জনে বসে পেট ভরে প্রাতঃরাশ সারলাম। পয়সা দিতে চাইলে সগীর সাহেব কিছুতেই আমাকে দিতে দিলেন না। তারপর নিজ নিজ বাসায় চলে গেলাম।

একদিন আমি আর বুলবুল জমজম থেকে পানি পান করে সাফা মারওয়ার উদ্দেশ্যে উপরের দিকে যাচ্ছিলাম। আমাকে পাশ কাটিয়ে একজন শ্বেতাংগ হাজী উপরের দিকে যাচ্ছিলেন। অনতিদূরে বসা আর একজন শ্বেতাঙ্গিনী হাজী হাত নেড়ে ইশারায় তাকে ডাকবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক সেটা না দেখে উপরের দিকে চলে যাচ্ছেন। ভদ্রমহিলার প্রতি আমার নজর পড়ায় আমি ভদ্রলোকের হাত ধরে ভদ্র মহিলার প্রতি তর্জনি সংকেত করলাম। ভদ্র লোকটি তা দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন এবং আমাকে ধন্যবাদ দিতে শুরু করলেন। বুঝতে পারলাম ভদ্র মহিলা তার স্ত্রী। স্ত্রীকে এখানে বসিয়ে তিনি জমজমে নেমেছিলেন। উঠবার সময় পথ ভূল করে ভিন্ন পথে চলে যাচ্ছিলেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম তারা তুরস্কের অধিবাসী। স্বামী স্ত্রী হজ্ব করতে এসেছেন। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি জেনে সে বেশ আন্তরিকতা দেখাল। বুঝলাম বাংলাদেশ সম্পর্কে সে জানে এবং বাংলাদেশীদের প্রতি তার আন্তরিকতা আছে। ইসলাম বিধ্বংসী কামাল পাশার দেশ ইউরোপীয় ভূখন্ড তুরস্ক হতে ও দেখলাম হজ্বযাত্রীরা হজ্ব করতে আসে। তার দেশের সামাজিক ও ধর্মনীতির অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু জানতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে সম্ভব হয়নি ।

আলবেদা

এখন বিদায়ের পালা ঘনিয়ে এল। কেনাকাটার পালা শুরু হল। ছেলেমেয়ে আত্মীয় স্বজন সবাইকে কিছুনা কিছু না দিলে নয়। এসবের ভার অবশ্য আমি বুলবুলের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েদের জন্য হাতঘড়ি, জামাকাপড়, অন্যান্যদের জন্য বেশ কিছু কিছু উপহার সামগ্রী কেনা হল। বুলবুল পছন্দ করলে আমি দামদস্তুর করে দাম মিটিয়ে দিতাম। আধুনিক মক্কা নগরীর অভিজাত এলাকায় ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর ও আছে বেশ কিছু সংখ্যক। একটিতে ঢুকতে যাব এমন সময় হাতের মধ্যে রক্ষিত ছিল একটি থলে। রেকের মধ্যে রেখে দিতে হল সেটি। কারণ এখানে ঢুকতে হলে টাকার থলেটি ছাড়া অন্য কোন থলে সাথে নেয়া যায় না। কেননা বের হবার পথে হাতে যা কিছু পাওয়া যাবে অর্থাৎ আপনি পছন্দ করে যা

www.pathagar.com

কিছু নেবেন তার সবকিছুর দাম চুকিয়ে দিয়ে দিতে হবে। তার পর প্রবেশ কালীন রক্ষিত জিনিষ গুলি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। এই ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরে ঘুরে ঘুরে ইচ্ছামত কেনাকাটা করেছে বুলবুল। আরো দুয়েকটি দোকানে ঢুকে বুলবুল তার সখের আরো দুয়েকটি জিনিষ কিনল। হঠাৎ একটি কম্বল তার নজরে খুব সুন্দর ঠেকল। এটি কিনে ফেললাম। কম্বলটি সত্যি অত্যন্ত সুন্দর এবং ডবল ফোল্ডেড, ভারী ও আরামদায়ক। তাই বেশ দামীও। দাম হলেও ভাবলাম স্ত্রী যখন পছন্দ করেছে কিনেই ফেলি। কম্বল অনেকে আরো অনেক কিনেছে, সে গুলি কম দামী ও এত ভারী নয়। হালকা, বেগে ভরে দিলে হাতে তুলে নেয়া যায়। দোকানী হার্ডবোর্ডের বিশাল অরিজিন্যাল প্যাকেটটি সহ কম্বলটি যখন আমার হাতে তুলে দিল তখনই পড়ে গেলাম সমস্যায়। কেননা আগেই বলেছি এখানে কোন মুঠে পাওয়া যায় না। স্বল্প দুরত্বের অল্প ভাড়ার কোন যানবাহন ও নেই। অগত্যা কাঁধে তুলে নিলাম হার্ডবোর্ডের প্যাকেট সহ কম্বলটি। আনুমানিক দেড় মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসে নিজের স্কন্দটি ভারমুক্ত করে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

দেশে ফিরে যাবার সময় জমজমের পবিত্র পানি দেশে নিয়ে যাওয়া একটা রেওয়াজ। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক হাজী পবিত্র জমজমের কিছুনা কিছু পানি কষ্ট করে বহন করে নিজ নিজ দেশে নিয়ে যায়। দেশে ফিরে আত্মীয় স্বজনকে সে পানি বিলি করা হয়। তারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে সে পানি পান করেন। হুদা সাহেব বেশ কিছুদিন আগে থেকেই জমজমের পানি সংগ্রহ করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম ফেরত যাত্রার দিন অথবা তার একদিন আগে পানি তুলে আনব। আমারই কথামত কাজ হল। বিদায়ের একদিন আগে আমার গ্রামের ছেলে মুছাকে নিয়ে জমজমের পানির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম আমি আর হুদা সাহেব। এই পানির জন্য বাজারে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রকমের পাত্র পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্লাষ্টিক নির্মিত হাল্কা পাত্লা কন্টেইনারই সবচেয়ে বেশী চালু। টিনের পাত্র ও পাওয়া যায়। তার মধ্যে আবার এক পোয়া জল ধরে এরূপ ছোট ছোট টিনের পাত্র ও দেখেছি। এগুলোর মধ্যে পানি ভরে তার মুখটা ঝালাই করে দেশে নিয়ে গিয়ে এক একজনের হাতে এক একটা তুলে দেয়া সহজতর। আমরা কিন্তু ১০ লিটার পানি ধরে এরূপ মাঝারি ধরণের দু-জনে দুটা করে ৪ঠা পাত্র কিনলাম। যেহেতু প্রত্যেক হাজী সাহেবই জমজমের পানি নিয়ে যায় তাই হেরম শরীফের অভ্যন্তরে জমজম কূয়ায় যেন ভীড় লেগে না যায় সে জন্য সৌদি সরকার হেরম শরীফের বাহির হতে নলের মাধ্যমে জমজমের পানি সংগ্রহ করবার সু-ব্যবস্থা করেছেন। এরূপ একটি নলের মুখ থেকে আমরা আমাদের কন্টেইনার ভরে নিলাম। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এগুলো বাসায় নিয়ে যাই কি করে। এখানে মুছা আমাদেরকে বেশ সাহায্য করল। সে দুটা দুটা করে ৪টি পাত্র মূল সড়কের ধারে নিয়ে এল। অতঃপর একটি টেক্সী ভাড়া করে তাতে উঠে পড়লাম। মুছা টেক্সী ওয়ালাকে গন্তব্য স্থল নির্দেশ করতে একটু ভূল করে ফেলেছিল। টেক্সী ওয়ালা সেই ভূলস্থানে এসে আর অগ্রসর হতে নারাজ। বাধ্য হয়ে নেমে গেলাম। সেখান থেকে বাসা আমাদের খুব বেশী দুরে নয়।

www.pathagar.com

তবে স্থানটি ছিল আমাদের বাসার পেছনে। অবশেষে আবার মুছা দুইহাতে ২টি করে দুবারে পাত্র গুলি বাসায় নিয়ে এল। নির্দেশ ভুল হওয়াতে পয়সা দিয়েও অতিরিক্ত কষ্টটুকু করতে হল। এখানকার টেক্সী ওয়ালাদের সেই এক অভ্যাস। যেখানে বলবে সেখানে ছাড়া আর কোথাও যেতে সহজে রাজী হবে না। বিমানে যাতে অন্যান্য হাজীদের পাত্রের সাথে মিশে না যায় সে জন্য জামাই জাহাংগীর তার শ্বশুরের পাত্র দু'টিতে বেশ সুন্দর করে নাম ঠিকানা লিখে দিল। তার হাতের লেখা বেশ সুন্দর। অনুরোধ করাতে অবশ্য আমাদের দুটির একটিতে আমার অপরটিতে বুলবুলের নাম লিখে দিয়েছিল।

হাদী সাহেব ও নাদেরুজ্জামান সাহেবেরা পরে এসেছেন। সুতরাং হজ্বের পর এরা মদিনায় যাবেন। আমরা আগে এসে মদিনায় জেয়ারতের পালা শেষ করে এসেছি। সুতরাং আমরা সরাসরি জেদ্দায় চলে যাব। হাদী সাহেব কয়েকদিন আগে থাকতেই মদিনায় রওয়ানা হতে চাইলেন, কিন্তু অনুমতি মিলল না। নির্দ্ধারিত তারিখের আগে রওয়ানা দিলে পথি মধ্যে পুলিশেই নাকি পাকরাও করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। তার কারণ হল মদিনায় সকলে যেন অস্বাভাবিক ভীড় না জমাতে পারে। তাই তারা মদিনা যাত্রার নির্ধারিত তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমরা জেদ্দা যাত্রার ব্যবস্থার জন্য মোয়াল্লিম অফিসের সাথে যোগাযোগ করলাম। অর্থাৎ এতদিন একরকম মুক্ত ছিলাম। এখন আবার মোয়াল্লিমের খপ্পরে। মোয়াল্লিম দপ্তর থেকে আমাদেরকে ৩১ তারিখ অর্থাৎ ৩১/৮/৮৬ ইং তাং খবর নিতে বলে দেয়া হল। কারণ আমাদের ফ্লাইটের দিন ধার্যছিল ২রা সেপ্টেম্বর। ৩১ তারিখ গেলে পরে মোয়াল্লিম সাহেব দয়া করে বলেছিলেন যে, আপনারা এতঃপরে এসেছেন কেন? ১ তারিখ জেদ্দা অভিমুখে আমাদের গাড়ী যাবে না। যখন বললাম তাহলে মেহেরবাণী করে আমাদের কাছ থেকে গৃহীত ভাড়ার টাকা গুলি ফেরত দিন। আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে জেদ্দা যাবো। এতে তিনি অত্যন্ত রেগে গেলেন, বললেন ভাড়ার টাকা তিনি নেন নাই, কোম্পানী নিয়েছে। তিনি সে সম্পর্কে কিছু জানেন না। আরো বললেন–ঠিক আছে আপনারা ঐ তারিখে আসবেন। আমি আপনাদেরকে কোম্পানীর কাছে পৌছে দেবো। তারপর কোম্পানী আপনাদের যাবার ব্যবস্থা করবেন। বুঝলাম নসিব মন্দ। অর্থাৎ মোয়াল্লিম এবং কোম্পানীর অফিসে খোলা বারান্দায় খররৌদ্র উপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে ঘন্টার পর ঘন্টা অনিশ্চিত ভাবে জেদ্দাভিমুখী বাসের অপেক্ষায়। অবশেষে মোয়াল্লিম দপ্তরের জনৈক বাংলাদেশী কর্মচারীর পরামর্শ ক্রমে মোয়াল্লিমের কাছ থেকে আমাদের পাসপোর্ট গুলি ফেরত নিয়ে নিলাম নিজ ব্যবস্থাধীনে জেদ্দা যাবো উল্লেখে। অর্থাৎ এখানে আবার মক্কা থেকে জেদ্দা পর্যন্ত প্রদত্ত বাস ভাড়াটা গচ্ছাদিতে হল। তবুও মোয়াল্লিমের হাত থেকে মুক্ত হলাম ভেবে স্বস্তি পেলাম।

বাসায় এসে ভাবছি কি করা যায়। শেখ রশিদ আসার কথা ছিল, এখনো পর্যন্ত আসেননি। তিনি আমাদেরকে জেদ্দা এয়ারপোর্টে বিদায় দিয়ে দেশে চলে গিয়েছিলেন। দেশ থেকে এতদিনে ফিরে আসার কথা। এসেছেন কি আসেননি এরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ৩১শে আগষ্ট '৮৬ ইং সন্ধ্যার দিকে অর্থাৎ

www.pathagar.com

ঠিক সময় মত দেখি শেখ রশিদের গাড়ী আমাদের বাসার সামনে এসে থামল। অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছেন। সমস্ত ভাবনা চিন্তার অবসান হল। কুশলাদি বিনিময় ও দেশের খোঁজ খবর নেবার পর শেখ রশিদকে বাসায় হাদী সাহেবদের সাথে বসিয়ে দিয়ে আমরা ৪জন চলে গেলাম হেরম শরীফে বিদায়ী তাওয়াফের উদ্দেশ্যে। বিদায়ী তাওয়াফ সেরে নিলাম। হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলাম, বিদায়ের ব্যাথায় মন টনটন করে উঠল। হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। চোখের পানি বাঁধ মানছেনা। অঝোর ধারায় ঝরছে অশ্রু। শেষ বারের মতো কাবার সামনে দাঁড়িয়ে রাব্বুল আলামীন রহমানুর রহীম আল্লাহ পাকের দরবারে দু'হাত তুলে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি দিয়ে প্রার্থনা জানালাম। জানালাম মনের সকল কামনা বাসনার কথা। দোয়া করলাম নিজের জন্য, সন্তানাদির জন্য, যাত্রার সময় যারা দোয়া করতে বলেছিলেন তাদের জন্য, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন সমগ্র বিশ্বের অতীত ও বর্তমান সকল মুসলমানের জন্য। কাবাকে ফেলে আসবার জন্য মন চায়না, ইচ্ছে হয় অনন্তকাল ধরে কাবাকে সামনে রেখেই এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, আল্লাহর দরবারে হাত তুলে। কিন্তু যেতে নাহি দিব বললে ও যেমন যেতে দিতে হয় তেমনি মন আসতে না চাইলে ও চলে আসতে হয়। তাই ধীর পদ চারণায় পিছন দিকে চলতে শুরু করলাম। এই শেষ আসা অর্থাৎ কাবা থেকে শেষ বিদায় কালে কাবাকে পিছনে রেখে কেউ আসে না। আমরা ও কাবাকে সামনে রেখে পিছনে দিকে পা বাড়িয়ে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে বাদশাহ আবদুল আজিজ ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পিছু হাঁটতে যেন কোন অসুবিধা না হয় সে জন্যে বুলবুলকে আমি গাইড দিয়ে আনছিলাম। ফটক দ্বারে এসে দুজনে আবার পাশাপাশি দাঁড়ালাম। শেষ বারের মত আল্‌বেদা জানালাম খানায়ে কাবার উদ্দেশ্যে। আবার আসতে পারার তওফিক প্রদানের জন্য পুনরায় মিনতি জানালাম আল্লাহর দরবারে। খানায়ে কাবাকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই পিছু হেঁটে বেরিয়ে আসলাম মসজিদুল হারামের ভিতর হতে। খানায়ে কাবা চোখের অন্তরালে চলে গেলে পিছন ফিরে সামনের দিকে হেঁটে বাসায় ফিরে এলাম।

সমস্যা দেখাদিল আমাদের তল্পিতল্পা সবটুকু শেখ রশিদের গাড়ীতে ধরে না। তাই স্থির হল পোটলা পুটলি যেটুকু সম্ভব আমরা সাথে নিয়ে যাব। অবশিষ্ট সামান জামাই জাহাংগীর ২ তারিখ অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর '৮৬ আমাদের ফ্লাইটের নির্ধারিত তারিখে জেদ্দা এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে। এভাবে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আমরা শেখ রশিদের গাড়ীতে উঠে বসলাম। আবদুল হাদী মাষ্টার, নাদেরুজ্জমা সওদাগর এবং তারা উভয়ের মিসেস, জাহাংগীর অন্যান্য সকলেরা নীচে নেমে এল বিদায় জানাতে। দেশে ফেরার আনন্দের মধ্যেও বিদায়ের এই বেদনা তীব্রভাবে অনুভূত হতে লাগল। কেননা ছেড়ে যেতে হচ্ছে সাধনার ধন পবিত্র বায়তুল্লাহ এবং মক্কা মোকাররমা। সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলাম। শেখ রশিদ ষ্টিয়ারিং এ বসে চাবি ঘুরাতেই গড় গড় শব্দ করে গাড়ী গর্জ্জে উঠল।

www.pathagar.com

জেদ্দা ইসলামি সমুদ্র বন্দর নগরী

গাড়ী ছুটল তীব্রবেগে জেদ্দার পথে। রাত্রে পথিমধ্যে অন্ধকারে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিনি। আনন্দ আর বেদনায় আপ্লুত মন, গাড়ীর গতির চেয়ে ও অধিকতর বেগে ছুটে চলেছে সন্মুখ পানে, দেশের পানে। বেদনা, পবিত্রধাম ছেড়ে যাবার, আনন্দ স্বদেশ পানে রওনা হবার। ব্যাথা বেদনায় দোল খেতে খেতে ছুটে চলছি হঠাৎ বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়ায় মনে হল যেন আমাদের গাড়ী ভূমি থেকে বেশ উঁচু একটা ব্রীজের উপর দিয়ে চলছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্রীজ শেষ না হওয়ায় প্রশ্নকরলাম শেখ রশীদকে–এই ব্রীজের শেষ কোথায়? শেখ রশীদ উত্তরে বললেন, এই ওভারব্রীজ ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। পুরান বিমান বন্দর থেকে এই ব্রীজের শুরু এবং জেদ্দা ইসলামি সমুদ্র বন্দর হয়ে কিলো ১৪ মক্কা এক্সপ্রেস সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত। মক্কা থেকে জেদ্দার ৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মহাসড়কের উপর ২৭ কিলোমিটার একটানা একটি ওভারব্রীজ। ভাবতে ও অবাক লাগে–পেট্রোডলারের কেরামতি।

রাত্রি প্রায় ২টার দিকে জেদ্দায় শেখ রশীদের বাসায় এসে উঠলাম। বাসাটি জেদ্দার শহরতলীর একটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। এখানে প্রত্যেকের বাসার সামনে সারিসারি কার দন্ডায়মান। অর্থাৎ এই সমস্ত বাসায় যারা বসবাস করেন তারা ব্যাক্তিগত গাড়ী স্বয়ং ড্রাইভ করে কর্মস্থলে আসা যাওয়া করেন। গাড়ীর সংখ্যা এতো বেশী যে গ্যারেজে গাড়ী রাখার কথা কেউ ভাবার দরকার মনে করে না। অনেক সময় গাড়ী পার্ক করার বা পার্ক করা, গাড়ী বের করে নিতে সমস্যা দেখা দেয়। রশিদ সাহেবের বাসাটি দোতালায়। দুটি পৃথক কক্ষে রশিদ সাহেব আমাদের দু'জোড়া দম্পতিকে শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বলে দিলেন–সকালে নামাজের পর আমরা ঘুম থেকে উঠার পূর্বেই তিনি অফিসে চলে যাবেন। সুতরাং তার ফ্রিজ খুলে সব জিনিষ দেখিয়ে সকালে কি ভাবে নাস্তা করতে হবে এবং দুপুরের আহার করতে হবে সব বলে দিলেন। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ। কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি আর বুলবুল এককক্ষে, হুদা সাহেব আর তাঁর মিসেস আর এক কক্ষে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রশিদ সাহেবের বাসাটি ৪ কক্ষ বিশিষ্ট। তার দু'টি কক্ষে রশিদ সাহেব পরিবার নিয়ে থাকেন আগেই বলেছি। তাঁর পরিবার দেশে চলে যাওয়াতে দুটি কক্ষই রশিদ সাহেব আমাদেরকে দিয়ে নিজে অপর একটি কক্ষে ঘুমালেন। পরে জেনেছি অপর কক্ষ দু'টিতে রশিদ সাহেবের দুই সহকর্মী থাকেন। কিন্তু সকলের জন্য একটি মাত্র পাকঘর। তবে স্নানাগার আলাদা। রশিদ সাহেব পরিবার নিয়ে থাকলেও গৃহটিতে কোন পার্টিশান নাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে রশিদ সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক নাস্তা তৈরীর জন্য বুলবুল আর মিসেস হুদা পাক ঘরে ঢুকল। পাক ঘরে চুলা একটি, তবে রশীদ সাহেব এবং তাঁর বন্ধুদের আলাদা আলাদা মিটসেফ ও রান্না বান্নার পৃথক পৃথক তৈজসপত্র আছে। নাস্তা সেরে বাসা থেকে নীচে নেমে এলাম। আশ পাশে ঘুরে ফিরে দেখলাম। অত্যন্ত নির্জন তরুতৃণ গাছ পালাহীন এক আবাসিক এলাকা, সারি সারি পাকা দালান, রাস্তা ঘাটে কোন লোকজন নেই।

www.pathagar.com

বেশীদূর এগুতে সাহস হল না। যদি পথ ভূলে যাই! তাই অন্ততঃ রশীদ সাহেবের বাসাটির দেওয়ালে আরবীতে লিখিত নম্বরটি দেখে নিলাম। আবাসিক এলাকায় লোকজনের প্রয়োজন মিটাবার জন্য কয়েকটি দোকান ও ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর আছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। জুতা কাপড় থেকে খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল প্রভৃতি এগুলিতে পাওয়া যায়। রাস্তাঘাটে লোকজন দেখা যায়নি বললে ও চলে। দোকান গুলোর দরজা লাগান, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বাইরে থেকে কোনটা কি, খাদ্যের দোকান বা ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর বুঝবার উপায় নেই। কিছুক্ষণ পর একটি কাপড়ের দোকানে ঢুকলাম। দেখতে দেখতে একটা ম্যাক্সীর উপর নজর পড়ল। পড়তে আরাম বোধ হওয়ায় বুলবুল ইতিমধ্যে ম্যাক্সীর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি মাত্র জামায় গ্রীবা থেকে গোড়ালী পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায়। পড়তে, চলতে, ফিরতে, নামাজ পড়তে এবং ঘুমোতে সর্বাবস্থায় সুবিধাজনক বলে বুলবুল মক্কা মদিনায় দু' একটি ম্যাক্সী কিনতে চেয়েছিল। বাজারে বিস্তর ম্যাক্সী পাওয়া যায়। কিন্তু সবগুলি হাত কাটা। পুরো হাতের একটিও মিলেনি। তাই কিনা ও হয়নি। হাত কাটা ব্লাউজ সারা জীবন পড়েছে। কিন্তু এখন হাজী সাহেব। তাই হাত কাটা ম্যাক্সী পরিধান করতে অনীহা। পুরো হাতের সুন্দর ম্যাক্সী দেখে বাসায় ফিরে এসে বুলবুলকে নিয়ে দোকানটিতে আবার ঢুকলাম। মেক্সীটি বুলবুরের ও পছন্দ হওয়ায় কিনেই ফেললাম। বাসায় এসে গায়ে দিয়ে দেখা গেল এটি বুলবুলের গায়ে ফিট হয় না। হা হতোস্বী করে দু'জনেই আবার নেমে এসে দোকানীকে যখন অনেক কছরত করে বুঝালাম যে এটি গায়ে ফিট হয় না এবং ফিট হবার মতো অন্য কোন ম্যাক্সী তার দোকানে মজুত নেই, দোকানী ম্যাক্সীটি নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে টাকা গুলি ফেরৎ দিয়ে দিলেন। আমরা কিন্তু ভাবছিলাম কোন একটা ফ্যাসাদ বুঝি লাগবে। সেখান থেকে বেরিয়ে আরেকটি ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরে ঢুকলাম। ঘুরে ফিরে দেখলাম, ছোট খাট কেনা কাটা করলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আরেকটি খাদ্যদ্রব্যের দোকানে ঢুকলাম। ঢুকে অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম লোকটি বাংলাদেশী, চট্টগ্রামের অধিবাসী। জীবিকার সন্ধানে, ভাগ্যের অন্বেষণে সুদুর জেদ্দা নগরীর এই শহরতলীতে এসে এই ক্ষুদ্র বিপণী খুলেছে। নোট করে না রাখাতে তার নাম ও ঠিকানা ভূলে গেছি। মিসেস হুদা আমাকে সব সময় নোট করার কথা বলতেন। আজ বুঝতে পারছি তাঁর কথামত প্রত্যেকটি দৃশ্য নোট করে রাখলে আজকে হয়তো আরো উত্তমরূপে বিশদভাবে লিখতে পারতাম। লোকটি আর কিছু না পেয়ে হাতের কাছের শীতল পানীয়ের একটি করে বোতল তুলে দিলেন আমাদের হাতে। এহেন অবস্থায় "স্বদেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুর" কথাটির বাস্তব অর্থ সহজবোধ্য হয়ে যায়।

আজানের শব্দ শুনে মসজিদে গেলাম জোহরের নামাজ আদায় করতে। বাসার অনুতিদূরে একটি গলি পেরিয়ে ছোট্ট একটি মসজিদ। বাইরে থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই যে ইহা একটি মসজিদ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বলে বর্হিদ্বার সর্বদা রুদ্ধ। কাঁচের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম, দেখলাম ভিতরে আমিই প্রথম ব্যক্তি। প্রথমে কেমন যেন মনে হল। ছোট্ট পরিপার্টি তকতকে ঝরঝরে

www.pathagar.com

উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ক্ষুদ্রাকৃতির এই উপাসনালয়। এক একজন করে লোক আসতে শুরু করলে মনের বিহ্বল ভাব কেটে গেল। ফিরবার পথে মনের তন্ময়তায় বাসার গলিপথ ফেলে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ায় পথ হারিয়ে ফেলি। ব্যাকগিয়ার না দিয়ে এবাউট টার্ন করে অল্প অগ্রসর হলে পথের দিশা ফিরে পাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রশিদ সাহেব ফিরে এলেন অফিস হতে। আমাদেরকে তৈরী হতে বলেই তিনি লাঞ্চে বসে গেলেন। খাওয়া শেষ করার সাথে সাথেই যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। হুদা সাহেব কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলায় বললেন সময় নেই। দেরী করলে জেদ্দা শহর, লোহিত সাগর, জেদ্দা ইসলামিক সমুদ্র বন্দর প্রভৃতি দেখা শেষ করা যাবে না। পরের দিন অফিস থেকে আসার পরই বিমানবন্দরে চলে যেতে হবে। সময় আর পাওয়া যাবে না। গতকাল বলতে গেলে সারা রাত ঘুম হয়নি রশিদ সাহেবের। রাত্রে গাড়ী চালিয়ে মক্কা থেকে এসেছেন জেদ্দায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে গেলেন অফিসে। আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে অফিস থেকে গেলেন জেদ্দা বাংলাদেশ বিমান অফিসে। তারপর গেলেন বিমান বন্দরে আমাদের পক্ষে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবার জন্য। তারপর আবার অফিস, অফিস থেকে বাসায় এসেই মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম না করে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর আমাদেরকে তাগাদা দিতে শুরু করলেন। সত্যি রশিদ সাহেবের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

জেদ্দা নগর সাধারণতঃ হাজীদের পথে পড়ে না। বিমান বন্দর হতেই নগরীর দূর দিয়ে চলে যাওয়া জনপথ ধরেই মক্কা মদিনা এবং সেখান হতেই জেদ্দা বিমান বন্দর হয়ে নিজ নিজ দেশে চলে যায়। তাই জেদ্দা নগরীতে প্রবেশ করবার হাজীদের সুযোগ হয় না। তাই বিশেষ উৎসুক্য নিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ না করলে জেদ্দা বন্দর হাজীদের দেখা হয় না। আমরা রশীদ সাহেবের বদৌলতে এই বিশেষ সুযোগ যখন পেয়েই গেলাম, তা' আর হাতছাড়া করতে মন চাইল না। কক্ষে কাপড় বদ্‌লাতে গিয়ে বুলবুল বলল–"দেখ দেখ এখানে আমাদের দেশের মত মাছ ধরার একটি জাল।" মনে কৌতূহল জাগল। আরবদেশ মরুর দেশ। দীঘি, পুষ্করিণী, হাওড়, ঢেবা, ডোবা প্রভৃতি জাল দিয়ে মাছ ধরবার মত জলাশয় এদেশে অকল্পনীয়। জাল কেন এল এখানে? আমার কৌতূহলী মনের প্রশ্নের জবাবে রশীদ সাহেব জানালেন বড়শী দিয়ে মাছ ধরার মত জাল বাওয়া অর্থাৎ জাল দিয়ে মাছ ধরা তাঁর হবি। এদেশে ও তিনি জাল বাহেন। লোহিত সাগরের তীরে আছে জাল বাইবার সেই ক্ষেত্র। আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যইত তাঁর এত তাড়া। মাছ কেমন পান, কি জাতীয় মাছ পান এবং বেশী পেলে কি করেন ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে জানালেন কই, তেলাপিয়া, ফলই প্রভৃতি সাইজের প্রচুর সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। মনের আনন্দে ধরে আনেন। নিজের আন্দাজ রেখে বাকীগুলো পাড়া পড়শীদের বিলিয়ে দেন।

বেলা প্রায় তিনটার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সামনের সিটে রশিদ সাহেবের পাশে হুদা সাহেব, পিছনের সিটে বাম পাশে আমি, মধ্যখানে বুলবুল তারপর মিসেস হুদা। চলতে চলতে দেখি মিসেস হুদার হাতে ছোট

www.pathagar.com

একটি নোট বুক আর পেন্সিল। স্বরণ থাকবার জন্য দৃষ্ট বস্তু নোট করে নিচ্ছেন। কি করছেন জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন আপনি, কিছু লিখবেন বলছেন, নোট করুন না, কাজে আসবে। সত্যি এখন বুঝতে পারছি তাঁর কথা মত যদি নোট করে নিতে পারতাম আমার এই লেখা হয়ত আরও সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল হত।

গাড়ী চলছে জেদ্দা নগরের বুক চিড়ে। রশীদ সাহেব বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছেন কোনটা কি। বললেন এই যে সামনে ডান দিকে যেই সাদা দালানটি দেখছেন এটি হল পুরান হাজী ক্যাম্প। পরিত্যাক্ত, জীর্ণ শীর্ণ বৃহদাকারের এই অট্টালিকা অতীতের স্মৃতি হিসাবে মূল শহরের মধ্যস্থলে এখনো দন্ডায়মান। তবে ব্যবহার নাই। সমগ্র দালানটিই ফাঁকা। বারান্দার কোন কোন স্থানে শুকাবার জন্য কাপড় লটকানো দেখে মনে হল দাড়োয়ান গোছের কেউ বুঝি এখানে পরিবার নিয়ে অবস্থান করে। আরও কত কি যে রশীদ সাহেব দেখালেন নোট না করায় সব স্মরণ করতে পারছি না। তবে দেখেছি পুরাতন জেদ্দাকে আধুনিক সজ্জায়, নবরূপে গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে এক অত্যাধুনিক বন্দর নগরি এই জেদ্দা শহর। রাস্তা দিয়ে শোঁ শোঁ করে চলছে গাড়ীর সারি। রাস্তায় এমন কি ফুট পাথেও নেই কোন পথিক। পায়ে হেঁটে চলতে একটি লোককেও নজরে পড়ল না। একটি ট্রাফিক মোড়ে ইংরেজীতে একটি সাইন বোর্ড দেখলাম, তাতে লিখা আছে Please be kind to the Pedestrians. Allow them to cross the road safely. পথচারীদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের এই নির্দেশ দেখেই বুঝতে পারলাম এখানে যারা পায়ে হেঁটে চলে তারা করুণার পাত্র। তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য রয়েছে সরকারী নির্দেশ। তাই বোধ হয় রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে কেউ এখানে করুণার পাত্র হতে চায় না। প্রশস্ত রাস্তার দুধারে নবনির্মিত সারিবদ্ধ আধুনিক বাণিজ্যিক অট্টালিকা, প্রত্যেকটিই রুদ্ধ দ্বার। পসরা প্রদর্শনের প্রয়োজনে অনেকেই লাগিয়েছে কাঁচের দরজা, সম্মুভাগের বৃহৎ অংশে কাঁচের দেয়াল। সমগ্র জেদ্দা শহরে রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলতে যেমন একটি লোককেও দেখিনি, তেমনি দেখিনি দরজা খোলা একটি দোকান বা অফিস বা অন্য কোন গৃহ অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটি গৃহই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। দরজায় ধাক্কা দিয়েই প্রবেশ করতে হয় অভ্যন্তরে।

জেদ্দা শহরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হল যে প্রায় প্রতিটি রাস্তার মোড়ে, প্রত্যেক গুরুত্ব পূর্ণ স্থানে বিরাট আকারের অত্যন্ত সুন্দর আকর্ষণীয় একটি করে ভাস্কর্য শিল্প মাথা উঁচু করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষ ভাস্করের নিপুণ হাতের গড়া এই সব মোহনীয় ভাস্কর্য পর্যটকদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। জেদ্দার বর্তমান নাম জেদ্দা ইসলামী সমুদ্র বন্দর। সম্ভবতঃ তাই ভাস্কর্য শিল্প গুলো কোন ভাস্কর মূর্তি নয়, নয় কোন পশুপাখীর অবয়বে আঁকা ছবি। কোন কোনটি সমুদ্রে চলমান জাহাজের বহর, কোন কোনটি অতীত ইতিহাসের দৃশ্যপঠ বা সামাজিক ঐতিহ্যের ধারক। গোটা জেদ্দা শহরটিই ভরপুর এরূপ মনোমুগ্ধকর অসংখ্য ভাস্কর্য শিল্পে। যে দিকেই যান একটি না একটি ভাস্কর্য শিল্প আপনার নজরে পড়বেই।

www.pathagar.com

চলতে চলতে এক জায়গায় এসে রাস্তার ডান পাশে গাড়ী থামল। পাশেই বাংলাদেশ বিমানের জেদ্দা শহরস্থ কার্যালয়। এখানে একজন কর্মচারীর কাছে সকালে রশিদ সাহেব ফেলে গিয়েছিলেন আমাদের একটি পাসপোর্ট। তা নেবার জন্য গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন রশীদ সাহেব আর হুদা সাহেব। আমাকে সংগে যেতে এমনকি গাড়ী থেকে নামতেও বারণ করলেন। কেননা এদেশে অফিস আদালতে অপ্রয়োজনীয় মানুষের ভীড় জমানো অবাঞ্ছিত। গাড়ী থেকে নামতে বারণ করলেন এই জন্য যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পায়চারি করলে হয়ত বা কার ও কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যাব। দ্বিতীয় কারণটি হল দুইজন মেয়ে লোককে একাকী গাড়ীতে রেখে সকলের চলে যাওয়াটা ও অবিবেচনা প্রসূত। তাই গাড়ীতে বসে বসেই এদিক ওদিক দেখছি। মিসেস হুদা আবেগভরে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন বুলবুলের সাথে। কত কথা, ব্যক্তিগত জীবনের না বলা কাহিনী, ঘটনা বহুল পারিবারিক জীবনের বর্ণনা, সামাজিক জীবনের বিশদ বিবরণ। মোট কথা আপনজনকে একান্তে কাছে পেলে মেয়েরা যে ভাবে খুলে দেয় গহীন মনের বদ্ধ কপাট।

হঠাৎ নজরে পড়ল বেশ কিছু দুরে সাদা বাষ্পীয় ধূঁয়ার মত কি এক পদার্থ বিরাট এক স্তম্ভ আকারে কুন্ডলী পাকিয়ে অনবরত উপরের দিকে বেশ উঁচুতে উঠছে আর নীচের দিকে নামছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন ধূসর বর্ণের বিরাট আকারের এক বাষ্পীয় স্তম্ভ একই স্থানে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধ ও অধো মুখী সঞ্চারমান এক কুতুব মিনার। জিনিষটা কি হতে পারে বুঝে উঠা দুষ্কর। বুলবুল আর মিসেস হুদার ও দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম সে দিকে। তারাও কিছু অনুমান করতে পারল না। শুধু বিস্ময় প্রকাশ করল। কৌতূহল হল জিনিষটা কি জানবার। রশিদ সাহেব ফিরে এসে গাড়ী ষ্টার্ট দিবার আগেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম জিনিষটা কি। তিনি সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, আপনাদেরকে সেখানে নিয়ে যাব। দেখাব জিনিষটা কি। পরে সেখানে পৌছে দেখি তীর থেকে অনুমান আধমাইল বা পোয়া মাইল দূরে লোহিত সাগরের বুকে পানির মধ্যে এক প্রকান্ড পানির ফোয়ারা। এতদুর থেকে দেখে তার আকার ও আয়তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা না গেলেও অনুমানে মনে হল গোড়ার দিকে ফোয়ারাটির ব্যাস হাজার ফুটের উর্দ্ধে হবে। তীব্র বেগে হাজার ফুটের ও উর্দ্বে পানির ঝর্ণাধারা বেয়ে উঠছে উপরের দিকে আবার একই ধারায় বেয়ে নামছে নীচের দিকে উৎসস্থলে। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন রূপালী বাষ্পীয় ধূঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে অনবরত উপরের দিকে উঠছে আর নীচের দিকে নামছে। অনবদ্য সুন্দর আর মন মোহনীয় সৃষ্টি সমুদ্র বক্ষে এই ফোয়ারা। অপূর্ব কারিগরি কৌশলে নির্মিত এই ঝর্ণাধারা স্বাভাবিক ভাবেই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারুকার্য মন্ডিত ভাস্কর্য শিল্পের সাথে অনবদ্য এই ফোয়ারা জেদ্দা নগরীকে দিয়েছে এক বিস্ময়কর অপরূপ রূপ।

সাগর সৈকতে

জেদ্দানগরী পিছনে রেখে এবার গাড়ী চলছে সৈকত সড়ক ধরে। আমাদের হাতের বাম পাশে দীর্ঘকায় হ্রদ আর ডান পাশে দিগন্ত বিস্তৃত লোহিত সাগরের

www.pathagar.com

লোনা পানি। অর্থাৎ সাগর বক্ষভেদ করে চলছে আমাদের গাড়ী। এই হ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে রশিদ সাহেব জানালেন, তীর ভাগে সাগর বুকে বাঁধ দিয়ে লোহিত সাগর থেকে পৃথক করে এই হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সমুদ্র থেকে পৃথক বলে চন্দ্র সূর্য এই হ্রদের পানিকে আকর্ষণ করতে পারে না। ফলে এখানে নেই কোন স্রোতের টান, জোয়ারের জল স্ফীতি। সমুদ্রের তীর ভাগে নির্মিত বলে এর গভীরতা ও খুব বেশী নয়। এই হ্রদে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। ছুটীর দিনে বাংলাদেশে প্রস্তুত জাল নিয়ে এখানেই রশীদ সাহেব আসেন মনের সখে মাছ ধরতে।

সৈকত সড়ক ধরে গাড়ী চলতে চলতেই মগরিবের সময় হয়ে এল। এক জায়গায় এসে গাড়ী থামল। সকলে নেমে পড়লাম। সড়কে বা সৈকতে কোন লোকজন নেই। কেবল মাত্র দুজন লোককে দেখলাম একস্থানে জায়নামাজ বিছায়ে নামাজ আদায় করে নিল। তাদের দেখা দেখি আমরা ও সৈকত সড়কে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নিলাম। এই সড়কই এখানে সাগর সৈকত। এখানে নেই কোন বালুময় ঢালু বেলা ভূমি। সড়কের ধার ঘেষে ফেলে রাখা হয়েছে বড় বড় নুড়ি পাথর, যাতে না সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সড়কে এসে আঘাত করতে পারে। নামাজ শেষে কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম সীমাহীন সমুদ্রের বিস্তীর্ণ দিগন্তের পানে, যেখানে সাগর আর আকাশ একসাথে মিশে গেছে। মনে হয় যেন নীল দরিয়ার লোনা পানি ছুঁই ছুঁই করছে নীলাকাশের নীলিমাকে, সাগর যেন কথা বলছে আকাশের সাথে। সাগর জল যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যেতে চায় আকাশের গায়। ওদিকে আকাশের গায় ফুটে উঠেছে অসংখ্য তারার মেলা। একের পর এক লোনা পানির বিক্ষুব্ধ ঢেউ তীরের কঠিন পাষাণ খন্ডে আঘাত করে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে অথৈ পানির অতল তলে। সারাদিনের প্রচন্ড গরমের মাঝে গোধূলী লগ্নে, সাগর পাড়ে মৃদু সমীরণে দেহ মন জুড়িয়ে এল। একবার ভাবলাম–নীল এই সাগরের, কে, কখন, কেন, কি কারণে লাল সাগর নাম করণ করেছিল? দেখলাম মিঠা লেবু যেমন মিঠা নয়, রাঙ্গামাটি যেমন রাঙ্গা নয়, লাল সাগরও লাল নয়। লালিমার লেশ মাত্র নেই লোহিত সাগরের বুকে, তবুও এ সাগরের নাম "রেড সী"।

তাড়া এল রশীদ সাহেব থেকে। সামনে আরো অনেক পথ বাকী। গাড়ী চলতে লাগল সৈকত পথে, দীর্ঘ এই পথ। কুড়ি মাইলেরও নাকি বেশী দীর্ঘ এই বেলাভূমি। কোথাও কোন জনমানবের সাড়া নেই। নীরব নিঝুম, কিন্তু আলো ঝলমল। এই এলাকা নাকি সরগরম হয়ে উঠে সপ্তাহে দুই দিন, বৃহস্পতি আর শুক্রবারে। সরকারী ছুটীর দিনে। দীর্ঘ এই পথ পতেঙ্গা বা কক্সবাজারের মত ঢালু বালুকাময় সৈকত নহে। নহে করাচীর ক্লিফটনের মত সুসজ্জিত পুষ্পময় বেলাভূমি। সমুদ্র বক্ষের মাঝে নির্মিত দীর্ঘ এই খাড়া সড়ক পথই এখানের সাগর সৈকত। এই সৈকত সড়কের মাঝে মাঝে পর্যটকদের বসার জন্য পাকা বেঞ্চি নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও সুশোভিত পাটাতন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সব পাটাতনে মাটি ভরাট করে আইল্যান্ড তৈরী করে বিভিন্ন বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এখানেও

www.pathagar.com

আছে নানারকম কারুকার্যমন্ডিত সেই ভাস্কর্য শিল্প। এহেন একটি পার্কের কাছে গাড়ী এসে থামল। "চম্পকবনের শিলাময় ঘাটের" সাথে তুলনা করা চলে এ সব পার্কের। কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করলাম এই পার্কে। পার্কের ধারে সাগরের উপল উপকূলে একটু বসলাম। সম্ভবতঃ এ সময় সমুদ্রে জোয়ার ছিল। বাংলাদেশে ভাদ্র মাসের পুষ্করিণীর মত কানায় কানায় ভরপুর সমুদ্রের পানি। সম্মুখের উপল খন্ডে একটি ঢেউ আছড়ে পড়লে তার পানি এসে আমার কাপড় ভিজে যায়। তাই এবং সময়াভাবে বেশীক্ষণ আর সেখানে বসা গেল না।

সাগর পাড় ছেড়ে রশিদ সাহেবের টয়োটা এবার প্রবেশ করল জেদ্দা নগরীর বাণিজ্যিক এলাকায়। প্রশস্থ রাজপথ ধরে গাড়ী চলছে। বামদিকে প্রসিদ্ধ এক বিপণি বিতান দেখে নামতে চাইলাম। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ী বিপণি বিতানের প্রবেশ পথ অতিক্রম করে দশ ফুট আন্দাজ সম্মুখ দিকে এগিয়ে গেছে। ফিরবার ঝো নেই। তাই প্রায় এক মাইল পথ ঘুড়ে পুনঃ সে স্থানে এসে বিপণি বিতান চত্বরে ঢুকলাম। কিন্তু গাড়ী পার্ক করা আর এক সমস্যা। সারি সারি অসংখ্য গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের খান রাখবার ঠাঁই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে বেশ কিছু দূরে ঠাঁই মিলল। বিপণি কেন্দ্রের ফটকে এসে দেখি দ্বার রুদ্ধ। কেননা এশার আজান হয়ে গেছে। নামাজের সময়ে এখানে বিকিকিনি সাময়িকভাবে বন্ধ। এখানে ঢুকতে গেলে এশার নামাজ শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সে সময় আমাদের নেই। তাই ফিরে চললাম। রশিদ সাহেব এনে হাজির করলেন অনুরূপ আর একটি বিপণন কেন্দ্রে। বিরাট আয়তনের আধুনিক এক বাণিজ্য বিতান, ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর থেকে শুরু করে কাঁচা মাছ, শাক সব্জি গোশত সব রকমের রকমারি বিপণন এখানে সুলভে পাওয়া যায়। মাছ মাংস ছাড়া বাকী সব কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানী করা। আরবের ঐতিহ্যবাহী কোন দ্রব্য সামগ্রী কোথাও দেখা গেল না। প্রবেশ পথে ক্ষুদ্র একটি জলাশয়। স্বচ্ছ পানিতে মা সহ ছোট আকারের কয়েকটি বাচ্চা কাছিম ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তার কোনটি চুপটি মেরে বসে আছে, কোন কোনটি ছুটাছুটি করে কেলি করছে। জলাশয়ের চারদিকে বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে দেখছে কাছিমের কেলি। ক্ষণেক দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। বেশীক্ষণ দাঁড়াবার সময় যে আমাদের নেই। মার্কেটের ভিতরে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মেয়ের জন্য রঙপেন্সিল, মোজা জাতীয় ছোট খাট কিছু কিনলাম। অনেকেই এখানে ট্রলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাজার করছে। ঢুকবার সময় প্রবেশ পথে ট্রলী ভাড়া পাওয়া যায়। বাজার শেষে যাবার সময় ক্রীত সামগ্রী নিজ গাড়ীতে তুলে ট্রলীর ভাড়া চুকিয়ে দিতে হয়। বেরিয়ে ফটক পথে দেখি ছোট ছোট দু'একটি ছেলে হস্ত নির্মিত কুটীর শিল্প জাতীয় কাঁচের কিছু দ্রব্য হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন ঢাকা নিউ মার্কেটের সামনে বেলীফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। এদের কিন্তু মুখে কোন শব্দ নেই। দৌড়ে গিয়ে কোন খরিদ্দারকে জব্দ করার চেষ্টা নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কেউ জানতে চাইলে দাম বলে।

www.pathagar.com

পুরানো জেদ্দা—হাওয়া বিবির সমাধি

আধুনিক জেদ্দা নগরী ছেড়ে এবার গাড়ী একস্থানে পার্ক করে প্রবেশ করলাম পুরানো জেদ্দার ছোট এক গলি পথে। এখানে আবার সব দোকান উন্মুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় কোনটি। দোকানিরা পসরা সাজিয়ে খরিদ্দার আকর্ষণের চেষ্টায় গদী নিয়ে বসে আছেন। হেঁটে হেঁটে দেখলাম অনেক্ষণ, কিনবার মত তেমন কিছু হাতে ঠেকলনা। অবশেষে ছোট্ট একটি ক্যাফেট্যারিয়ার সামনে এসে রশিদ সাহেব বললেন কিছু খাওয়া যাক। ছোট্ট ক্যাফেট্যারিয়াটি আবার রেলিং দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত। রেলিং এর অভ্যন্তরে পাক করা ও অন্যান্য নানা ধরণের পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য। রেলিং এর বাইরে থেকে আগে পয়সাদিয়ে কিনে নিতে হয়। আমরা কিছু জয়তুনের হালুয়া আর শীতল আমের জুস কিনে নিয়ে ক্লান্তি বশতঃ চেয়ার টেনে নিয়ে ক্যাফেট্যারিয়ার সামনে খোলা জায়গায় বসে ভোজন পর্ব শেষ করে নিলাম। দিল ঠান্ডা হলে পর রশিদ সাহেবের নির্দেশে আবার রওয়ানা দিলাম। গাড়ী এসে থামল পুরনো জেদ্দার চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টীত এক তোরণ দ্বারে। রশিদ সাহেব বললেন এখানে না নামলে জেদ্দা দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জেদ্দা আসা বৃথা যাবে। জিয়ারত করবার মত উল্লেখ যোগ্য এই একমাত্র স্থানই আছে জেদ্দায়। তাঁর কথা থেকেই জানলাম প্রাচীর বেষ্টীত এই স্থানটি একটি কবরস্থান। কথিত আছে এখানেই অবস্থিত আদি মাতা হাওয়া বিবির সমাধি। চেষ্টা করেও ভিতরে প্রবেশ করতে পারলাম না। তোরণদ্বার অর্গলবদ্ধ। আশে পাশে কোন লোকজনের সাক্ষ্যাত মিলল না। প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তোরণ দ্বারে একটি বিজলী বাতি জ্বলছে। এই বিজলী বাতির স্বল্প আলোতে দাঁড়িয়েই সকলে মনে মনে স্মরণ করলাম মা হাওয়াকে। ফাতেহা পাঠ করলাম। মোনাজাত করলাম। কবর দেখিনি। তবু যেন মনের মধ্যে কি এক তৃপ্তি--আদি মাতা হাওয়ার সমাধি দর্শন করলাম অর্থাৎ কবর জেয়ারত করলাম বলে। অতঃপর রাস্তার ধার থেকে কয়েক বোতল শীতল পানি কিনে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটল বাসাভিমুখে। রাত দশটা অতীত হয়ে গেছে যখন বাসায় প্রত্যাবর্তন করলাম।

গৃহাভিমুখে

সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠার আগেই রশীদ সাহেব চলে গেছেন অফিসে। বলে গেছেন আমরা যেন তৈরী হয়ে থাকি। তিনি এসেই আমাদের নিয়ে যাবেন জেদ্দা হাওয়াই আড্ডায়, স্বদেশের পথে বিদায় জানাতে। ঘুম থেকে উঠে করবার মত কান কাজ ছিল না। চা নাস্তা খেয়ে বাসার আশে পাশে ঘুরে বেড়ালাম। দূরে যেতে সাহস হল না। একেত যানবাহন নেই। তা'ছাড়া পথ ঘাট ও অচেনা। হরিয়ে গেলে ফিরবার ঝো নেই। আশে পাশের দোকান পাট গুলোতে আবার ঘুরে ঘুরে দেখলাম। হুদা সাহেব কিছু কিছু কেনা কাটা করলেন। বাদে জোহর খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে না নিতেই শেখ রশিদ সাহেব এসে হাজির। আমাদের তৈরী হতে তাগাদা দিয়ে তিনি খেতে বসে গেলেন। বেলা প্রায় তিনটার সময় রওয়ানা দিলাম। আমরা পৌছার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের লাগেজ প্রভৃতি নিয়ে জাহাংগীরের বাস,

www.pathagar.com

জেদ্দা বিমান বন্দর সংলগ্ন হাজী ক্যাম্পের বহির্দ্বারে এসে দাঁড়ালো। মনে স্বস্তি পেলাম জাগাংগীরকে দেখে। এখানে হাজীদের মালামাল বহনের জন্য বড় বড় ট্রলী ভাড়া পাওয়া যায়। একখানা ট্রলীতে আমাদের সমুদয় মালামাল তুলে দিয়ে নিয়ে এলাম বিমান বন্দরে প্রবেশের দ্বারমুখে। একই সময়ে আলম সাহেব ও তার মিসেসকে নিয়ে হাজির। খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বিমান বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশের ডাক এসে গেল। সকল মালামাল সহ আমাদেরকে অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়ে জাহাংগীর, শেখ রশিদ সাহেব ও আলম সাহেবের সংগীরা বাহির থেকে হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। এরপর তাদের অপেক্ষা করা নিরর্থক। বিমান ছাড়বে রাত দু'টায়। বন্দরের আনুষ্ঠিনিকতা সেরে লাউঞ্জে প্রতীক্ষা করতে হয়। এ সময়ে কোন যাত্রীর বহির্গমন নিষিদ্ধ। সুতরাং বাইরের লোকের আর দেখা হবার কোন উপায় নেই। এ দিকে বিমান কখন টেক অফ নেবে বাইরে থেকে তা জানবার ও উপায় নেই। তাই ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েই সকলে চলে গেল।

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই দেখি প্রবেশ পথের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘাকৃতির ফয়সল কাট শ্মশ্রুমন্ডিত আরবী আলখেল্লা পরিহিত প্রৌঢ় এক ভদ্র লোক। হাতে তার একটি পবিত্র কোরান, বিদায় বেলায় সউদী বাদশাহর শেষ উপহার, আখেরী তোহ্‌ফা প্রত্যেক হাজীকে একটি করে দিচ্ছেন। হাত বাড়িয়ে নিলাম আমার কপি। সউদী আরবে বাদশাহ্‌ ফাহদ কোরানিক ষ্টেটে মুদ্রিত। অত্যন্ত সুন্দর তক্‌তকে ঝর্‌জরে অক্ষরে, বিদেশী উন্নত মানের কাগজে ছাপা। বেশ ভারী, শক্ত ও মজবুত। বুলবুল কিন্তু হাত বাড়াতে সঙ্কোচ বোধ করল। ভদ্রলোকটি ও বোধ হয় নারী বলে সেধে যাচনা করতে কুণ্ঠিত হল। বুলবুলকে বললাম বাদশাহ ফাহদের শেষ উপহার। তোমার হক আছে। একটা তোমার প্রাপ্য। গিয়ে নিয়ে এস না একটা। বুলবুল রাজী হল না। তাই দু'জনে মিলে একটা নিয়েই দেশে ফিরলাম।

নিজ নিজ সমুদয় মালামাল একস্থানে জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছি। কাউন্টারে ভীড় কমবার জন্য। দীর্ঘ কিউ। এক একজনের মাল ওজন করা হচ্ছে আর কথা কাটাকাটি চলছে। সকলেই বাংলাদেশ বিমানের বাংলাদেশী কর্মচারী। সুতরাং কেউ কাউকে নাছোড়বান্দা। বাংলাদেশ বিমানের নিয়ম মোতাবেক প্রত্যেক যাত্রী বাইশ কিলো পর্যন্ত মালামাল বিনা ভাড়ায় আনতে পারেন। তার উর্দ্ধে হলে ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু হাজীদের বেলায় আরও দশ কিলো অতিরিক্ত কনসেসন দেওয়া আছে, জমজমের পানি বাদে। জমজমের পানি যত ইচ্ছা নেওয়া যায় বিনা ভাড়ায়। কিন্তু অনেকের তার চেয়েও বেশী হয়ে গেছে। বিমানের দাবী অতিরিক্ত ব্যাগেজের ভাড়া দিতে হবে। যাত্রীর বক্তব্য হল, ফেরৎ পথে পয়সা নেই। সাথের মালামাল খোরমা, খেজুর, জায়নামাজ প্রভৃতি উপহার সামগ্রী। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। আমার মালামাল একটা একটা করে বেল্টে তুলে দিলে সব গুলি ভিতরে চলে গেল। কিন্তু ব্যাগেজ টেক গুণে দেখি একটা কম। কাউন্টারে কর্মচারীকে বললে তিনি নিশ্চয়তা দিলেন এই সব মালামাল ঢাকা চলে যাবে। একটাও এখানে থেকে যাবে না। টেক কম হলেও সব মাল পেয়ে যাবেন। কোন অসুবিধা হবে না। এমন কি তিনি স্বয়ং

www.pathagar.com

ঢাকা বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকবেন বলেও আশ্বাস দিলেন। তবুও আমার মনের সন্দেহ দুর করবার জন্য আর একটা টেক ইস্যু করতে বললে তিনি বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। পাই কি না পাই। নাকি ফ্যাসাদে জড়িয়ে যাই। অনেক সময় টেকের মালটিও পাওয়া যায় না। টেক ছাড়া ব্যাগেজের কোন দাবীত চলবেই না। সুতরাং মন তার, সংশয়ে দোদুল্যামান।

এহেন ভারাক্রান্ত মনে প্রতীক্ষা করতে থাকি। পরবর্তী কার্যক্রম সৌদী ইমিগ্রেশন কাউন্টার অতিক্রম করে বিমান বন্দরের লাউঞ্জে হাজির হওয়া। সৌদী ইমিগ্রেশনে কোনরূপ ত্রুটি ধরা পড়লে সাথে সাথেই তাকে ফেরৎ পাঠানো হয়। কোনরূপ ওজর এখানে অচল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর যাত্রীদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জরণ শোনা গেল যে–আমাদের ফ্লাইট নাকি কয়েক ঘন্টা বিলম্ব হবে। সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য কাউন্টারে গিয়ে জানতে পারলাম আমাদের বিমান এখনো ঢাকা হতে জেদ্দা বিমান বন্দরে এসে পৌছেনি। তবে দুয়েক ঘন্টার মধ্যেই পৌছে যাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে না করতেই কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হল যে, আমাদের ফ্লাইট কয়েক ঘন্টা বিলম্ব হবে। আমরা যেন বাইরে গিয়ে হাজী ক্যাম্পে অপেক্ষা করি। অন্য দেশের বিমান যাত্রীদের জন্য জায়গা খালি করে দিয়ে আমরা বেরিয়ে এসে হাজী ক্যাম্পে অবস্থান করতে লাগলাম। রাত্রি ১০টা অতীত হয়ে গেছে। পেটে ক্ষিধে লেগেছে। অথচ পকেটে পয়সা নেই। ফেরত পথে এরকম সময়ে কেউ কোন টাকা পয়সা সাথে রাখে না। রাখার বিধান ও নেই। হাজী ক্যাম্পে বাংলাদেশ বিমানের দপ্তরে গিয়ে জনৈক কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম আপনারা আমাদেরকে দেশে নিয়ে যাবেন বলে নিচ্ছেন না। আমাদের গাঁটে পয়সা নেই, কিন্তু পেটে ক্ষিধা আছে। তিনি সাথে সাথেই বললেন, হ্যাঁ, আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান এসে যাবে। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এলাম। হাজী ক্যাম্পে আবার শয্যা পাতলাম। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যারা ছিল থাকার তারা গেছে চলে, যে বিমান চলার কথা ছিল তা' রইল থেমে। আলম সাহেবকে দেখলাম একটি বেঞ্চির দু'পাশে দু'জনে বিছানা পেতে বসে আছেন। যখন বললাম আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছি, এক্ষুণি খাবার এসে যাবে। বললেন, আমরা ডিম রুটি দিয়ে রাত্রির খাবার সেরে নিয়েছি। আমাদের আর কোন খাবার লাগবে না। বললাম তাকি হয়। একটু অপেক্ষা করুন, খাবার এসে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল খাবার বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। নিজ নিজ টিকেট দেখিয়ে খাবার সংগ্রহ করলাম। বুঝতে পারলাম ভূমি হতে ৩৬ হাজার ফুট উর্দ্ধে বিমানে আমাদেরকে রাত্রে ডিনার সরবরাহের জন্য যে খাবার সংগ্রহ করা হয়েছিল তা' ভূমিতেই সরবরাহ করা হয়েছে। এই খাবার হাতে পেয়ে হুদা সাহেবকে বলে দিলাম আজ রাত্রে আপনাদের বিমান আর যাত্রা করবে না। তাই বিমানের এই খাবার ভূমিতেই পেয়ে গেলেন। আলম সাহেবকে খাবার নিয়ে আসতে বললে তিনি অনীহা প্রকাশ করলেন। তবু বললাম এটা আপনার বরাদ্ধ প্রাপ্ত খাবার। নিয়ে আসুন, ক্ষিধে পেলে কাজে লাগবে। আলম সাহেব তাই করলেন।

www.pathagar.com

হোটেল রামাদা

খাওয়া দাওয়ার পর শরীর একটু চাঙ্গা হল। ঘুমাতে গিয়ে দেখি হাজী ক্যাম্পের বাইরে ক্যাম্পের সাথে সংলগ্ন আর এক বিপণী বিতান। ইতিপূর্বে ব্যস্ততা ও গন্তব্যস্থলের প্রতিলক্ষ্য থাকায় এদিকে নজর পড়েনি। এখন অবকাশ মুহূর্তে বুলবুলকে ও সাথে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। নানা বরণ ও ধরণের পোষাক, বস্ত্র ও মনোহারি দ্রব্যের সমাহার। মেয়ে সুমাইয়ার জন্য একটি গরম ওভার কোট পছন্দও করে ফেলেছিলাম। হওলাত করে অর্থাভাব ও মোছন করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুলবুলের পছন্দ হল না। বুঝলাম হাজীরা দেশে ফিরার পথে টেকের বাকী পয়সা এখানেই রেখে যায়। ফিরে এসে হুদা সাহেবের সাথে পরামর্শ করলাম যে, এইমতাবস্থায় বাংলাদেশ বিমানের বিধি মোতাবেক আমরা হোটেলে থাকার অধিকারী। বিমান আমাদেরকে হাজী ক্যাম্পের মেঝে এভাবে ফেলে রাখতে পারে না। অতঃপর দু'জনেই আবার বিমান অফিসে গেলাম, এ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে। তারা জানালেন যে হোটেলের জন্য তারা চেষ্টা করছেন। কিন্তু এতগুলো অর্থাৎ ৩৫০ জন লোকের জন্য কোন হোটেলে সিট পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই দুর্গতি। তবু তাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হোটেলে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা হলে সাথে সাথেই জানানো হবে। বাংলাদেশ বিমানকে ধন্যবাদ এর কিছুক্ষণের মধ্যেই জেদ্দা নগরীতে হোটেলের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বাসে আরোহন করার ঘোষণা দেঁয়া হল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গেছে। জেদ্দার প্রসিদ্ধ প্রথম শ্রেণীর "রামাদা" হোটেলের সামনে বাস এসে থামল। হোটেলের আলীসান হলরুমের সম্মুখের প্রশস্থ করিডোরে এসে দাঁড়ালাম। তার একপাশে রক্ষিত মেঝে থেকে ছয় ইঞ্চি উঁচু সোফাতে মেয়েদের বসার জায়গা মিলল। বাকীরা হলরুমে প্রবেশ করল। ফ্যামিলি ওয়ালারা অগ্রাধিকার পেলাম। প্রত্যেক দম্পতির ভাগ্যে একটি করে দুই শয্যাবিশিষ্ট কক্ষ মিলল। বাকীরা সব হলরুমের মেঝেতে পুরু তোষকের বিছানায়, রাত্রি কাটাল। আমি আর হুদা সাহেব পাশাপাশি ২টি কক্ষ এবং আলম সাহেব দূরে আর একটি কক্ষ পেলেন। হুদা সাহেবের রুমে প্রবেশ করেই প্রথমে জানতে চাইলাম কেবলা কোন দিকে হবে। মিসেস হুদা বললেন বিছানায় যে দিকে বালিশ আছে নিশ্চয়ই সেদিকেই কেবলা। অতএব সে দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তে হবে। অত্যন্ত যুক্তিসংগত বলেই কথাটি গ্রাহ্য করলাম এবং সেদিকে মুখ করেই ফজরের নামাজ আদায় করলাম। রাত্রে ক্লান্তি, অবসন্নতা ও আড়ষ্ঠতা হেতু কোন দিকে তেমন লক্ষ্য করে দেখিনি। সকালে উঠে কক্ষের ভিতরে রক্ষিত খাওয়ার টেবিলের এক পার্শ্বে তীর চিহ্ন দ্বারা কেবলা নির্দেশ দেখে চক্ষু চরক গাছ। মাথায় হাত। হায় আল্লাহ করলাম কি? অর্থাৎ কেবলার ঠিক বিপরীত দিকে মুখ করে ফজরের নামাজ পড়েছি এবং রাত্রে কেবলার দিকে পা দিয়ে ঘুমিয়েছি। সংগে সংগে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলাম। অন্যান্য শহরের হোটেলে এরূপ দেখেছি। কক্ষ সাজাবার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কক্ষের যে দিকে দেওয়াল পড়ে খাটের সেদিকেই ঘুমাবার জন্য বালিশ রাখা হয়। এসব হোটেলে পূর্ব পশ্চিমের কোন চিন্তা করা হয় না। কিন্তু সউদী

www.pathagar.com

আরবের জেদ্দা ইসলামী সমুদ্র বন্দর নগরীর হোটেলে হাজীদের ঘুমাবার জন্য ও একই রূপ ব্যবস্থা করে রাখবে তা কল্পনা করতে পারিনি। ইহা জেদ্দা নগরীর একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল, অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। নাম, আল সালাম রামাদা হোটেল, জেদ্দা। আবার এই একই হোটেলের মধ্যে আরেকটি হোটেল আছে, নাম হোটেল আল সালাম মেরিডিয়েন, জেদ্দা। অর্থাৎ টু ইন ওয়ান–একের মাঝে দুই। দুই ব্যবস্থপনায় চলছে আলীশান এই হোটেল। আমাদেরকে যেখানে স্থান সংকুলান করে দেয়া হল সেইটি মূল হোটেলের পরিবর্দ্ধিত এক অতিরিক্ত অংশ। সম্ভবতঃ আমাদের মত বিপাকে পড়া যাত্রীদেরকে আশ্রয় দেবার জন্য এই পরিবর্দ্ধন। কক্ষগুলি বেশ প্রশস্থ ও সুসজ্জিত। আধুনিক আয়াস ও বিলাসের সকল সামগ্রী এর অভ্যন্তরে মওজুদ। কক্ষের এক কোণায় রক্ষিত আছে একটি টেলিভিশন সেট, বোর্ডারগণ যখন ইচ্ছে করে সৌদী অনুষ্ঠান দেখে ও শুনে। বিদেশী অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ আছে কিনা জানতে পারিনি। দুয়েকবার সুইস ঘুরিয়ে শুনেছি আরবী গাণ, দেখেছি অন্যান্য অনুষ্ঠান, কিন্তু মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝিনি। টিভি সেটের বিপরীতে আছে ছোট সাইজের একটি ফ্রিজ। তার ভিতরে আছে নানা জাতীয় বোতলজাত নরম শীতল পানীয়। গরম পানীয় এর ব্যবস্থা আছে কিনা জানতে পারিনি। সাধারণভাবে জানি সৌদী আরবে মদ আমদানী নিষিদ্ধ। কিন্তু বিছানায় বালিশের অবস্থা দেখে মনে এই প্রশ্নও জেগেছিল যে মাদকদ্রব্যের সরবরাহ বিশেষ ক্ষেত্রে হতেও পারে। বিছানার পাশেই টেলিফোন সেট। কক্ষের টেবিলেও অন্যান্য স্থানে রক্ষিত ইংরেজীতে লেখা নির্দেশাবলী পাঠ করে টেলিফোনের রিসিভার উঠালে মোটা স্বরে আওয়াজ এল, "সুবাহ্ আল খায়ের"। ভেবেছিলাম বামাকণ্ঠে মিহি শব্দ শুনব। কিন্তু না, নারী বর্জিত বিলাস বহুল হোটেল। ইংরেজী বলার সাথে সাথেই পরিষ্কার ইংরেজীতে জবাব মিলল। বুঝলাম বিদেশীদের সেবার জন্য ইংরেজী জানা, বিদেশী কর্মচারী নিয়োজিত আছে এসব হোটেলে।

অর্ডার মোতাবেক টেতে করে ব্রেক ফাষ্ট নিয়ে এল শ্রীলংকার ইংরেজী জানা এক যুবক। আমাদের কক্ষের স্নানাগারের বাথ টাবের শাওয়ার একটু বিকল হয়ে পড়েছিল। শুধুই গরম পানি আসে। ঠান্ডা পানি আসছিল না। তাকে বলার সাথে সাথে সে বাথরুমে সেটা ঠিক করার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। বলল গতকাল নাইজেরিয়ার কতিপয় হাজী আমাদের মত একই অবস্থার শিকার হয়ে এ হোটেলে ঠাঁই নিয়েছিল। তারাই এহেন কান্ড ঘটিয়েছে। বুঝলাম আমাদের মত বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও আছে। আর শুধু বাংলাদেশ বিমানের দোষ দিই কেন। সব এয়ার লাইনেই যান্ত্রিক কারণে ঐরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রত্যেক বাথরুমে সাবানের সাথে একবার ব্যবহার যোগ্য একটি করে সেম্পু টিউব দেওয়া আছে। কিন্তু আমাদের কক্ষে সেটা নাই। শ্রীলংকার ছেলেটাকে বলার সাথে সাথেই সে একটা এনে দিল।

হুদা সাহেব সকালেই শেখ রশীদের অফিসে টেলিফোন করে ঘটনা জানিয়ে দিয়েছিলেন। শেখ রশীদ শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন। অফিস ছুটির পর সরাসরি আমাদের হোটেলে এসে হাজির হলেন। বললেন কখনো কখনো এরূপ হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ভাগ্য ভাল যে আবার আপনাদের দেখা পেলাম। এই বলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে আবার জেদ্দা শহরে বেরিয়ে পড়তে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তিন জনে মিলে মোশায়েরা করে সাব্যস্ত করলাম, এই অবস্থায় হোটেল ছেড়ে দূরে কোথাও যাওয়া সমুচিত নয়। কেননা কখন যে যাত্রার জন্য বিমানের ডাক আসবে তা কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া এখন আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেই। বরঞ্চ সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ বিমানের নিয়ন্ত্রণে এবং দায়িত্বে জেদ্দার হোটেলে অবস্থান করছি। জরুরী প্রয়োজনে কাউকে যেতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষেই যেতে হবে। তাই আর বের হওয়া হলোনা।

ইতিমধ্যে হাজীদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জরণ শুরু হয়ে গেছে যে আজকে ও নাকি বাংলাদেশ বিমানের লকর মার্কা ডি সি–৮ এসে পৌছেনি। তাই আজও আমাদের জেদ্দায় প্রবাস করতে হবে। বুলবুল একথা শুনে খুব নারাজী প্রকাশ করে বলল ঢাকা এবং চট্টগ্রাম উভয় বিমান বন্দরেই নির্দ্দিষ্ট তারিখে ছেলেমেয়েরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে আসবে। কিন্তু আমাদের না পেয়ে হতাশ মনে ফিরে যাবে। গৃহাভিমুখী মনকে এখন হোটেলের বিলাসিতা এবং চাকচিক্যের আতিশয্য আকর্ষণ করতে অক্ষম। বললাম দেখ তোমরা আল্লাহর মেহমান। এটা আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি শেষ মেহমানদারী। আমাদের সাথে যতজন হাজী আছে তার কয়জনেরই বা এহেন হোটেলে অবস্থান করার সাধ ও সাধ্য আছে। আল্লাহর তরফ থেকে এহেন একটি সুযোগ যে পেয়ে গেলে সে জন্য শোকরিয়া প্রকাশ কর। উত্তরে সে বলল, তৃষ্ণা কালে পানির যে মূল্য তৃষ্ণার অবসানেও কি সে মূল্য থাকে? পিপাসীত জনের কাছে পানি অমূল্য, তৃষ্ণার অবসানে পানি মূল্যহীন। বিকেলের দিকে খবর পাওয়া গেল ডি, সি–৮ বিমান ডুবাই বিমান বন্দরে পড়ে আছে। তার মেরামত কার্য শেষ না হওয়ায় আকাশে উড়বার জন্য ডানায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তার পরিবর্তে বাংলাদেশ বিমানের অপর একখানা বোয়িং ৭০৭ আমাদের নেওয়ার জন্য এসে গেছে। কিন্তু বোয়িং ৭০৭ এর ধারণ ক্ষমতা ডি·সি·–৮ এর প্রায় অর্দ্ধেক। অতএব আমাদের অর্দ্ধেক হাজী আজ এবং বাকীরা কাল যাত্রা করবে। খবর পেয়ে বুলবুল উতলা হয়ে উঠল। আজকেই যেন সুযোগ পেয়ে যাই সেই জন্য তদবীর করতে যেতে আমাকে তাগাদা দিতে শুরু করল। কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতেই বলে দিল, যারা "উইথ ফ্যামিলি" আছেন তারা প্রথম যাবেন। বিনা তদ্‌বীরেই অগ্রাধিকার পেয়ে গেলাম–পরিবারের কারণে। শুটাবার মত কোন ব্যাগেজ সাথে ছিল না। পরিধেয় বস্ত্র আর হাতের এটাচী। সুতরাং নির্দেশের সাথে সাথেই তৈরি হয়ে হোটেলের লাউঞ্জে এসে উপস্থিত। আশঙ্কা কোন কারণে যদি সুযোগ ফস্‌কে যায়। সাথের অর্দ্ধেক হজ্বযাত্রীকে রেখে জেদ্দার আল সালাম রামাদা হোটেল ত্যাগ করলাম, সন্ধ্যার দিকে জেদ্দার বাদশাহ আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমান

www.pathagar.com

বন্দরের উদ্দেশ্যে। এবারে কোন ঝামেলা নেই। হাজী ক্যাম্পে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করতেই অভ্যন্তরে প্রবেশের ডাক এল। বিমানের আনুষ্ঠানিকতা ও সউদী ইমিগ্রেশন সেরে নির্দ্ধারিত সময়েই আরোহন করলাম বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং ৭০৭ বিমানে। মধ্য রাত্রির নির্ধারিত সময়েই যাত্রা শুরু হল। প্ল্যান টেক অফ নিল। পিছনে পড়ে রইল লোহিত সাগরের উপকূল–এরাবিয়ান পেনিনশুলা, জজিরাতুল আরব। পুতঃ পবিত্র মক্কা–মদিনা, আরবের বালুকাময় মরুভূমি আর তার লু'হাওয়া। বিদায়ের বেদনায় মনটা আবার চিনচিন করে উঠল।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com